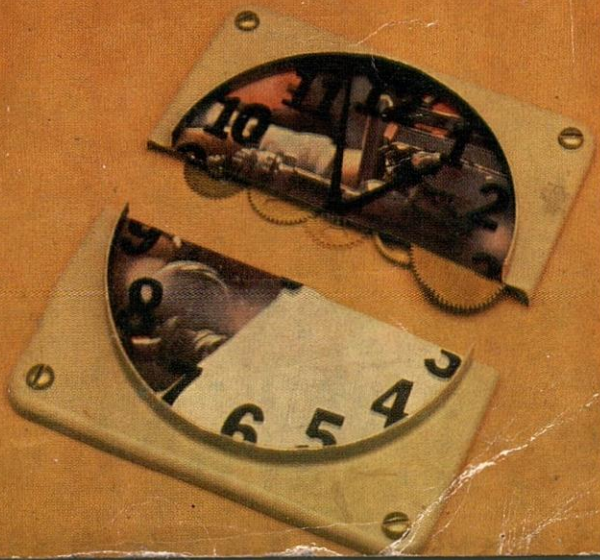
সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অমাবকথ

ত. ভলকভা, ফ. ভলকভ

উদ্বৃত্ত-মূল্য কী



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

ত. ভলকভা, ফ. ভলকভ

উদ্বৃত্ত-মূল্য কী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ
গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভলকভ
(প্রধান সম্পাদক), ইয়ে গুবস্কি (প্রধান
সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ,
ভ. ক্লাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

АВС социально-политических знаний

Т. Волкова, Ф. Волков

ЧТО ТАКОЕ ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ?

На языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

T. Volkova, F. Volkov

WHAT IS SURPLUS VALUE?

In Bengali

© Progress Publishers, 1986

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$B \frac{0603000000—415}{014(01)—88} 304—88$

ISBN 5-01-000815-7

সূচি

ভূমিকা ৫

অধ্যায় ১। পুঁজি ও পণ্য উৎপাদন . . . ৯

অধ্যায় ২। পুঁজিবাদী উদ্যোগ ৩৯

অধ্যায় ৩। উদ্বৃত্ত-মূল্য কীভাবে সৃষ্টি হয় . ৫৮

অধ্যায় ৪। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার ৯৩

অধ্যায় ৫। পুঁজিপতিরা কীভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ায় ১০৬

অধ্যায় ৬। উদ্বৃত্ত-মূল্য কে অর্জন করে? ১৬৬

অধ্যায় ৭। একচেটিয়া আধিপত্য: উৎপাদনের উপরে তার ফল-প্রভাব ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপযোজন . ২০২

অধ্যায় ৮। ফিনান্স পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্যের

এক ক্রমবর্ধমান অংশ অর্জন করে ২২০
অধ্যায় ৯। মুনাফা বাড়ানোর জন্য পুঁজি রপ্তানি ২৩২
অধ্যায় ১০। আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলি শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণ বাড়িয়ে তুলছে ২৪৯
অধ্যায় ১১। মুনাফা বাড়ানোর উপনিবেশ-বাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী পদ্ধতি ২৬০
অধ্যায় ১২। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভূমিকা ২৭০
অধ্যায় ১৩। উদ্বৃত্ত-মূল্য — পুঁজিবাদের ধনবৃদ্ধির উৎস ২৮৬
অধ্যায় ১৪। উদ্বৃত্ত-মূল্যের লালসা ও শ্রম-জীবী জনগণের মৌল স্বার্থের উপরে পুঁজির আক্রমণ . . . ২৯৪
অধ্যায় ১৫। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী লড়ছে ৩০৬
উপসংহার ৩১৭
টীকা ও ব্যাখ্যা ৩২১

ভূমিকা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য নতুন নতুন কৃতিত্বের কথা, প্রকৃতিকে করায়ত্ত করা ও মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার জন্য বহুযুগের সংগ্রামে মানুষের সাম্প্রতিকতম সব সাফল্যের কথা আমরা প্রতিদিন জানতে পাই। একদা যা ছিল রূপকথা, মহাকাশে সেই গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া আর লেসার-এর ব্যাপক ব্যবহার আমাদের কালেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মানুষ নির্মাণ করেছে শক্তিশালী ও অতি কার্যকর সব যন্ত্র, সংশ্লেষণ করে তৈরি করেছে এমন সব নতুন ধরনের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন উপকরণ, প্রকৃতিতে যা দেখতে পাওয়া যায় না। কৃষিরও অনেকখানি দিক-পরিবর্তন ঘটেছে অধিক-ফলনশীল শস্য আর অতি উৎপাদনশীল গবাদি পশু প্রজননের দিকে। এই সমস্ত কৃতিত্বই মানুষের জীবনমান উন্নত

করার এবং আমাদের গ্রহে এই প্রজন্মের জন্য এক সুখী জীবন অর্জনের অশ্রুতপূর্ব সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

অন্য দিকে, অসামরিক জনসমষ্টির উপরে বিমান থেকে বর্বর বোমাবর্ষণ বা কামানের গোলাবর্ষণের কথাও আমরা শুনতে পাই। আমরা শুনতে পাই তাদের কথা যারা কোনো চাকরি বা জীবিকা খুঁজে পেতে অপারগ হয়ে হতাশায় আত্মহত্যা করেছে। আমরা প্রত্যক্ষ করি পুঁজিবাদী সমাজে কোটি কোটি মানুষের সামনে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং নতুন নতুন ধরনের নির্মমতম সব অস্ত্র — পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের বিকাশ ঘটানোর জন্য বুর্জোয়া সরকারগুলি শত শত কোটির অঙ্কে অর্থ বরাদ্দ করে চলেছে। দিনের পর দিন প্যালেস্টাইনীয় ও লেবাননীজ দেশপ্রেমিকরা নিহত হচ্ছেন মধ্য প্রাচ্যে আর বর্ণবাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ-পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামীরা নিহত হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে। বহু মুক্তিকামী জাতির ভাগ্যাকাশে পুঞ্জীভূত হচ্ছে কালোমেঘ। বুর্জোয়া দুনিয়ায় অনাহার সহাবস্থান করে হাজার হাজার টন খাদ্যসামগ্রীর ইচ্ছাকৃত বিনষ্টির সঙ্গে; এক মুষ্টিমেয় সংখ্যক শোষকদের বিপুল সম্পদ সহাবস্থান করে কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষকের দারিদ্র্যের সঙ্গে; আলস্যে দিনযাপন ও অমিতব্যয়িতা সহাবস্থান করে হাড়-ভাঙা শ্রমের সঙ্গে। আজ, ঠিক গত শতাব্দীর মতোই, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় উৎপাদনের বিকাশের সহগামী হল আস্থাহীনতার বোধ

ও বেকারির ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা। বিজ্ঞানে দর্শনীয় সব কৃতিত্ব সত্ত্বেও প্রাপ্তবয়স্ক জনসমষ্টির মধ্যে এখনও বিরাট সংখ্যক লোক নিরক্ষর। শ্রমিক ও কৃষকরা যত বেশি মেহনত করে, পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের হাতে গিয়ে পড়া তাদের সৃষ্ট সম্পদের অংশটা তত বড় হয়ে ওঠে। আর এটা ঘটছে সভ্যতাগর্বী ২০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, পারমাণবিক শক্তি আর মহাকাশ অভিযানের যুগে!

এই সমস্ত ভয়ংকর ব্যাপার কী কারণে ঘটেছে? এর ফলস্বরূপ যেসব গুরুতর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা কী দিয়ে লালিত হচ্ছে এবং আরও গুরুতর হচ্ছে? এর একটিই মাত্র উত্তর হতে পারে: এগুলি যার অধীনে ঘটে সেই সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের ব্যবস্থা।

১৭শ থেকে ১৯শ শতাব্দীতে বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির ফলে পশ্চিম ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ পরবর্তীকালে অন্যান্য সব মহাদেশে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। শোষণ ও নিপীড়নের এই ব্যবস্থা পুঁজিকে করে তুলেছিল অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উপরে চরম শাসক, এগুলির বিকাশকে পদানত করা হয়েছিল সম্পদবৃদ্ধির অন্তহীন পিপাসার কাছে, বল্‌গাহীন মুনাফা সন্ধানের কাছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ও মূল প্রণোদনা হল নিয়ত বর্ধিষ্ণু উদ্বৃত্ত-মূল্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলির মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে তা গড়ে তোলে; তা হল পুঁজিবাদের সারাৎসার। কার্ল মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে লিখেছিলেন: 'পুঁজিবাদী উৎপাদন শুধু পণ্যসামগ্রীরই

উৎপাদন নয়, সারগতভাবে তা হল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন।'*

তাই উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার উদ্ভব, বণ্টন ও ব্যবহারের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থার মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আমাদের সন্ধান করতে হবে।

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 477.

অধ্যায় ১

পুঁজি ও পণ্য উৎপাদন

পণ্য

পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিশ্বজনীন ও প্রাধান্যশালী চরিত্রই যে কোনো পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী সমাজে, কার্যত প্রায় সব কিছুই পরিণত হয় পণ্যে: ফল, যন্ত্র, পিন, শিল্পোদ্যোগ, সংবাদপত্র, এবং লক্ষ লক্ষ অন্য জিনিস ও সামগ্রী। একজন ব্যক্তি আক্ষরিকভাবেই পণ্যসামগ্রী দিয়ে বেষ্টিত। সেগুলিই হল পুঁজিবাদী সমাজের সম্পদ গঠনকারী সবচেয়ে বহুবিস্তৃত ও প্রাথমিকতম একক। সেগুলি হল পুঁজিবাদের আর্থনীতিক জীবকোষ।

পণ্যসামগ্রী বিনিময় করে লোকে প্রবেশ করে কতকগুলি আর্থনীতিক সম্পর্কের মধ্যে: কেউ বিক্রেতা হিসেবে, অন্যরা ক্রেতা হিসেবে।

পণ্য বিনিময়ই পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে বিপুল-পরিসর ও সাধারণ সম্পর্ক। যে কোনো পুঁজিবাদী দেশেই ক্রয় ও বিক্রয়, অর্থাৎ, পণ্য বিনিময় ক্রিয়া, রোজ লক্ষ লক্ষ বার ঘটে।

একটি পণ্য কী?

প্রত্যেক দিন পণ্যসামগ্রী নিয়ে কারবার করার সময়ে, একজন ব্যক্তি সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে প্রথমত বস্তুগত পদার্থের নিরিখে। বস্তুতপক্ষে, অধিকাংশ পণ্যসামগ্রীই বস্তুগত পদার্থ: একটি দোকানে যেসব দ্রব্য বিক্রি হয়, যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতো; উৎপাদন সম্প্রসারিত করার জন্য একটি কারখানার কেনা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম; সৈন্যবাহিনীর জন্য কেনা অস্ত্রশস্ত্র, ইত্যাদি। কিন্তু, বিনামূল্যে পাই এমন বহু জিনিসও বস্তুগত পদার্থ যেমন, কোনো বনে তোলা বেরি ও বন্য ফল, কিংবা উপহার হিসেবে দেওয়া সব কিছু। এগুলি পদার্থ, অথচ পণ্যসামগ্রী নয়। তাই একটি পণ্যকে নিছক একটি পদার্থ বলে সংজ্ঞানির্ণয় করাটাই যথোপযুক্ত নয়।

পদার্থগুলি তদবস্থভাবে পণ্যসামগ্রী নয়। সেগুলি পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে তখন, যখন লোকে কাজের দ্বারা সেগুলিকে প্রভাবিত করে। একটি পদার্থকে একটি পণ্য হতে হলে, সেটি অবশ্যই উৎপন্ন হতে হবে বিনিময়ের জন্য, বিক্রয়ের জন্য। তা হলে দাঁড়ায় এই যে একটি পণ্যকে চিহ্নিত করতে গেলে এই কথাটা বলা অত্যাবশ্যক যে একটি পণ্য হল শ্রমের একটি উৎপাদ, উৎপাদকের কাছ থেকে উপভোক্তার কাছে তা সরবরাহ হয় সরাসরি

নয়, বরং একটা বিনিময়ের মারফৎ, ক্রয় ও বিক্রয়কর্মের মারফৎ। পণ্য উৎপাদনের উদ্ভব হয় খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম সহস্রাব্দে। যে দুটি অবস্থা এর জন্ম দিয়েছিল তা হল সামাজিক শ্রম বিভাজন আর উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা।

পুঁজিবাদে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদন অর্জন করেছিল এক বিশ্বজনীন ও প্রাধান্যশালী চরিত্র। পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে শ্রমের সমস্ত উৎপাদই বিক্রেয় পদার্থ। পুঁজিবাদে শ্রমশক্তিও একটি পণ্য।

একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য

প্রত্যেক পণ্য উৎপন্ন হয় বিশেষ একটি মানবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুটি হল সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত খাদ্য। মাংস, দুধ, ফল, সবজিও মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগে। জুতো, জামা, ট্রাউজার্স, স্যুট, কোট, প্রভৃতি উৎপন্ন হয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও পাদুকার চাহিদা মেটানোর জন্য। যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম উৎপাদনী চাহিদা পূরণের কাজে লাগে. এবং বই, ছবি, ফিল্ম, প্রভৃতি লাগে মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য, তা হলে এই দাঁড়ায় যে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্যই হল একটি পণ্যের আবশ্যিক ও অপরিহার্য গুণ। এই গুণকেই বলা হয় একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য। যে পণ্যের কোনো ব্যবহার-মূল্য নেই

সেটি কেনার কথা কেউই চিন্তা করবে না। কারোই সেটি দরকার হবে না।

একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হল তার স্বাভাবিক গুণাগুণ এবং শ্রম প্রক্রিয়ায় মানুষের দ্বারা সেটিতে অর্পিত গুণাগুণ — এই উভয়েরই ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা ছুরি দিয়ে রুটি কাটা যায় শুধু এইজন্যই নয় যে সেটা শক্ত, যে ধাতু দিয়ে সেটা তৈরি তা শক্ত হওয়াই স্বাভাবিক, রুটি কাটা যায় এইজন্যও যে সেটার উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষ সেটাকে একটা বিশেষ আকার দিয়েছে। সুতরাং প্রাকৃতিক পদার্থ ও শ্রম ব্যয় দুটিই ব্যবহার-মূল্যে মূর্ত হয়। প্রকৃতি ও শ্রমই ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করে। সুদূর ১৭শ শতাব্দীতেই চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের একজন পথিকৃৎ, উইলিয়ম পেটি লিখেছিলেন যে শ্রম হল সম্পদের জনক, আর পৃথিবী হল জননী।

মানবসমাজের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ বস্তুনিচয়ের গুণাগুণ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং সেগুলির প্রয়োগকে বিচিত্রগামী করে। সুতরাং পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য বিকাশলাভ করে ও আরও বহুবিচিত্র হয়ে ওঠে। যে কাঠ একদা বাসগৃহ নির্মাণ ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হত, তার এখন অন্য অনেক প্রয়োগ দেখা যায় -- মণ্ড ও কাগজ উৎপাদন, কৃত্রিম তন্তু, কোহল উৎপাদনে ও অন্যান্য শিল্পে। একদা যে তেলের একমাত্র ব্যবহার ছিল জ্বালানি হিসেবে, তা এখন বহুবিধ সাংশ্লেষিক পদার্থ উৎপাদনের পক্ষে এক অপরিহার্য রাসায়নিক পদার্থ।

পণ্যসামগ্রী ছাড়া, এমন অন্যান্য জিনিসও আছে যেগুলির ব্যবহার-মূল্য আছে। এগুলি হল সেই সমস্ত জিনিস যেগুলি নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতিতে উৎপন্ন হয় (একান্তভাবেই সেগুলির উৎপাদকের ব্যবহারের জন্য); প্রস্রবণের জল, বন্য বেরিফল, ছত্রাক, প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক সম্পদও তাই। অন্যান্য জিনিস থেকে পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যটা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয় কী দিয়ে, তা বোঝার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই অবহিত হতে হবে।

প্রথম, একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য সেটির উৎপাদকের চাহিদা পূরণ করে না, পূরণ করে সমাজের অন্যান্য সদস্যের চাহিদা, পণ্যটি যে উৎপন্ন করেছে সেই ব্যক্তির জন্য উদ্দিষ্ট নয়, বরং যে সেটি ক্রয় করে সেই ব্যক্তির জন্য উদ্দিষ্ট। একজন দর্জি একটি স্যুট তৈরি করে উপভোক্তার কাছে সেটি বিক্রি করার জন্য; সে সেটা নিজের ব্যবহারের জন্য বানায় না। সেই রকম, একটি যন্ত্র-নির্মাণ কারখানায় উৎপন্ন একটি লেদ-যন্ত্রের ব্যবহার-মূল্য একটি উপভোক্তা উদ্যোগের উৎপাদনী প্রয়োজন মেটাবে, যে যন্ত্র-নির্মাণ কারখানা সেটি উৎপন্ন করেছে তার প্রয়োজন নয়। সংক্ষেপে, একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হল সেটাই, যেটা সমাজের জন্য উদ্দিষ্ট, তা হল একটি সামাজিক ব্যবহার-মূল্য।

দ্বিতীয়, একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উশুল হয় বিনিময়ের পরেই, ক্রয় ও বিক্রয়কর্ম ঘটে যাওয়ার পরেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উপভোক্তা একটি ছাতাকে

ব্যবহার করতে পারে একমাত্র সেটাকে কেনার পরেই। তার আগে পর্যন্ত, ছাতাটা যতক্ষণ পর্যন্ত কারখানার গুদামে বা বিভাগীয় বিপণিতে রয়েছে, ততক্ষণ তার ব্যবহার-মূল্য উশুল হতে পারে না।

তৃতীয়, একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হল মূল্যের এক বাস্তবায়িত অভিব্যক্তি, যেটি পণ্যের আরেকটি অত্যাবশ্যক গুণ।

একটি পণ্যের মূল্য

'মূল্য' কথাটা গতানুগতিক। এই শব্দটির লোকচলতি ব্যবহারের ধরনটাকে যদি আরও যথাযথভাবে আমরা চিহ্নিত করতে চেষ্টা করি, তা হলে দেখব যে যে কোনো পণ্যের মূল্যই সর্বপ্রথমে একটি নির্দিষ্ট বিনিময় অনুপাতের অভিব্যক্তি। আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

প্রত্যেক পণ্যই অর্থের একটা নির্দিষ্ট অংকের বদলে বিনিময়যোগ্য। একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিভিন্ন পরিমাণের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করা যায়। ধরুন, একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে কেনা যেতে পারে একটি রঙীণ টিভি, কিংবা ৭০টি শার্ট, অথবা এক টন আপেল। কিন্তু যদি একই পরিমাণ অর্থের বদলে দুই বা ততোধিক সামগ্রী বিনিময়যোগ্য হয়, তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেগুলি কোনো বিশেষ এক অর্থে সমান। অর্থাৎ, সেগুলির এমন একটা অভিন্ন গুণ আছে, যা সেগুলিকে প্রমেয় করে তোলে। এই যে

গুণটা সমস্ত পণ্যসামগ্রীরই অভিন্নভাবে আছে, তা কোনো রাসায়নিক, বা পদার্থগত, বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক গুণাগুণ নয়, বরং তা এই যে সেগুলি সবই মানবিক শ্রমের উৎপাদ। একটি কোট, একটি রেডিও সেট, একটি মোটরগাড়ি, কিংবা একটি পেনসিল, যাই হোক না কেন, একটি পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমের ব্যয় জড়িত। প্রত্যেক পণ্যই শ্রমের মূর্তরূপ; সুতরাং শ্রম নিয়োগটা পণ্যসামগ্রীর তুলনা করার একটি পরিমাপ। তাই পণ্যসামগ্রীর বিনিময় সারগতভাবেই সেগুলিতে মূর্ত শ্রমের পরিমাণগুলির তুলনা। তা হলে দাঁড়ায় এই যে, মূল্য হল, সর্বোপরি, একটি পণ্যে মূর্ত উৎপাদকের শ্রম।

এটাই অবশ্য মূল্যের যথেষ্ট সম্পূর্ণ সংজ্ঞার্থ নয়। নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতিতেও শ্রম সেই রকমই ব্যয়িত হয়, অথচ শ্রমের উৎপাদগুলি এখানে পণ্যসামগ্রী নয়, এবং তাই সেগুলির কোনো মূল্য নেই। নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতির উৎপাদগুলি স্বয়ং উৎপাদকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। সেগুলি বিক্রয়ের জন্য নয়।

পণ্যসামগ্রীতে মূর্ত যে ধরনের শ্রম সেগুলিকে তুলনা করার একটা পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতি আর পণ্য অর্থনীতিতে শ্রমের ব্যবহার আরও বিশদে বিচার করা যাক। নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতিতে উৎপাদকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপন্ন করে। তারা

বিনিময়ের উপরে নির্ভর করে না। নিতান্ত জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতি হল এক বিচ্ছিন্ন আর্থনীতিক একক। পক্ষান্তরে, পণ্য উৎপাদনের নিহিতার্থ হল উৎপাদকদের মধ্যে শ্রম বিভাজন, তারা প্রত্যেকে উৎপাদগুলি তৈরি করে নিজের ভোগের জন্য নয়, অন্যের ভোগের জন্য। প্রত্যেক উৎপাদক তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে বাজারে, ব্যবহার করে অন্য উৎপাদকদের শ্রম।

এ সবই এটাই দেখায় যে পণ্য উৎপাদনে উৎপাদকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আর্থনীতিক যোগসূত্র বজায় রাখা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার বেড়া দিয়ে তারা পৃথক হলেও, প্রত্যেকের শ্রম অন্যদের শ্রমের সঙ্গে অসংখ্য আর্থনীতিক যোগসূত্র দিয়ে বাঁধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি লেদ-যন্ত্র উৎপন্ন করার কাজে নিয়োজিত শ্রম সেই সমস্ত সেলাই-কল-প্রস্তুতকারকের শ্রমের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যারা এই লেদ-যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে, সেই সমস্ত দর্জির শ্রমের সঙ্গে যুক্ত যারা এই সেলাই-কলগুলি ব্যবহার করে পোশাক তৈরির জন্য। অন্য দিকে, একজন লেদ-যন্ত্র-প্রস্তুতকারকের শ্রম যুক্ত সেই সমস্ত ইস্পাত শ্রমিকের শ্রমের সঙ্গে যারা সেই লেদ-যন্ত্রগুলি যা দিয়ে তৈরি সেই ইস্পাত গলিয়েছে, এবং অন্য সেই সমস্ত উদ্যোগের শ্রমিকের শ্রমের সঙ্গে, যে উদ্যোগগুলি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম যুগিয়েছে। অধিকন্তু, আছে ফার্নেস শ্রমিকরা যারা ঢালাই লোহা গলিয়েছে, খনি শ্রমিকরা যারা আকরিক লোহা ও কয়লা নিষ্কাশন করেছে, কোক-প্রস্তুতকারকরা যারা ইস্পাত-গলনের জন্য

কোক উৎপন্ন করেছে। এছাড়াও আছে রসায়নবিদরা যারা লেদ-যন্ত্রগুলির জন্য রঙ উৎপন্ন করেছে, কাঠের মিস্ত্রিরা যারা লেদ-যন্ত্রগুলিকে প্যাক করার জন্য কাঠের বাক্স তৈরি করেছে, সেই বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের শ্রমিকরা যেটি যন্ত্র-নির্মাণ কারখানাকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করেছে, ইত্যাদি। আমরা দেখেছি যে পণ্য উৎপাদনে একটি লেদ-যন্ত্রে মূর্ত লেদ-যন্ত্র-প্রস্তুতকারকের শ্রম একই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শ্রম ও সমস্ত পণ্য উৎপাদকের পরস্পরসম্পর্কিত শ্রমের একটি একক, অর্থাৎ সামাজিক শ্রমের একটি একক। তাই তা প্রকাশ করে আর্থনীতিক সম্পর্ক, পণ্য উৎপাদকদের মধ্যেকার সম্বন্ধ। এটি হল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে স্থাপিত এক পরোক্ষ সম্বন্ধ। একমাত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়েই, একটি পণ্যের মূল্য আরেকটির সঙ্গে সমীকরণ করার মধ্য দিয়েই শ্রমের সামাজিক চরিত্র প্রকাশ পায়। এখানেই আমরা দেখতে পারি একজন বিশেষ দর্জি, চাষী বা ইস্পাত শ্রমিকের শ্রম সমাজের প্রয়োজন কি না, অর্থাৎ এই শ্রম সামাজিক শ্রমের একটি একক হিসেবে স্বীকৃত কি না। একটি পণ্য যদি বিক্রয় হতে পারে তার উৎপাদকের শ্রম স্বীকৃত হয়। যদি পণ্য বিক্রীত না হয়, তার মধ্যে মূর্ত শ্রম সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয় না, এবং তাই তা অপচিত হয় — উৎপাদক ও সমাজের পক্ষে।

সারসংক্ষেপ করে বলতে গেলে, মূল্য হল একটি পণ্যের মধ্যে মূর্ত উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম। মূল্য পণ্য উৎপাদকদের মধ্যেকার সামাজিক উৎপাদন-

সম্পর্ককে প্রকাশ করে এবং নিজের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। শ্রম ব্যয় হল মূল্যের অন্তঃসার। শ্রম হল মূল্যের একমাত্র উৎস ও সৃজক। একমাত্র শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে।

একটি পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের প্রতিদান পাওয়ার জন্য এবং সেটির উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি করার জন্য, পণ্য উৎপাদকদের ক্রয় ও বিক্রয়কর্মে এই পণ্যটির মূল্যের দ্বারা অবশ্যই চালিত হতে হবে। এই পণ্যটি যদি সেটির যথামূল্যের কম মূল্যে বিক্রীত হয়, তা হলে পণ্য উৎপাদক তার শ্রমের জন্য কোনো প্রতিদান পায় না এবং তার জীবন ও কাজের অবস্থার অবনতি ঘটে।

একটি পণ্যের পরস্পরবিরোধী চরিত্র

মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য হল একটি পণ্যের দুটি অবিচ্ছেদ্য গুণ, অনেকটা একটি চুম্বকের দুটি প্রান্তের মতো। এ দুটি তৈরি করে একটি সত্তা এবং স্বতন্ত্রভাবে তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যদিও চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মতো, সে দুটি বিপরীত চরিত্রের।

প্রথম, পণ্যসামগ্রী সেগুলির ব্যবহার-মূল্যের দিক দিয়ে গুণে অথবা পরিমাণে তুলনীয় নয়, অথচ সেগুলির মূল্যের দিক দিয়ে তুলনীয়, উভয় অর্থেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পণ্য হিসেবে একটি কুঠার ও একটি স্যুটের ব্যবহার-মূল্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক, তার কোনো অভিন্ন পরিমাপ নেই। কিন্তু সেগুলির মূল্য প্রমেয়, কেননা কুঠার ও স্যুট উভয়েই তাদের উৎপাদকদের

সামাজিক শ্রমের মূর্তরূপ। শ্রম নিয়োগ তুলনা করে, স্যুটের মূল্যের সঙ্গে কুঠারের মূল্য তুলনা করা সম্ভব এবং প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যে স্যুটটির মূল্য কুঠারের মূল্যের, ধরুন, ২০ গুণ বেশি।

দ্বিতীয়, ব্যবহার-মূল্য একটি পণ্যের সদ্ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর মূল্য সংশ্লিষ্ট বিনিময়ের সঙ্গে। একজন লোক এই দুটি গুণ থেকেই উপকার পেতে পারে না। একটি উশুল হলে আরেকটির উশুল হওয়া বাতিল হয়ে যায়। যে জুতো-প্রস্তুতকারক নিজের তৈরি জুতো পরে এবং এইভাবে সেই জুতোর ব্যবহার-মূল্য উশুল করে, সে সেই জুতো-জোড়ারই মূল্য উশুল করতে পারে না। সেই জুতোর মূল্য উশুল করার জন্য তাকে তা অবশ্যই বিক্রয় করতে হবে, আর তখন সেগুলির ব্যবহার-মূল্য চলে যাবে তার নাগালের বাইরে, কেননা সেই জুতো-জোড়া চলে যাচ্ছে ক্রেতার কাছে, যে সেগুলির ব্যবহার-মূল্য উশুল করবে, অর্থাৎ, পরবে।

তৃতীয়, একটি পণ্য যেহেতু একই সঙ্গে একটি ব্যবহার-মূল্য ও একটি মূল্য হিসেবে উশুল করা যায় না, সেই হেতু এই গুণগুলি উশুল করার জন্য বিশেষ একটা অগ্রাধিকার পালন করতে হবে। একটি পণ্য প্রথমে উশুল হয় একটি মূল্য হিসেবে, তার পরে একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। তবুও এই অগ্রাধিকারের মধ্যে একটা আভ্যন্তরিক স্ববিরোধ আছে। একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে উশুল হতে হলে একটি পণ্যকে অবশ্যই বিক্রীত হতে হবে, অর্থাৎ তার মূল্য প্রথমে

উশুল হতে হবে। কিন্তু, পণ্যটি যাতে বিক্রি হতে পারে তার জন্য উপভোক্তাকে প্রথমে নিঃসংশয় হতে হবে যে সেটির একটি ব্যবহার-মূল্য আছে, সেটি তার কাছে উপযোগী হবে।

এই স্ববিরোধগুলি এক প্রস্ত সংঘাত সৃষ্টি করে। কোনো কোনো পণ্য গুদামে থাকার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অথবা প্রচলিত ফ্যাশনবিরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, এবং তার দরুন, বিক্রয় না-হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সেই পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য তার মূল্য উশুল হওয়াকে ব্যাহত করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, অস্বাভাবিক চড়া দামের জন্য অথবা মালিক বিদ্যমান বাজারের দামে বিক্রয় করতে অসম্মত হওয়ার দরুন একটি পণ্য অ-বিপণনযোগ্য হতে পারে। এখানে, ব্যবহার-মূল্যের উশুল হওয়াটা ব্যাহত হয় মূল্যের দ্বারা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ফলটা এই যে পণ্যটি উপভোক্তার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, এবং তার মধ্যে মূর্ত শ্রম অপচিত হয়। এটা যখন ঘটে, তখন পুঁজিপতিরা কখনও কখনও এই ধরনের পণ্যসামগ্রী নষ্ট করে ফেলে।

শ্রমের দ্বৈত চরিত্র

একটি পণ্যের মধ্যে মূর্ত শ্রমের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলিতে তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলিই প্রতিফলিত হয়। ব্যাপারটা এই যে প্রত্যেক পণ্য উৎপাদকের শ্রমই দ্বৈত চরিত্রের। এক দিকে, তা হল মূর্ত শ্রম, এক

উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয়তা, শ্রমের একটা বিশেষ উপযোগী রূপ। এই অর্থে, বিভিন্ন ধরনের শ্রম, যেমন তেল শ্রমিকের শ্রম এবং রুটি-প্রস্তুতকারকের শ্রমের পার্থক্য থাকে রূপ, উদ্দেশ্য, পেশাগত গুণাবলী, পদ্ধতি ও কাজের চরিত্রে। তারা কাজ করে ভিন্ন-উপকরণ দিয়ে, প্রয়োগ করে ভিন্ন ভিন্ন সাধনী ও কৃৎকৌশল এবং লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন অন্তফল। একজন তেল শ্রমিক কাজে লাগায় তেল-রিগ আর ড্রিলিং যন্ত্র; একজন রুটি-প্রস্তুতকারক কাজে লাগায় চুল্লি আর ট্রে। তাদের কাজের প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক দক্ষতা ও পদ্ধতির দিক দিয়েও তাদের পার্থক্য আছে এবং তাদের কাজের সংগঠন ও ধরনও আলাদা।

লোকেরা তাদের মূর্ত শ্রমের দ্বারা, প্রতিটি বিশেষ কর্ম প্রক্রিয়ার পক্ষে সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশল ব্যবহার করে শ্রম প্রয়োগের বস্তুগুলিকে, যেমন কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণকে পরিবর্তিত করে। সেগুলিকে এক নতুন আকৃতি দিয়ে লোকে তাদের প্রয়োজনের বস্তুগুলি উৎপন্ন করে। মূর্ত শ্রম উৎপন্ন করে বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য। একজন তেল শ্রমিকের শ্রম উৎপন্ন করে তেল, রুটি-প্রস্তুতকারকের শ্রম উৎপন্ন করে রুটি, ইস্পাত শ্রমিকের শ্রম উৎপন্ন করে ইস্পাত ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন সেগুলির সুনির্দিষ্ট রূপের দিক দিয়ে গুণগতভাবে পৃথক হয়। তবুও এই সুনির্দিষ্ট রূপটির বাইরে, সেগুলির অনেক বিষয়ে মিল থাকে। তেল, রুটি ও অন্য সব ধরনের উৎপাদনের

পক্ষেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল, সর্বোপরি, মানবিক কর্মশক্তির ব্যয়, মানসিক ও কায়িক প্রচেষ্টা, মাংসপেশী, মস্তিষ্কের প্রয়োগ। ফলত, সব ধরনের শ্রমেরই এক অভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি আছে। সেগুলি হল শারীরবৃত্তীয় অর্থে মানুষের শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ব্যয়। সব ধরনের শ্রমের পক্ষে আরেকটি অভিন্ন গুণ এই যে সেগুলি পণ্যসামগ্রীতে, সামাজিক শ্রমের এককগুলিতে মূর্ত এবং নিজেদের সেইভাবে প্রকাশ করে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। তেল শ্রমিকের, রুটি-প্রস্তুতকারকের, ইস্পাত শ্রমিকের শ্রম ও অন্য সব পণ্য উৎপাদকের শ্রম — সবই সামাজিক শ্রমের এককগুলির পরিচায়ক।

তাই, একজন পণ্য উৎপাদকের শ্রম, এক দিকে মূর্ত শ্রম, অন্য দিকে তা সাধারণভাবে মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, সামাজিক শ্রমের একটি একক যা বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় তার সামাজিক চরিত্র উন্মোচিত করে। শেষোক্ত দিকটিতে, তা যে কোনো মূর্ত রূপই ধারণ করুক না কেন, পণ্য উৎপাদকদের শ্রমকে বলা হয় **বিমূর্ত শ্রম**। বিমূর্ত শ্রম হল সাধারণভাবে মানবিক শ্রম, তার সামাজিক চরিত্র পণ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত। তার কোনো সুনির্দিষ্ট গুণাবলী নেই এবং তাই সমস্ত পণ্য উৎপাদকের পক্ষে তা গুণগতভাবে সমধর্মী। যে মূর্ত শ্রম ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করে তার বিপরীতরূপে, বিমূর্ত শ্রম মূল্য সৃষ্টি করে। পণ্যসামগ্রীতে মূর্ত বিমূর্ত শ্রম সেগুলিকে করে গুণগতভাবে সমধর্মী ও পরিমাণগতভাবে প্রমেয়। মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর

তুলনা হল জমাট-বাঁধা সমধর্মী বিমূর্ত শ্রমের এককগুলির তুলনা।

পণ্য উৎপাদনে মূর্ত শ্রমের একটা বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত চরিত্র থাকে। তার মানে এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার আধিপত্যের প্রেক্ষিতে, প্রত্যেক পণ্য উৎপাদক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন। সে উৎপাদন চালায় নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে এবং নিজের ঝুঁকিতে, তার পণ্যটির সামাজিক চাহিদা সম্পর্কে আগে থেকে কিছু তার জানা থাকে না। বিমূর্ত শ্রমের চরিত্রটা আলাদা। সামাজিক শ্রমের একটি একক হিসেবে তা উৎপাদনের নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহকে, পণ্য উৎপাদকদের মধ্যেকার আর্থনীতিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে। এ কথা সত্য যে বিমূর্ত শ্রমের সামাজিক চরিত্রটি গোপন থাকে। তা উন্মোচিত হয় পণ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়, শ্রম যখন ব্যয়িত হয় তখন নয়।

মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রম পণ্য উৎপাদকের ক্রিয়াকলাপে মিশে যায় বলে, এই ক্রিয়া দ্বৈত চরিত্রের — ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যে এক বৈরমূলক বিরোধ আছে, এবং সরল পণ্য উৎপাদন ও পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন উভয়েরই এটা প্রধান বিরোধ। এই বিরোধ প্রকাশ পায় পণ্য বিনিময়ে। উৎপাদকরা যখন তাদের পণ্যসামগ্রী বাজারে নিয়ে আসে, তখন তারা আবিষ্কার করে যে শুধু তাদের কারও কারও শ্রমই সমাজের দ্বারা স্বীকৃত, যার ফলে তাদের পক্ষে নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা সম্ভব হয়। বাকিরা তা করতে পারে না। ফলে, কোনো কোনো উৎপাদক

উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে, এমন কি মুনাফাও পেতে পারে, আর অন্যরা সর্বস্বান্ত হয় এবং আর স্বাধীন উৎপাদক থাকে না।

একটি পণ্যের মূল্যের পরিমাণ

পণ্যসামগ্রী ক্রীত ও বিক্রীত হয় বিভিন্ন দামে — কম ও বেশি দামে। একটি পণ্যের দাম কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়?

উত্তরটা পাওয়া যাবে মূল্যের চরিত্রের মধ্যে। যেহেতু মূল্য একটি পণ্যের অঙ্গীভূত বিমূর্ত শ্রম, তাই মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সেই পণ্যটি উৎপন্ন করার জন্য ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। এই শ্রম মাপা হয় তার স্থায়িত্বকাল দিয়ে, কর্ম-সময় দিয়ে। ফলত শ্রমের পরিমাপ, ও তদনুরূপ, মূল্যের পরিমাপ হল **শ্রম-সময়**। যত বেশি বিমূর্ত শ্রম ব্যয়িত হয়, এই ব্যয়গুলি পরিমাপের জন্য শ্রম-সময়ের পরিমাণ তত বেশি হয়, এবং সেই শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য তত বেশি হয়। দুই ঘণ্টার শ্রম-সময়ে যে মূল্য উৎপন্ন হয়, তা এক ঘণ্টায় উৎপন্ন মূল্যের দ্বিগুণ বেশি, তিন ঘণ্টায় — তিনগুণ বেশি।

এখানে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় আরেকটি সমস্যা। দক্ষতা ও প্রচেষ্টার ভিন্ন ভিন্ন স্তর, তথা ভিন্ন ভিন্ন কাজের অবস্থার দরুন, পণ্য উৎপাদকরা অনুরূপ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে। যারা একটা আধুনিক কারখানায় কাজ করে

তারা পণ্যের একটি একক উৎপন্ন করতে তাদের চেয়ে কম সময় ব্যয় করে, যারা কাজ করে একটা গার্হস্থ্য কর্মশালায়। দক্ষ ও সুবিবেকী শ্রমিকরা অদক্ষ বা অলস শ্রমিকের চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে। একটি আধুনিক কারখানায়, একজন লোকের শার্ট তৈরি করতে, ধরুন, মাত্র ১০ মিনিট লাগে, অথচ যে দর্জি বাড়িতে কাজ করে, সে খুব দক্ষ হলেও, ঐরকম একটি শার্ট তৈরি করতে তার অন্তত এক ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাজারে এই সমস্ত শার্টই বিক্রি হবে একই দামে। তা হলে মূল্যের বাস্তব পরিমাণটা কী? তার পরিমাপ হয় কোন শ্রম-সময় দিয়ে?

যেহেতু একজন পণ্য উৎপাদকের শ্রম মূল্যে অঙ্গীভূত থাকে সমধর্মী সামাজিক শ্রমের একটি একক হিসেবে, সেই হেতু তার পরিমাণ প্রতিটি একক উৎপাদক আলোচ্য পণ্যটি তৈরি করতে প্রকৃতপক্ষে কতটা শ্রম-সময় ব্যয় করেছে তা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এই পরিমাণ নির্দিষ্ট ধরনের সমস্ত পণ্যসামগ্রীর পক্ষে অভিন্ন হতে হবে। অন্যথায় সমরূপ পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন মূল্য থাকত, এবং তাই বিভিন্ন দামে বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু এটা মূল্যের চরিত্রেরই বিরোধী। সেই জন্যই একটি পণ্যের মূল্য পরিমাপ করা হয় সেটি উৎপন্ন করার জন্য সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় যে শ্রম-সময় দরকার হয়, তাই দিয়ে, একক শ্রম-সময় দিয়ে নয়।

সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কী? তা হল উৎপাদনের প্রমাণ-ধরনের অবস্থাধীনে এবং নির্দিষ্ট

সমাজের দক্ষতা ও শ্রম-নিবিড়তার গড় স্তরে একটি পণ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যয়িত সময়। উৎপাদনের প্রমাণ-ধরনের অবস্থা হল সেইগুলি যে অবস্থাধীনে একটা নির্দিষ্ট ধরনের বেশির ভাগ পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়। তা হলে দাঁড়ায় এই যে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় সময় নির্ধারিত হয় একটা নির্দিষ্ট শিল্পে অধিকাংশ সংভার প্রস্তুতকারক উদ্যোগগুলিতে নির্দিষ্ট পণ্যটি উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা।

উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্য ধরে নেওয়া যাক যে একই গুণগত উৎকর্ষের ৩,০০,০০০ শার্ট একটি কল্পিত দেশে উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫,০০০ শার্ট উৎপন্ন হয়েছে আধুনিক এক সেলাই কারখানায়, যেখানে সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি প্রযুক্ত হয় এবং তাই একটি শার্ট তৈরি করার জন্য মাত্র ১০ মিনিট ব্যয় হয়ে। আরও ২,৫০,০০০ শার্ট তৈরি হয়েছে সাধারণ গড়পড়তা কারখানাগুলিতে, একটি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয়েছে ১৫ মিনিট। বাকি ১৫,০০০ শার্ট তৈরি হয়েছে গার্হস্থ্য কর্মশালাগুলিতে, সেখানে প্রতিটি শার্ট সেলাই করতে ব্যয় হয়েছে এক ঘণ্টা বা তার বেশি। এটা স্পষ্ট যে উৎপাদনের প্রমাণ-ধরনের অবস্থাগুলি হল গড়পড়তা কারখানার অবস্থা। তা হলে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় সময় হল ১৫ মিনিট। এটাই হল একটি শার্টের মূল্যের পরিমাপ।

শ্রম-উৎপাদনশীলতার উপরে মূল্যের নির্ভরশীলতা

একটি পণ্যের মূল্য অপরিবর্তনীয় নয়। উৎপাদনের বিকাশ ঘটার সঙ্গে তা হ্রাস পায়। ব্রিটেনে এক পাউন্ড ওজনের সুতোর দাম ১৭৮৪ সালে ছিল ১৩০ পেন্সের বেশি, কিন্তু ১৮২৩ সালের মধ্যে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় ১১ পেন্স হয়েছিল। এটা অবশ্য সুদূর অতীতকালের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু রীতিমত সম্প্রতিকালে, ১৯৮২ সালে মাঝারি গুণগত উৎকর্ষের পাটের চলতি দাম ছিল টন-পিছু প্রায় ২৯০ ডলার — ১৯৬২ সালের দামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অন্য বহু পণ্যসামগ্রীর দামের বেলাতেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যায়। মূল্যের পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। মূল বিষয়টি হল শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা, বা শ্রম দক্ষতা, হল শ্রম-সময়ের একক-পিছু উৎপাদের একটা পরিমাণ উৎপন্ন করার জন্য শ্রমের ক্ষমতা। বিশেষভাবে, তার পরিমাপ হয় প্রতি ঘণ্টায় (দিনে, প্রভৃতিতে) উৎপন্ন তেল, যন্ত্রাংশ, পাঁউরুটি, প্রভৃতির পরিমাণ দিয়ে। শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের এক প্রণালীতন্ত্রের উপরে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রযুক্তিগত প্রগতি — সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদন-প্রক্রিয়াসমূহের উন্নতি। নতুন যন্ত্রপাতির কল্যাণে উৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেক কম সময় দরকার হয়। শ্রমের যন্ত্রীকরণ ও উৎপাদনের অটোমেশনের দ্বারা সবচেয়ে দর্শনীয় ফল পাওয়া যায়। শিকাগোর কোনো

এক শিল্পোদ্যোগে ১৬টি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশল চালিয়ে ৪ জন শ্রমিক যত গ্রামোফোন রেকর্ড উৎপন্ন করে, সেটা পুরনো কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে ২৫০ জন শ্রমিক যত উৎপন্ন করে তার ৮ গুণ বেশি। অন্য যেসব বিষয় শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ায় সেগুলি হল উন্নততর দক্ষতা, উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থাপনা, বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলি প্রয়োগ এবং প্রাকৃতিক সহায়-সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।

একটি দেশের প্রযুক্তিগত স্তর যত উঁচু এবং সেখানকার শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ার যত দক্ষ, সেই দেশের শ্রম-উৎপাদনশীলতা তত বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের প্রযুক্তিবিদ্যার স্তর ও মানুষের শ্রমশক্তির শিক্ষা ও দক্ষতার দিক দিয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তাদের নিম্নতর শ্রম-উৎপাদনশীলতার কারণ সেটাই। কোনো কোনো আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে শিল্প শ্রম-উৎপাদনশীলতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ নিচে।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ, শ্রম-সময়ের একক-পিছু যত বেশি উৎপাদ উৎপন্ন হয়, পণ্যের একটি এককে অঙ্গীভূত শ্রমনিয়োগ তত হ্রাস পায়। আমাদের বক্তব্যটা বোঝানোর জন্য ধরে নেওয়া যাক যে একজন বিশেষ মুচি ৮ ঘণ্টার এক কর্ম-দিবসে ২ জোড়া বুটজুতো তৈরি করে। তা হলে ১ জোড়ার মূল্য পরিমাপ করা হয় ৪ ঘণ্টার শ্রম-সময় দিয়ে (৮ ঘণ্টা:২=৪ ঘণ্টা)। যদি আমাদের এই মুচি

আরও ভালো হাতিয়ারপত্র ও উন্নততর দক্ষতার কল্যাণে তার শ্রম-উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বাড়ায়, তা হলে প্রতি ৮ ঘণ্টার কাজে সে ৪ জোড়া তৈরি করতে পারবে, অর্থাৎ, তার শ্রম ব্যয় প্রতি জোড়া জুতো-পিছু ৪ ঘণ্টার শ্রম-সময় থেকে কমে ২ ঘণ্টায় দাঁড়াবে (৮ ঘণ্টা:৪=২ ঘণ্টা)। এইভাবে, শ্রম-উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এক জোড়া জুতো তৈরির কাজে ব্যয়িত শ্রম ৪ ঘণ্টা থেকে কমে ২ ঘণ্টা হয়েছে, অর্থাৎ অর্ধাংশ কমেছে। তদনুযায়ী, এক জোড়া বুটজুতোর মূল্যও হ্রাস পায় অর্ধাংশ। এই সরল দৃষ্টান্তটি থেকে দেখা যায় যে মূল্য হল শ্রম-উৎপাদনশীলতার বিপরীত আনুপাতিক: শ্রম-উৎপাদনশীলতা যত বেশি, পণ্যের একটি এককের মূল্য তদনুযায়ী তত কম।

উৎপাদনে নৈরাজ্য

পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির মধ্যে এক বেড়া সৃষ্টি করে, ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিদের স্বার্থের সংঘাত বাধায়। উৎপাদনকর্ম সংগঠিত করার সময়ে একজন পুঁজিপতি উদ্যোগপতি কাজ করে তার নিজের ঝুঁকিতে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকই ইচ্ছামতো ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কারও সঙ্গে তার সিদ্ধান্তের সমন্বয় না করে সে নিজেই স্থির করে কী ধরনের পণ্য আর কোন পরিমাণে উৎপাদন করবে। কতটা পরিমাণ উৎপাদ সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে

কিংবা শেষ পর্যন্ত তা বিপণনের অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে কি না, সেটা যথার্থভাবে জানার কোনো উপায় নেই তার।

এই অবস্থায়, আলাদা একেকটি উদ্যোগ, গোটা শিল্প-শাখা কিংবা এমন কি একটি দেশের সমগ্র অর্থনীতির বিকাশও অত্যন্ত অনিশ্চিত ব্যাপার। এক বছরে কিংবা ধরুন পাঁচ বছরে একটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কী ঘটবে, নিশ্চিতভাবে তার পূর্বাভাস করতে কেউই সক্ষম নয়। কেউই একটা তেজি ভাব বা সংকট ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখতে পারে না, কিংবা কী পরিমাণ ও কী ধরনের সব পণ্য উৎপন্ন হবে এবং কীভাবে সেগুলি বিক্রয় হবে তার পূর্বাভাস করতে পারে না। অসংখ্য আশাবাদী কথাবার্তা সত্ত্বেও, উৎপাদনে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ আর আর্থনীতিক পূর্বাভাসের জন্য কম্পিউটর প্রয়োগে পরিস্থিতির কোনো সুরাহা হয় না। বুর্জোয়া অর্থনীতি বিকাশলাভ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ঠিক যেমনভাবে তা করেছিল পুঁজিবাদের গোড়ার পর্যায়ে। নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাই তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। নিজেদের উদ্যোগগুলির সম্পূর্ণ অধীশ্বর হয়েও পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্ধ শক্তির গোলাম।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির নৈরাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পুঁজিপতি উদ্যোগপতিরা সবচেয়ে লাভজনক পণ্য উৎপাদনের অবস্থার জন্য এবং পণ্য বিক্রয়ের জন্য, আরও বেশি

মুনাফার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রত্যেকে লড়াই করে জেতার জন্য, চেষ্টা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলতে ও ধ্বংস করতে। প্রত্যেকেই বাকি সকলের বিরুদ্ধে যে কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত, আবার বাকি সকলেও তার বিরুদ্ধে একই প্রকার উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত।

মূল্যের নিয়ম

নৈরাজ্য আর প্রতিযোগিতার জঙ্গলে পুঁজিপতি উদ্যোগপতিরা দিক খুঁজে পায় কীভাবে? তাদের ক্রিয়াকলাপ-নিয়ন্ত্রক স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিটা কী? এখানে প্রধান বিষয় হল মূল্যের নিয়ম। এই নিয়মের অর্থ এই যে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম ব্যয় দিয়ে। এর দরুন পণ্য উৎপাদকদের সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম ব্যয়কে হিসাবে ধরতে হয় এবং তা হ্রাস করার চেষ্টা করতে হয়।

মূল্যের নিয়ম কাজ করে দামের বন্দোবস্তটির মধ্য দিয়ে, দাম হল অর্থে অভিব্যক্ত মূল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম অভিব্যক্ত হয় ডলারে ও সেন্টে, ভারতে — রুপিয়ায় ও পয়সায়, জাম্বিয়ায় — কোয়াচায়, আঙ্গোলায় — কোয়ানজায়, ইথিওপিয়ায় — বির-এ, ইত্যাদি।

তত্ত্বগতভাবে, একটি পণ্যের দাম তার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। অথচ প্রকৃতপক্ষে, দাম গঠনের ব্যাপারটা বাজারে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। অন্যান্য

জিনিসের মধ্যে, যোগান ও চাহিদার মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা দাম প্রভাবিত হয়। চাহিদা সরবরাহের সমান হলে, একটি পণ্যের দাম তার মূল্যের সমান। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, হয় চাহিদার চেয়ে একটি পণ্যের যোগান বেশি, না হয় তার উল্টো। যখন খুব বেশি পণ্য উৎপন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হয়, তখন আলোচ্য পণ্যটির দাম তার মূল্যের চেয়ে কম হয়। এবং বিপরীতভাবে, উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ যদি উপভোক্তাদের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট বেশি নয় হয়, অর্থাৎ চাহিদা যদি যোগানের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে পণ্যটির দাম তার মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। উভয় ক্ষেত্রেই দামের ওঠাপড়া ঘটে মূল্যকে কেন্দ্র করে।

মূল্যকে কেন্দ্র করে দামের ওঠাপড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপরে প্রচণ্ড ফল-প্রভাব বিস্তার করে। সত্যিই, একটি বিশেষ উদ্যোগ, ধরুন, সেলাই কারখানা, যদি উপভোক্তাদের প্রয়োজনের চেয়ে কম ট্রাউজার্স তৈরি করে থাকে তা হলে চাহিদাটা যোগানোর চেয়ে বেশি হয়। ফলে, ট্রাউজার্সের দাম বাড়ানো হয়, বিক্রেতা একটা অতিরিক্ত মুনাফা পায়। এক জোড়া ট্রাউজার্সের উৎপাদন-ব্যয় ২০ ডলার হলে, এই ট্রাউজার্স দিয়ে বাজারে ২৪ ডলার দাম পাওয়া যেতে পারে। ৪ ডলারের এই অতিরিক্ত মুনাফা হল মূল্য ও দামের মধ্যেকার পার্থক্য (২৪ ডলার–২০ ডলার=৪ ডলার), এবং ট্রাউজার্স উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য পুঁজিপতিদের কাছে সংকেত। এই শিল্প-শাখার

ম্যানুফ্যাকচারাররা দ্রুত উৎপাদন সম্প্রসারিত করবে। এই শিল্প অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ ভোগ করবে। ফলত, যোগান বেড়ে নিয়ে চাহিদার সমান হয়ে যাবে, অথবা চাহিদাকে ছাপিয়ে যাবে।

উপভোক্তারা যত পণ্য ক্রয় করবে, একটি শিল্প যখন তার চেয়ে বেশি পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে, তখন দেখা দেয় এক ভিন্ন পরিস্থিতি। চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হয়, এবং ধরুন একটি স্কার্টের দাম তার মূল্যের নিচে নেমে আসে। ধরা যাক যে একটি স্কার্টের মূল্য ১২ ডলার এবং বাজার দাম ৯ ডলার এর ফলে পুঁজিপতিরা স্কার্টের ব্যবসা করে প্রত্যেক পণ্য পিছু ৩ ডলার করে হারায় (১২ ডলার–৯ ডলার=৩ ডলার)। অন্য উদ্যোগপতিদের চেয়ে তারা খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে, তাদের মুনাফা কমে যায়, কখনও কখনও তাদের পুরোপুরি লোকসানও হয়। লোকসান কমানোর জন্য ও দাম বাড়ানোর জন্য উদ্যোগপতিরা স্কার্টের উৎপাদন কমিয়ে দেবে। এই ব্যবস্থাটা স্কার্টের যোগান কমিয়ে চাহিদার সমান পর্যায়ে নিয়ে আসবে, অন্তত সাময়িকভাবে।

সুতরাং দামের ওঠাপড়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদনের মুনাফাপ্রদতায় ওঠাপড়াই পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের বাড়া-কমার জন্য দায়ী। ভাষান্তরে, মূল্যের নিয়মই হল পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের এক স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রক। একটি অর্থনীতির ভিতরে শ্রম ও পুঁজি একটি শাখা থেকে অন্য শাখায় পুনঃস্থানান্তরিত হয় ও তার শিল্প

কাঠামোতে পরিবর্তনগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই থেকে। সামরিক উৎপাদন পুঁজিবাদী বিনিয়োগের পক্ষে বিশেষ লাভজনক একটা এলাকা, কেননা তা থেকে সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে স্থিতিশীল মুনাফা পাওয়া যায়। বিরাট অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক শিল্প-সমাহারের ভিতরকার বিশাল বিশাল শিল্প কর্পোরেশন অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শান্তিকে বিপন্ন করে। তারা যুদ্ধোন্মাদনায় ইন্ধন যোগায়, সামরিক প্রস্তুতি বাড়িয়ে তোলে এবং সামরিক ক্ষমতার নিয়ত বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়াস পায়।

মূল্যের নিয়ম শিল্প-শাখার মধ্যে অনুপাতকে প্রভাবিত করে এবং উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিকাশকেও নিয়ন্ত্রণ করে, প্রযুক্তিগত উন্নতিগুলিকে প্রেরণা যোগায় এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে উদ্দীপিত করে। কীভাবে তা কাজ করে, দেখা যাক।

নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন করে একজন পুঁজিপতি তার উদ্যোগে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করতে পারে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় ব্যয়ের চেয়েও কম স্তরে। সেই সঙ্গে, সে তার উৎপাদ বিক্রি করে চলে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দামে। এর কল্যাণে সে একটা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে। তাকে ধরে ফেলতে ইচ্ছুক অন্য উদ্যোগপতিরাও নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন করে এবং উৎপাদনকে উন্নত করে। এইভাবে, নির্ভেজাল ব্যক্তিগত সুবিধাসন্ধানী বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্যোগপতির একক ক্রিয়ার ফলে

প্রযুক্তিগত প্রগতি অর্জিত হয় এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ঘটে।

মূল্যের নিয়ম পুঁজিবাদী উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রযুক্তিগত প্রগতির সহায়ক হয় বলে আমরা কি ধরে নেব যে সেটা একটা জাদুশক্তি, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নৈরাজ্যে একটা শৃংখলাবিধান করছে? অবশ্যই না। মূল্যের নিয়ম ক্রিয়া করে এক স্বতঃস্ফূর্ত, অন্ধ শক্তি হিসেবে। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক হওয়া সত্ত্বেও তা উৎপাদনের অনুপাতহীনতা রোধ করতে পারে না। আর্থনীতিক অনুপাতহীনতাগুলি ঘটে যাওয়ার পরেই, উৎপাদনের বিকাশকে মন্থর করে ফেলার পরেই, যথেষ্ট আর্থনীতিক লোকসান ঘটানোর এবং শ্রম ও পুঁজির ব্যয়কে নিষ্ফল করে ফেলার পরেই তা আর্থনীতিক অনুপাতহীনতাগুলির সংকেত দেয়। মূল্যের নিয়মের ক্রিয়া প্রযুক্তিগত বিকাশকে প্রভাবান্বিত করে অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী ধরনে। উদ্যোগপতিদের নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করতে বাধ্য করে তা সেই সমস্ত উদ্যোগের প্রতিকূল অবস্থা ঘটায়, যেগুলির শ্রম-উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সংগঠন নিম্নতর স্তরের। এই ধরনের উদ্যোগগুলির মালিকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাগাল ধরতে অপারগ হয়ে ব্যবসায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং তাদের শ্রমিকরা যোগ দেয় বেকারদের দলে।

এটি হল মূল্যের নিয়মের ক্রিয়ার আরও একটি দিক: তা পণ্য উৎপাদকদের বর্গ-বিভাজন ঘটায়। তার ক্রিয়া আর্থনীতিক অসাম্য ও প্রতিযোগিতামূলক

সংগ্রাম বাড়ায়। ফলে, পুঁজিপতিদের আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী মুনাফা করে এবং তাদের উদ্যোগগুলি সম্প্রসারিত করে। তাদের অবস্থানগুলি সুদৃঢ় হয়, তাদের পরাক্রম ও ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু উদ্যোগপতিদের আরও একটি গোষ্ঠী আছে, যারা মার খায় এবং ব্যবসায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেকানেক ক্ষেত্রেই ছোট উদ্যোগপতিদের, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিগুলির মালিকদের, অর্থাৎ কৃষক ও কারুশিল্পীদের এটাই হল ভাগ্য। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তারা সর্বস্বান্ত হয় এবং চাকরির সন্ধান করতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খামারগুলির সংখ্যা ১৯৩৫ সালের ৬৮ লক্ষ থেকে কমে গিয়ে ১৯৬০ সালে হয়েছিল ৩৯ লক্ষ এবং ১৯৮০ সালে ২৪ লক্ষ। মোটের উপরে, ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বস্বান্ত হয়েছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ খামারি, অথবা সেখানকার সমগ্র কৃষিজীবী জনসমষ্টির ৫০ শতাংশ।

পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতিরা

উৎপাদন সংগঠিত করার সময়ে, একজন পুঁজিপতির লক্ষ্যটা একজন সরল পণ্য উৎপাদকের — একজন কারুশিল্পী বা কৃষকের লক্ষ্যের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা থাকে। শেষোক্তজন নিজেই পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে, এবং সে যে উৎপাদনের উপায়গুলি প্রয়োগ করে সেগুলির মালিক সে নিজেই। তার উদ্দেশ্য হল তার উৎপাদগুলি বিক্রয় করা এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে

তার নিজস্ব চাহিদা (খাদ্য, পোশাক, জুতো, প্রভৃতি) পূরণ করার জন্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা, নিজের ব্যয় পোষানো এবং আরও উৎপাদনের সংস্থান করা।

সেই রকম, একজন পুঁজিপতি তার উৎপাদ বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তা ব্যবহার করতে চায় তার খরচ তুলে আনার জন্য এবং নিজস্ব চাহিদা পূরণ করার জন্য। কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা সর্বাধিক মাত্রায় বাড়ানো, তার সম্পদ বাড়ানো। ১,০০,০০০ ডলার ব্যয় করার পর, পুঁজিপতি তার উৎপাদটি বিক্রি করতে চাইবে, ধরুন, অন্তত ১,২০,০০০ ডলারে। আগাম দেওয়া পুঁজি (১,০০,০০০ ডলার) আর বিক্রয় বাবদ আয় (১,২০,০০০ ডলার) এই দুয়ের মধ্যে তফাৎটা হল ২০,০০০ ডলার। তার পুঁজির সঙ্গে এই সংযোজনই উদ্বৃত্ত পুঁজি বা উদ্বৃত্ত-মূল্য।

এই উদ্বৃত্তের উৎস কী? যদি ধরে নেওয়া যায় যে পুঁজিপতি তার উৎপাদটি মূল্যের সমান দামে বিক্রি করে, তা হলে সে তার পণ্যসামগ্রী বিনিময় করবে সেগুলির মূল্যের একেবারে তুল্যমূল্য অর্থে। ১,০০,০০০ ডলার মূল্যের পণ্যসামগ্রীর জন্য সে পাবে সেগুলির মূল্যের তুল্যমূল্য, অর্থাৎ সেই একই ১,০০,০০০ ডলারই, তার এক সেণ্টও বেশি নয়।

আমরা যদি ধরে নিই যে পুঁজিপতি মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তার উৎপাদটি বিক্রি করে, তা হলেও আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎসটি ব্যাখ্যা করতে পারি না। মূল্যের চেয়ে ২০ শতাংশ দাম বাড়িয়ে সে পণ্যগুলি ১,০০,০০০ ডলারের পরিবর্তে ১,২০,০০০ ডলারে

বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু অন্য সমস্ত উদ্যোগপতিও একই কাজ করবে। তারা তাদের স্বার্থের বিনিময়ে তাকে তার মুনাফা সর্বাধিক বাড়াতে দিতে পারে না। ফলে আমাদের পুঁজিপতিকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হবে ২০ শতাংশ বর্ধিত দামে। আগে সে যেসব জিনিস ১,০০,০০০ ডলার দিয়ে কিনতে পারত, এখন সেগুলির জন্য তাকে দিতে হবে ১,২০,০০০ ডলার। সুতরাং বিক্রেতা হিসেবে সে যে ২০,০০০ ডলার লাভ করেছিল, ক্রেতা হিসেবে সেই পরিমাণটাই সে হারাবে। সে আর মুনাফা করতে পারবে না।

এতে এটাই বোঝায় যে পণ্য বিনিময় নিজে থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে পারে না। আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগ ঘুরে দেখা যাক।

অধ্যায় ২

পুঁজিবাদী উদ্যোগ

পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির বিবিধ রূপ

প্রথম পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি ছিল ছোট ছোট কারিগরি কর্মশালা, সেখানে নিযুক্ত হত মজুরি শ্রম। সেখানে সমবেত একই বৃত্তির শ্রমিকরা অর্ডার নিত কর্মশালা-মালিকের কাছ থেকে। ১৬শ শতাব্দীতেই, ইংরেজ বণিকরা ১০ বা ১২টি তাঁত কিনে একটিমাত্র কর্মশালায় স্থাপন করত, এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক তাঁতীদের ভাড়া করত। অনুরূপভাবেই চালিত কামারশালা, জুতো-তৈরি, সেলাই ও অন্যান্য কর্মশালাও দেখা দিল।

শুরুতে, পুঁজিবাদী কর্মশালাগুলি ছিল খুবই ছোট, সেখানে নিয়োগ করা হত ৬ থেকে ১০ জন, কখনও বা ২০ জন পর্যন্ত শ্রমিক। ভূতপূর্ব স্বাধীন দেউলিয়া কারুশিল্পীদের বা

গরিব কৃষকদের সেখানে নিয়োগ করা হত। কর্মশালার ভিতরে কোনো শ্রম বিভাজন ছিল না। সব লোকই সদৃশ কাজ করত। স্বাধীন স্ব-নির্ভর কারুশিল্পীদের মতোই সমান আদিম ধরনের সাধিত্র ব্যবহার করত। পুঁজিবাদী উদ্যোগের এই প্রথম আদিম রূপটিকে বলা হয় **সরল পুঁজিবাদী সহযোগিতা।**

সরল পুঁজিবাদী সহযোগিতা পুঁজিবাদী উদ্যোগের এক উচ্চতর রূপের ভিত্তি স্থাপন করেছিল: তা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল **পুঁজিবাদী ম্যানুফ্যাকচার** দিয়ে। পুঁজিবাদের ম্যানুফ্যাকচার পর্বটি ঘটেছিল মধ্য-১৬শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ অবধি। তার আগেকার সরল সহযোগিতার মতোই, ম্যানুফ্যাকচারের ভিত্তি ছিল কায়িক শ্রম ও হাতে চালানো সাধিত্র। সরল সহযোগিতার সঙ্গে তফাৎ ছিল এইখানে যে শ্রমিকরা সদৃশ কাজ করত না। প্রতিটি শ্রমিক তার বিশেষ কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করত, এক ধরনের উৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখত। অর্থাৎ, ভাড়াটে শ্রমিকদের মধ্যে একটা শ্রম বিভাজন ছিল। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচার হল হাতে চালানো সাধিত্র ও শ্রম বিভাজনের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

দুই ধরনের ম্যানুফ্যাকচার ছিল। প্রথমটিতে ছিল বিশেষীকরণ, যার দ্বারা শ্রমিকরা উৎপন্ন করত বিভিন্ন অংশ, তার পর সেগুলি সংযোজন করে একটি সম্পূর্ণকৃত উৎপাদ তৈরি হত। যে সমস্ত ম্যানুফ্যাকচার ঘড়ি, কোচ, সিন্দুক ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করত,

সেগুলি কাজ করত সেইভাবেই। দ্বিতীয় ধরনের ম্যানুফ্যাকচারগুলিতে শ্রমিকরা বিশেষ পারদর্শিতা আয়ত্ত করত উৎপাদন ক্রিয়াগুলিতে — প্রতিটি শ্রমিক একটিমাত্র ক্রিয়ায়। উৎপাদন ক্রিয়াগুলি সংযুক্ত ছিল একটি মালার মতো, তৈরি উৎপাদটি হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসত একটি সম্পূর্ণকৃত উৎপাদ হিসেবে। পিন, কাগজ, বোতল ও অন্য আরও কিছু জিনিসের উৎপাদন হত সেই ছক অনুসারে।

ম্যানুফ্যাকচারগুলিতে শ্রম বিভাজনের ফলে সাধিত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের যথেষ্ট বিশেষীকরণ ঘটেছিল। প্রতিটি উৎপাদন ক্রিয়ার জন্য বিশেষ এক প্রস্ত সাধিত্র তৈরি হয়েছিল, তাই সেগুলির যে নিয়ত উন্নতি ঘটানো হত তাতে বিস্ময়ের কিছু নয়। শ্রম বিশেষীকরণ ও উৎপাদনের সাধিত্রগুলির উন্নয়ন ম্যানুফ্যাকচার-ধাঁচের উদ্যোগকে শ্রম-উৎপাদনশীলতা অনেকখানি বাড়ানোর কাজে সাহায্য করেছিল। পিন তৈরির একটি কারখানায় ১০ জন শ্রমিক তৈরি করত দিনে ৪৮,০০০ পিন, অথবা শ্রমিক পিছু ৪,৮০০ পিন। ইতিমধ্যে, যদি শ্রম বিভাজন ও সাধিত্রগুলির বিশেষীকরণ না হত, তা হলে একজন শ্রমিক তৈরি করত দিনে বড়জোর ২০টি পিন।

ম্যানুফ্যাকচার উদ্যোগ যন্ত্রপাতি দিয়ে হাতের শ্রমকে প্রতিস্থাপিত করার অবস্থা গড়ে তুলল। তার উত্তরকালে এল শ্রম বিভাজন ও **যন্ত্রপাতি**-ভিত্তিক পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

পুঁজিবাদই যন্ত্রপাতির বিকাশের অবস্থা

যুগিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল যন্ত্রগুলি প্রতিস্থাপিত হচ্ছিল আধুনিকতর যন্ত্র দিয়ে। ২০শ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনে অটোমেশনের বিস্তৃত ব্যবহার। তা শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, এবং তাই বাড়ায় উদ্যোগগুলির উৎপাদনক্ষমতা। অবশ্য বৃদ্ধির হারটা বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন। শিল্পোৎপাদনের স্তরের দিক দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির চেয়ে অনেক পিছনে রয়েছে। যদিও বিশ্বের অসমাজতান্ত্রিক অংশের অধিবাসীদের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করে, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে সেখানে প্রক্রিয়ণ শিল্পের শুধুমাত্র ১৩·৫ শতাংশ উৎপাদ উৎপাদিত হয়েছে। যথাক্রমে এই সব দেশে পুঁজিবাদী জগতের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের শুধু ৫·৮ শতাংশ, ধাতুপ্রক্রিয়ণ শিল্পের ৬·৬ শতাংশ উৎপাদ এবং ৯·৫ শতাংশ ইস্পাত উৎপন্ন হয়েছে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে পুঁজিবাদী মালিকানা

পুঁজিবাদী উদ্যোগের রূপটি যাই হোক না কেন, অপরিহার্যভাবেই তা বেষ্টন করে দুটি বিপরীত শক্তিকে: এক দিকে, পুঁজিপতি, আর অন্য দিকে, মজুরি শ্রমিক।

পুঁজিপতি হল উদ্যোগটির মালিক। তারই হাতে রয়েছে সমস্ত পুঁজি ও অন্য সমস্ত সহায়-সম্পদ। সে প্রকৃতপক্ষে শ্রমে অংশগ্রহণ করে না, বরং যে উৎপাদনের

উপায়ের সে মালিক, তাকে সে ব্যবহার করে মজুরি শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য এবং এইভাবে তার পুঁজি বাড়ানোর জন্য।

মজুরি শ্রমিকেরা কোনো উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয়। পুঁজিপতির জন্য ও তার নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করার জন্য তাদের ভাড়া করা হয়। যেসব পণ্য তারা তৈরি করে, তারা সেগুলির মালিক নয়। এই পণ্যগুলির একমাত্র মালিক হল পুঁজিপতি। পুঁজিবাদে, শোষক সমাজের যে কোনো পূর্ববর্তী রূপের মতোই, শ্রমের উৎপাদগুলি প্রকৃত প্রস্তুতকারকদের সম্পত্তি নয়, বরং উৎপাদনের উপায়ের মালিকের সম্পত্তি।

উৎপাদনের উপায়ের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার অনেকগুলি রূপ আছে। প্রথমটি হল একক পুঁজিবাদী মালিকানা — যখন উদ্যোগটির মালিক একজন মাত্র পুঁজিপতি। মালিকানার এই রূপটি বিশেষভাবে বহুবিস্তৃত ছিল পুঁজিবাদী বিকাশের গোড়ার পর্যায়গুলিতে।

পুঁজিবাদী মালিকানার আরেকটি রূপ হল কর্পোরেট বা যৌথ মালিকানা, যার দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় একদল পুঁজিপতি, কোনো একজন পুঁজিপতি নয়। সাধারণত, এরূপ এক গোষ্ঠীর সদস্যরা একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি গঠন করে। আজকাল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদী মালিকানার এই রূপটিই প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোদ্যোগগুলির মোট সংখ্যায়

কর্পোরেশনগুলির (জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির) ভাগটা ১৯০৪ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫২ শতাংশ। মোট শিল্পোৎপাদনে তাদের ভাগটা তদনুযায়ী ৭৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৩ শতাংশ। একজন ব্যক্তির চালানো উদ্যোগগুলির বেশির ভাগই আজ দেখা যায় কৃষি উৎপাদনে ও কৃত্যক ক্ষেত্রে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় মালিকানা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করে। এটি হল পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার এক বিশেষ রূপ, যার দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং তা আগের মতো পুঁজিপতিদের স্বার্থ পূরণ করে চলে।

পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার রাজ্য পুঁজিবাদী সমাজে অপরিসীম। মেহনতি মানুষ তার সারা জীবন ধরে টের পায় পুঁজির, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বত্র বিরাজমান অস্তিত্ব। সে বাস করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এক গৃহে, কাজ করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগে, সামগ্রী ক্রয় করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দোকানে, ইত্যাদি।

পুঁজির প্রারম্ভিক সঞ্চয়ন

একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট প্রারম্ভিক পুঁজি দরকার হয়। বুর্জোয়া পণ্ডিতরা, এবং বিশেষত যেসব লেখক একটি ধনী পুঁজিবাদী

পরিবারের ইতিহাস লেখেন তাঁরা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন যে শ্রমশীলতা আর মিতব্যয়িতার বুর্জোয়া গুণগুলির কল্যাণেই পুঁজির আবির্ভাব ঘটেছিল। পাঠকদের এটা বিশ্বাস করানো হয় যে শুরুতে পুঁজি সৃষ্ট হয়েছিল পুঁজিপতিদের দ্বারাই, তারা না কি হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করেছিল এবং প্রতিটি কপর্দক সাশ্রয় করেছিল।

কিন্তু, আর্থনীতিক ইতিহাস সম্পর্কে অপক্ষপাত ও প্রগাঢ় অধ্যয়ন করলে, পুঁজিবাদের উদ্ভবের বাস্তব তথ্যের পরিচয় নিলে দেখা যায় যে আসল অবস্থার সঙ্গে এই ভাষ্যের কোনোই সম্পর্ক নেই। পুঁজিবাদী উদ্যোগের পথিকৃৎরা যে পুঁজি রাশীকৃত করেছিল, তা অর্থ-সাশ্রয় আর পরিশ্রমের ফল ছিল না। তা রাশীকৃত করা হয়েছিল লুণ্ঠন, হিংসা, রাহাজানি, জুয়াচুরি আর প্রতারণার মধ্য দিয়ে।

গোড়ার দিকের পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির সম্ভারটা বেশ বড় মাত্রাতেই এসেছিল উপনিবেশগুলির উপরে নির্মম লুণ্ঠন থেকে, যে লুণ্ঠনের ফলে প্রায়শ সেখানকার দেশীয় জনসমষ্টির সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ ঘটেছে। ১৫০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২০ শতকোটি ডলার মূল্যের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ।

ক্রীতদাস ব্যবসায় ছিল বিপুল মুনাফার উৎস। ২০০ বছরে শুধু মধ্য আফ্রিকাতেই ক্রীতদাস ব্যবসায়ের কবলস্থ হয়েছিল অন্তত ১০ কোটি মানুষ; এর মধ্যে

৭ কোটি মারা গিয়েছিল আমেরিকান উপনিবেশগুলিতে চালান যাওয়ার সময়ে।

অনায়াসে অর্থোপার্জনের ফিকিরে যারা ছিল, তারা ক্রীতদাস ব্যবসায় থেকে বিপুল সম্পদ জমিয়েছিল। ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে ক্রীতদাস চালান দেওয়ার জন্য ১৭৯২ সালে ১৩২টি জাহাজের একটি বহর ছিল।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা তোলা হয়েছিল। ১৬শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে গোলমরিচ, কাঁচা রেশম ও লবঙ্গের দাম পাওয়া যেত ভারতের তুলনায় যথাক্রমে ৮ গুণ, ১০ গুণ ও ২১ গুণ বেশি। সব শেষে, যদিও গুরুত্বে ন্যূন নয়, প্রথম উৎপাদনী পুঁজি গড়ে তোলার হাতিয়ার ছিল লুণ্ঠন ও কুসীদবৃত্তি। প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়েছিল সংরক্ষণ নীতির দ্বারা — ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বাণিজ্যের জন্য সরকারি রক্ষণব্যবস্থার দ্বারা।

২০শ শতাব্দীর পুঁজি তার অস্তিত্বের জন্য মিতব্যয়িতা বা সৌভাগ্য, কোনোটির কাছেই ঋণী নয়। সর্বদা যেমন হয়েছে, সে পুঁজিও রাশীকৃত হয়েছিল শোষণ, প্রতারণা আর অপরাধের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকলেই জানে যে মার্কিন কোটিপতি জন পিয়েরপন্ট মর্গ্যান তাঁর প্রথম ব্যবসায়িক কারবারে মার্কিন সরকারকে ঠকিয়েছিলেন সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে। আরেকজন মার্কিন কোটিপতি হ্যারল্ডসন লাফায়েট হাণ্ট তাঁর ব্যবসায় জীবন শুরু করেছিলেন তাসের বাজিতে জুয়াচুরি করে জিতে। তিনি তাঁর প্রথম

তেল-কূপটি কিনেছিলেন একজন লোকের কাছ থেকে, যার মৃত্যু হয়েছিল অদ্ভুত ও রহস্যজনক অবস্থায়।

পুঁজির গঠনকাঠামো

একটি কারখানা, বা খনি, অথবা অন্য যে কোনো উদ্যোগ নির্মাণে ব্যবহৃত পুঁজি গোড়ায় পুঁজিপতির দ্বারা আগাম দেওয়া হয় অর্থের একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের রূপে; সেই অর্থকে পুঁজিপতি ভাগ করে দুই অংশে।

একটি অংশ দিয়ে পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায় ক্রয় করে। এই অংশটিকে বলা হয় **স্থির পুঁজি** (সপু)। আগাম দেওয়া অর্থ-পুঁজির অন্য অংশটি ব্যবহৃত হয় শ্রমিকদের ভাড়া নেওয়ার জন্য। শ্রমিকদের তা দেওয়া হয় মজুরি ও বেতনের রূপে। আগাম দেওয়া পুঁজির এই অংশটিকে বলা হয় **অস্থির পুঁজি** (অপু)।

স্থির পুঁজি আবার দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি ব্যবহৃত হয় শ্রমের উপকরণ ক্রয় করার জন্য: ইমারত নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, সাধিত্র ও পরিবহণ ক্রয় করার জন্য। পুঁজির এই অংশটি পুঁজিপতির দ্বারা বার বার ব্যবহার করা যায়: কারখানার একটি ইমারত ব্যবহার করা যায় ৫০ বছর বা ততোধিক কাল, একটি মেশিন-টুল ব্যবহার করা যায় ৮ থেকে ১০ বছর, ইত্যাদি। স্থির পুঁজির দ্বিতীয় অংশটি ব্যবহৃত হয় শ্রম প্রয়োগের বস্তুগুলি ক্রয় করার জন্য: কাঁচামাল, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি। শ্রম প্রয়োগের বস্তুগুলি প্রতিটি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত

হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বেকারির ইমারত, আর চুল্লি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় বহু বছর ধরে, অথচ ময়দা, ঈস্ট, চিনি, প্রভৃতি বেকিংয়ে প্রত্যেকবার সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যায়।

পুঁজিবাদের বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি আয়তনে বাড়ে। ১৮৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসেসিং শিল্পে পুঁজির মোট মূল্য ছিল ১০·১ শতকোটি ডলার। ১৯২৯ সালে তা ছিল ৯০·১ শতকোটি ডলার, এবং ১৯৬৯ সালে ছিল ৬৮৮·৩ শতকোটি ডলার। অর্থাৎ, ১৮৮৯ থেকে ১৯৬৯ — এই ৮০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প পুঁজি বেড়েছিল ৬৮·১ গুণ।

পুঁজির আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গঠনকাঠামো বদলায়। স্থির পুঁজি বিশেষ দ্রুতভাবে বাড়ে প্রযুক্তিগত প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। পুঁজিপতি ক্রয় করে আরও বেশি জটিল, তাই আরও বেশি ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রপাতি, আরও বেশি ব্যয় করে সাজসরঞ্জাম ও উপকরণের পিছনে। ১৮৮৯ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসেসিং শিল্পে মোট স্থির পুঁজি বেড়েছিল ৭৪ গুণ, ৮·৩ শতকোটি ডলার থেকে ৬১৪·১ শতকোটি ডলার।

অস্থির পুঁজি বাড়ে মন্থরতর হারে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসেসিং শিল্পে তা ১৮৮৯ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে বেড়েছিল ১·৮ শতকোটি ডলার থেকে ৭৪·৩ শতকোটি ডলার, বা ৪১·৩ গুণ, প্রথমোক্ত ব্যাপারটির চেয়ে যা স্পষ্টতই অনেক কম।

পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, বৃদ্ধিহারের পার্থক্য মোট পুঁজি সংভারে স্থির পুঁজির অংশটিকে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দেয়। বিশেষভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসেসিং শিল্পগুলিতে নিযুক্ত মোট পুঁজিতে স্থির পুঁজির অংশটি ১৮৮৯ সালে ৮২·২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালে হয়েছিল ৮৯·২ শতাংশ। সেই একই কালপর্বে, অস্থির পুঁজির অংশটি ১৭·৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছিল ১০·৮ শতাংশ। অস্থির পুঁজির সঙ্গে স্থির পুঁজির অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছিল তদনুযায়ী: ৪·৬:১ থেকে ৮·৩:১।

শ্রমশক্তি

পুঁজিপতি তার উদ্যোগে কাজ করার জন্য শ্রমিককে ভাড়া করে। শ্রমিক পুরোপুরি পুঁজিপতির অধীনস্থ, সে কাজ করে পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাকে যা করতে বলা হয় সে তাই করে। শ্রমিক একজন পুঁজিপতির উদ্যোগে কাজের সন্ধান করে কিসের জন্য? পুঁজিপতির জন্য কাজ করতে সে বাধ্য হয় কেন?

উত্তরটা এই যে পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায়ের একমাত্র মালিক হল পুঁজিপতি ও ভূস্বামীরা। শ্রমিকের কাছে কোনো উৎপাদনের উপায় নেই। তার যেটা আছে তা হল কাজ করার সামর্থ্য, তার কায়িক ও মানসিক ক্ষমতা: শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, ইত্যাদি। এই ক্ষমতাগুলির কল্যাণেই শ্রমিক শ্রম করতে ও কিছু কিছু সামগ্রী প্রস্তুত করতে সক্ষম। শ্রমিকের শ্রম করার ক্ষমতা হল তার **শ্রমশক্তি**। জীবন্ত, বিকাশশীল মানুষের

মধ্যে শ্রমশক্তি অঙ্গীভূত। মানুষ হল শ্রমশক্তির মূর্তরূপ।

শ্রমশক্তি ও শ্রম সদৃশ জিনিস নয়। শ্রমশক্তি হল শ্রম করার সামর্থ্য, আর শ্রম হল শ্রমশক্তির ব্যয়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তার কার্যকর ব্যবহার। দর্জির শ্রমশক্তি প্রকাশ পায় তার পোশাক সেলাই করার সামর্থ্যে, আর তার শ্রম হল পোশাক প্রস্তুত করার আসল ক্রিয়াটা। সেই রকম, ইস্পাত শ্রমিকের শ্রমশক্তি হল তার ইস্পাত গলানোর সামর্থ্য। এই সামর্থ্যের উশুল হওয়াটাই, ইস্পাত-গলানোর আসল ক্রিয়াটাই, তার শ্রম। শ্রম চলাকালে শ্রমশক্তি যুক্ত হয় উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে এবং সেই উপায়গুলিকে কাজে লাগায়, কতকগুলি সামগ্রী প্রস্তুত হওয়ার ব্যবস্থা করে।

পুঁজিবাদে শ্রমিকের কোনো উৎপাদনের উপায় নেই বলে সে তার নিজের শ্রমশক্তিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম। উৎপাদনের উপায় ছাড়া শ্রম সম্পন্ন করা যায় না এবং উৎপাদসমূহ প্রস্তুত করা যায় না। সুতরাং নিজের জীবনধারণের উদ্দেশ্যে, নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের সংস্থান করার জন্য শ্রমিক তার নিজের একমাত্র জিনিসটি — তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অন্য বিকল্পটা হল জীবনধারণের উপায়ের অভাবহেতু অনাহার বা মৃত্যু। স্পষ্টতই, শ্রমিককে তার নিজ শ্রমশক্তির একজন ক্রেতার সন্ধান করতে হয়, আর এই ক্রেতাকে সে খুঁজে পায় সেই মূর্তিমান পুঁজিপতির মধ্যে — উৎপাদনের উপায়ের যে মালিক।

শ্রমিকের শ্রম করার সামর্থ্যের ক্রয় ও বিক্রয় এটাই বোঝায় যে পুঁজিবাদে শ্রমশক্তি একটি পণ্য। শ্রমশক্তির একটি পণ্যে পরিবর্তন সম্ভব ও প্রয়োজনীয় হয়েছিল দুটি আর্থনীতিক শর্তের দরুন।

প্রথম শর্ত হল শ্রমিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। নিজের শ্রমশক্তি অবাধে বিক্রি করতে সক্ষম হতে হলে শ্রমিককে অবশ্যই আইনত স্বাধীন হতে হবে, তাকে অবশ্যই হতে হবে নিজের শ্রমশক্তির মালিক। সামন্ততন্ত্রে যে ভূমিদাসপ্রথা মজুরকে তার প্রভুর ব্যক্তিগত বন্ধনদশায় আবদ্ধ করে রেখেছিল, সেই ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ এই অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় শর্ত হল উৎপাদনের উপায় থেকে মজুরের বঞ্চিত হওয়া। বস্তুতই, যে কৃষক তার নিজস্ব উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে কাজ করে সে নিজেই নিজের জন্য অন্নসংস্থান করে এবং নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করার প্রয়োজন তার হয় না। যে কারিগরের নিজস্ব একটা কর্মশালা আছে তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষক বা কারিগর যদি তার সেই সম্বলটুকু হারায়, এবং সেই সঙ্গে জীবনধারণের উপায় হারায়, তা হলে তার কর্মসংস্থানের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেবে, ফলে সে যোগ দেবে ভাড়াটে শ্রমিকের পংক্তিতে।

পুঁজিবাদের গোড়ার পর্যায়গুলিতে কৃষক ও কারিগরদের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় কেড়ে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবেই নিষ্ঠুর সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

পূর্বপুরুষরা যেসব জমির পরিচর্যা করেছিল সেখান থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। বারোয়ারি জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জমি-পরিবেষ্টনের ফলে, ১৬শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের পথে-পথে ঘুরে বেড়াত ভবঘুরে আর ভিখারীর দল। জায়মান পুঁজির সেবা করার জন্য তারা যাতে কাজ খুঁজতে বাধ্য হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অনেকগুলি আইন জারি করেছিল। অষ্টম হেনরির ১৫৩০ সালের আইন অনুযায়ী, সক্ষমদেহী ভবঘুরেদের বেত্রাঘাত করা হত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। প্রতিরোধ করলে, ঠেলাগাড়ির সঙ্গে বেঁধে তাদের প্রহার করা হত রক্তপাত হওয়ার আগে পর্যন্ত। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ১৫৪৭ সালে হুকুম দিয়েছিলেন যে কাজে যারা ফাঁকি দেবে, তাদের গায়ে তপ্ত লোহা দিয়ে দেগে দেওয়া হবে, ক্রীতদাস হিসেবে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হবে, অথবা এমন কি প্রাণনাশও করা হবে। রাণী এলিজাবেথ ছিলেন আরও কম করুণাময়ী। তাঁর শাসনকালে, ১৬শ শতাব্দীর শেষে, জারি করা আইনগুলিতে সমান অথবা আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাদের কোনো কাজ ছিল না এবং জীবনধারণের কোনো উপায় ছিল না, প্রথমে তাদের প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত করা হত এবং বাঁ কানে তপ্ত লোহা দিয়ে দেগে দেওয়া হত, তার পরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধী হিসেবে হত্যা করা হত। এই সমস্ত পদ্ধতির সাহায্যেই — বেত্রাঘাত, তপ্ত লোহা দিয়ে দেগে দেওয়া, আর মৃত্যুদণ্ডের হুমকি — উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত কৃষক ও

কারিগরদের বাধ্য করা হয়েছিল পুঁজিবাদী উদ্যোগে কাজ করতে; এইভাবেই তারা শিখেছিল ভাড়াটে শ্রমের নিয়মানুবর্তিতা।

শ্রমশক্তির মূল্য

পুঁজিবাদে শ্রমশক্তি একটি পণ্য, এবং সেই হেতু তার মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য আছে।

শ্রমশক্তি একটি পণ্য বলে, তার মূল্য নির্ধারিত হয় এই পণ্যটি উৎপন্ন বা পুনরুৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে। শ্রমশক্তি পুনরুৎপন্ন করার মানে হল শ্রমিককে ও তার পরিবারকে কোনোমতে জীবনধারণোপযোগী স্তরে ভরণপোষণ, অর্থাৎ উৎপাদনকর্মে যে কর্মশক্তি ব্যবহৃত হয়ে যায় তা পুনরুদ্ধার করার জন্য শ্রমিকের পক্ষে যে স্তরটা যথেষ্ট, সেই স্তরে ভরণপোষণ। সুতরাং শ্রমশক্তি পুনরুৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়টাকে জীবনধারণের অত্যাবশ্যক উপায়গুলি উৎপন্ন করার প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। ভাষান্তরে, শ্রমশক্তির মূল্য হল শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়গুলির মূল্যের সমান।

শ্রমিকের জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপায়গুলির মূল্যের চারটি বড় অঙ্গ-উপাদান আমরা আলাদা করে বেছে নিতে পারি:

(১) শ্রমিকের শারীরিক ক্ষমতা বজায় রাখা ও

তার শারীরিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য, অর্থাৎ তার কাজের সামর্থ্য পুনরুৎপাদন করা ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায় বাবদ ব্যয়। এর মধ্যে পড়ে খাদ্য, জামা-কাপড়, জুতো, বাসস্থান, উত্তাপন, বিদ্যুৎশক্তি, গৃহস্থালির বাসন-কোসন, ওষুধপত্র, ইত্যাদি বাবদ ব্যয়;

(২) শ্রমিকের পরিবারের জন্য জীবনধারণের উপায় বাবদ ব্যয়। বার্ধক্য, রোগ বা মৃত্যুর দরুন যারা অন্তর্হিত হয় তাদের প্রতিস্থাপিত করার জন্য নতুন শ্রম-বাহিনীর নিয়ত অন্তঃপ্রবাহ ছাড়া উৎপাদন কাজ করতে বা সম্প্রসারিত হতে পারে না;

(৩) শ্রমিককে তার বৃত্তির জন্য তালিম দেওয়ার প্রয়োজনীয় উপায় বাবদ ব্যয়। এই অঙ্গ-উপাদানটি বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রগতির দরুন; এই প্রগতি শ্রমিকদের কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আরও বেশি উচ্চ স্তর দাবি করে;

(৪) শ্রমিকের যে সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা ঐতিহাসিক বিকাশের ফলস্বরূপ, সেগুলি পূরণ করার উপায় বাবদ ব্যয়। এগুলির মধ্যে আছে ন্যূনতম সংখ্যায় বই, সংবাদপত্র ও পত্রিকা, সিনেমার টিকিট, রেডিও, ইত্যাদি।

এই অঙ্গ-উপাদানগুলির অনুপাত ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, আর্থনীতিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও অন্যান্য বিশিষ্টতার দরুন। তাই শ্রমশক্তির মূল্যের

তারতম্য ঘটে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। অনেক জাতীয় প্রভেদ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীতপ্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকদের গরম জামা-কাপড়, জুতো ও উত্তাপনের জন্য অনেক খরচ করতে হয়। উষ্ণ পেশগুলিতে এ ধরনের খরচের কোনো দরকার হয় না।

চাহিদাগুলির আয়তন, এবং তাই শ্রমশক্তির মূল্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অনেকখানি বেশি। একটা দৃষ্টান্ত হল শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের পার্থক্য। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাকালের গড় দৈর্ঘ্য ছিল ১২ বছর (অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য) থেকে ১২·৪ বছর (দক্ষ শ্রমিক ও ফোরম্যানদের জন্য)। সেই সময়ে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসমষ্টির মধ্যে নিরক্ষর ছিল ৭০ কোটি। তাই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি: বছরে মাথা-পিছু গড়ে ৩১৪ ডলার, যেখানে শেষোক্ত ক্ষেত্রে তা ছিল মাত্র ২৪ ডলার (তের গুণ পার্থক্য)। শ্রমশক্তির অন্য অঙ্গ-উপাদানগুলির মূল্যের পার্থক্যও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮০-র দশকের মধ্যকালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড় মাথা-পিছু পুষ্টি হল ২,৩১৯ ক্যালরি, আফ্রিকায় ও ভারতে যথাক্রমে ২,২২৯ ও ২,০৩০ ক্যালরি। এক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় ১·৫ গুণ। তা ছাড়া, মাংস ও অন্যান্য পশুজাত প্রোটিনের মতো আহার্যের অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যয়সাপেক্ষ অঙ্গ-উপাদানগুলির গড়

মাথা-পিছু ভোগ উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৮০ শতাংশ কম এবং স্নেহপদার্থের ভোগ ৩·৫ গুণ কম।

শ্রমশক্তির মূল্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেও বদলায়। তা প্রভাবিত হয়, এক দিকে, শ্রমিকদের চাহিদার আয়তন ও গঠনকাঠামোর দ্বারা, যোগ্যতার উচ্চতর স্তর, জীবনের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সম্প্রসারণশীল সংগ্রাম এবং উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান শ্রম-নিবিড়তার দ্বারা। এই সমস্ত বিষয়ই শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ায়। এটা পরিষ্কার যে একজন শ্রমিকের যত বেশি চাহিদা থাকে এবং তার শিক্ষা ও কাজের তালিম বাবদ যত বেশি খরচ করা হয়, সেই শ্রমিকের শ্রম-সামর্থ্য পুনরুৎপাদন করার জন্য তত বেশি খরচ করা হবে। পরিবহণ ও গৃহস্থালির অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি (গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি, টেলিফোন, জলের সরবরাহ, ইত্যাদি) বাবদ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ও শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ায়।

কিন্তু এমন কতকগুলি শক্তিশালী বিষয়ও আছে, যেগুলি শ্রমশক্তির মূল্য কমায়। সর্বোপরি, তা হল শ্রম-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। তা জীবনধারণের উপায়গুলির মূল্য হ্রাস করে, এবং এর সঙ্গে হ্রাস করে শ্রমশক্তির মূল্য। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকদের পরিবারগুলির — স্ত্রী ও সন্তানদের — তথা বিদেশী শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমানরূপে জড়িত হওয়া, এবং শ্রমিকদের মৌল স্বার্থগুলির উপরে পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ সেই দিকে কাজ করে।

পুঁজিপতি যে শ্রমশক্তি কেনে, তার দাম সে মেটায় কীভাবে? সে শ্রমিকদের যে মজুরি দেয় তাই দিয়ে। পুঁজিবাদে মজুরি হল অর্থের পরিভাষায় অভিব্যক্ত শ্রমশক্তির মূল্য (দাম)। অন্য যে কোনো পণ্যের বেলায় যেমন হয়, পুঁজিপতি তেমনি শ্রমশক্তি ক্রয় করতে চায় তার মূল্যের চেয়ে সস্তায়। সেই জন্যই সে মজুরি কমানোর ও শ্রমিকদের অধিকার খর্বিত করার সম্ভাব্য সমস্ত পথের সন্ধান করে।

শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্য

পুঁজিপতি শ্রমশক্তির দাম দেয়, এবং প্রতিদানে পায় এই পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য। সে তার নিজের স্বার্থে যেমন ইচ্ছা তাকে কাজে লাগাতে পারে।

শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্য অন্য সমস্ত পণ্যের ব্যবহার-মূল্য থেকে আলাদা। শেষোক্তটি শুধু মূল্যের মূর্তরূপ, পক্ষান্তরে শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্য মূল্য সৃষ্টি করে। শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্য হল শ্রম প্রক্রিয়ায় ভাড়াটে শ্রমিকের সেই মূল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা, যা শ্রমশক্তির মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। শ্রমশক্তির এই সহজাত গুণটিই পুঁজিপতির মুনাফার উৎস। এর জন্যই সে তার উদ্যোগে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে মজুরি শ্রমিককে যুক্ত করে রাখে। তার মালিকানার অধিকারের সদ্ব্যবহার করে সে মজুরি শ্রমিককে শোষণ করে। যে ক্ষমতা পুঁজিপতিকে চালিত করে তা হল মুনাফার প্রলোভন।

অধ্যায় ৩

উদ্বৃত্ত-মূল্য কীভাবে সৃষ্টি হয়

একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগে মজুরি শ্রমিক যে উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে, সেগুলির মালিক হল পুঁজিপতি, যে সমস্ত পণ্য তৈরি করে সেগুলিরও আবার মালিক হল পুঁজিপতি, এবং সে সেগুলি বাজারে বিক্রি করে। শ্রমিকের মূর্ত শ্রম পণ্যগুলির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, আর তার বিমূর্ত শ্রম সৃষ্টি করে পণ্যগুলির মূল্য।

আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ও আবশ্যকীয় শ্রম

পুঁজিবাদী উদ্যোগে কর্ম-দিবসের গোটা পর্যায়টা ধরে, প্রথম থেকে শেষ মিনিটটি পর্যন্ত, শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্টি হয় ব্যবহার-মূল্য ও মূল্য,

দুটোই। একটি কর্ম-দিবসের মধ্যে শ্রমিক কী মূল্য সৃষ্টি করে? শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের সঙ্গে এই মূল্যের অনুপাত কী রকম?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য ধরে নেওয়া যাক যে একটি উন্নয়নশীল দেশে এক সেলাই কারখানায় জনৈক বিশেষ কল্পিত শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। কারখানাটি 'মিকি মাউসের' ছবিওয়ালা শিশুদের টি-শার্ট বানায়। শ্রমিকের শ্রমশক্তির এক দিনের মূল্য ২ ডলারের সমান। অনেক উন্নয়নশীল দেশেই জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির নিযুক্ত শ্রমিকরা শ্রমশক্তির বিনিময়ে যা পায়, এটা অল্পবিস্তর তার সমান। আরও ধরে নেওয়া যাক যে ১ ঘণ্টায় শ্রমিক সৃষ্টি করে ১ ডলারের সমান মূল্য। তা হলে, প্রথম ঘণ্টায় সেই শ্রমিক সেলাই করবে, বলা যাক, ৩টা শার্ট এবং সৃষ্টি করবে ১ ডলারের সমান মূল্য। তার কাজের দ্বিতীয় ঘণ্টাতেও সে তাই করবে। সুতরাং ২ ঘণ্টায় সে সেলাই করবে ৬টি শার্ট এবং ২ ডলারের সমান নতুন মূল্য সৃষ্টি করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূল্যটি শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের সমান। অর্থাৎ, মাত্র ২ ঘণ্টায় শ্রমিক তার শ্রমশক্তির তুল্যমূল্য সৃষ্টি করতে এবং তার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বাবদ খরচ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম।

এই ২ ঘণ্টা হল **আবশ্যকীয় শ্রম-সময়**, অর্থাৎ সেই সময় যার ভিতরে শ্রমশক্তির তুল্যমূল্য উৎপাদিত হয়। আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের ভিতরে ব্যয়িত শ্রম হল **আবশ্যকীয় শ্রম**। আবশ্যকীয় শ্রম সম্পন্ন না করলে

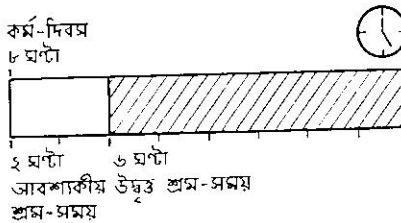
শ্রমিক উৎপাদনের খরচ পুনর্ভরণ ও তার শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করার মতো অবস্থায় আসতে পারে না।

উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত শ্রম

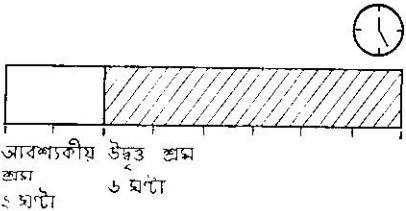
পুঁজিপতিই যেহেতু পুঁজিবাদী উদ্যোগটিতে তৈরি পণ্যসামগ্রীর সমগ্র সংভারের মালিক, সেই হেতু শ্রমিক দুই ঘণ্টায় যে শার্টগুলি বানিয়েছে সেগুলি সে বিক্রি করে দিতে পারে এবং শ্রমিককে সে যে ২ ডলার দিয়েছে সেটা ফেরৎ পেতে পারে। এইভাবে সে এক সেণ্টও লোকসান না-করে তার অস্থির পুঁজি খরচ পুরোপুরি পুষিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে একটি সেণ্টও লাভ করবে না। পুঁজিপতি যেহেতু মুনাফার খাতিরেই উৎপাদনে নিযুক্ত, তাই প্রথম ২ ঘণ্টার শ্রম শেষ হয়ে গেলে সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে না। শ্রমিককে দিয়ে সে দুই ঘণ্টার আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত সময় শ্রম করাবে। তার পক্ষে এটা সম্পূর্ণ আইনসংগত। সে শ্রমশক্তি কিনেছে, তার দাম দিয়েছে, তাই সে যেমনভাবে খুশি তার ব্যবহার-মূল্যকে নিয়োগ করতে পারে। পুঁজিপতির কাছে নতিস্বীকার করতে, তার কাছ থেকে আদেশ নিতে শ্রমিক বাধ্য। অন্যথায়, শ্রমিক বরখাস্ত হয়ে যাবে। সে যদি পথে দাঁড়ায়, তা হলে সে নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে পারবে না।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই কাজের সপ্তাহের দৈর্ঘ্য হল ৪৮ ঘণ্টা, প্রতি বছর কাজের সপ্তাহ হল ৫০। তার মানে এই যে প্রত্যেক শ্রমিক গড়ে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করে। তা হলে এটা ধরে নেওয়াই যুক্তিসংগত যে আমাদের ক্ষেত্রেও, সেলাই কারখানার শ্রমিকটির কর্ম-দিবস ৮ ঘণ্টার। ২ ঘণ্টার আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের পরিবর্তে, তার মালিক তাকে দিয়ে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করায়: ২ ঘণ্টা আবশ্যকীয় শ্রম-সময় যোগ ৬ ঘণ্টা। এই ৬ ঘণ্টাই **উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়**, অর্থাৎ আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত শ্রম-সময়। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে শ্রমিকের করা শ্রম হল **উদ্বৃত্ত শ্রম।**

সুতরাং একজন ভাড়াটে শ্রমিকের কর্ম-দিবসে থাকে দুটি অংশ: (১) আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ও (২) উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। নিচের চিত্রটি থেকে এটা পরিষ্কার হয়:



শ্রম-সময়ে শ্রমের গঠনকাঠামোটা হবে এই রকম:



উদ্বৃত্ত-মূল্য

উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে, ঠিক আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের মতোই, শ্রমিক তার মূর্ত শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে ব্যবহার-মূল্য এবং তার বিমূর্ত শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে মূল্য। আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ে সে যেমন কাজ করে সেই একই গতিতে, একই উৎপাদনশীলতা ও নিবিড়তায় সে কাজ করে। সুতরাং ৬ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত শ্রমের সময়ে আমাদের শ্রমিকটি তৈরি করবে ১৮টি শার্ট (৩×৬= ১৮) এই ৬ ঘণ্টায় এই পণ্যগুলিতে সে অঙ্গীভূত করবে ৬ ডলারের সমান নতুন মূল্য (১ ডলার×৬ ঘণ্টা=৬ ডলার)। আগে সৃষ্ট মূল্যের সঙ্গে এই নতুন মূল্য যোগ হল। এটাই **উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

আমরা দেখেছি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একমাত্র উৎস হল ভাড়াটে শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রম। এই মূল্য সৃষ্টি হয় একমাত্র ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা। কিন্তু তা শ্রমিকদের কাছে যায় না, তার একটি সেণ্টও না। পুঁজিবাদী উদ্যোগটিতে তৈরি পণ্যগুলি পুঁজিপতিরই সম্পত্তি

বলে, সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যই তার হাতে পড়ে। উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে পুঁজিপতির কোনো খরচ লাগে না। সে তা কেনে না: পায় বিনামূল্যে।

তা হলে দাঁড়ায় এই যে উদ্বৃত্ত **শ্রম-সময়ে ভাড়াটে শ্রমিকদের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট ও পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত মূল্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য।** তা হল শ্রমিকদের দ্বারা নিজেদের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত সৃষ্ট মূল্য। তা হল প্রলেতারিয়েতের পারিশ্রমিক না-দেওয়া শ্রমের ফল, আর বুর্জোয়াদের সম্পদের উৎস। উদ্বৃত্ত-মূল্য শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার আর্থনীতিক যোগসূত্র, উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপযোজন ও ব্যবহারই গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি।

উদ্বৃত্ত উৎপাদ হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের বস্তুগত অভিব্যক্তি। তা হল মোট উৎপাদের সেই অংশ যেটা সাক্ষাৎ উৎপাদকরা সৃষ্টি করে তাদের আবশ্যকীয় উৎপাদটির অতিরিক্ত। উদ্বৃত্ত-মূল্য আর উদ্বৃত্ত উৎপাদ সদৃশ জিনিস নয়। প্রথমত, তাদের পার্থক্য এইখানে যে প্রথমটি হল মূল্য আর দ্বিতীয়টি ব্যবহার-মূল্য। দ্বিতীয়ত, উদ্বৃত্ত উৎপাদ সৃষ্ট হয় মূর্ত শ্রমের দ্বারা, আর উদ্বৃত্ত-মূল্য — বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা। এবং শেষত, উদ্বৃত্ত উৎপাদ উৎপন্ন হয় প্রত্যেক বিকাশপ্রাপ্ত সমাজে, আর উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্ট হয় একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজে। তা বুর্জোয়া সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদের এক সুনির্দিষ্ট রূপের পরিচায়ক, ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা তার মূল্য সৃষ্ট হয় এবং উপযোজিত হয় অন্য শ্রেণীগুলির উপরে

পরগাছাসুলভ পুঁজিপতিদের দ্বারা।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করার সময়ে পুঁজিপতি যুগপৎ উদ্বৃত্ত উৎপাদটিও উপযোজন করে। তা একটিই ক্রিয়া। উদ্বৃত্ত উৎপাদ পুঁজিপতির কাছে যায় তার উদ্যোগের উৎপন্ন সমস্ত সামগ্রীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। এই উৎপন্ন সামগ্রী সে যখন বিক্রয় করে, সে পায় একটা উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা অর্থের রূপ ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদ (ব্যবহার-মূল্যগুলির সাকল্য) চলে যায় ক্রেতার কাছে, সে এই ব্যবহার-মূল্যগুলি কাজে লাগায়।

পুঁজিবাদী শোষণের মূলনীতি

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ও উপযোজনই পুঁজিবাদী শোষণের মূল রহস্য। পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন করতে যে শ্রম-সময় দরকার হয় তার চেয়ে বেশি সময় তাকে দিয়ে কাজ করায়। সে শ্রমিকের শ্রমের ফলটি পুরোপুরি উপযোজন করার জন্য উৎপাদনের উপায়ের মালিক হিসেবে তার অধিকার ব্যবহার করে।

পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্য যত বিরাটই হোক না কেন, পুঁজিবাদী শোষণের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হয় মূল্যের নিয়ম দিয়ে, তা কোনোক্রমেই এই নিয়মের বিরোধী নয়। বস্তুতপক্ষে, পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায় ও শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে এই পণ্যগুলির মূল্যের তুল্যমূল্য এক দামে। অনুরূপভাবে, তার উদ্যোগটিতে প্রস্তুত

পণ্যগুলি সে বিক্রয় করে সেগুলির মূল্যের তুল্যমূল্য এক দামে। ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াগুলিতে বজায়-রাখা এই তুল্যতা, বিদ্যমান পণ্য-অর্থ সম্পর্কগুলি, এই ক্রিয়াগুলিতে সহজাত পুঁজিবাদী শোষণের রূপটিকে ঢেকে রাখে। সেগুলি সৃষ্টি করে এমন একজন ভাড়াটে শ্রমিকের ভাবমূর্তি, যে পুঁজিপতির মতোই মুক্তস্বাধীন এবং সমান অধিকার ভোগ করে। মনে হয় যেন শ্রমিক আর পুঁজিপতি প্রবৃত্ত হয় তুল্যমূল্যগুলির স্বতঃপ্রণোদিত বিনিময়ে। উভয়েই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করে।

এ কথা সত্যি যে শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপায় ক্রয় ও চূড়ান্ত উৎপাদটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তুল্যতা বিপর্যস্ত হওয়ার দরুন উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় না। মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় বা মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়ের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য সারগতভাবে সম্পর্কিত নয়। আমরা দেখেছি, তা উদ্ভূত হয়, কারণ পুঁজিপতি কেনে একটি বিশেষ পণ্য — শ্রমশক্তি; সেটিকে কাজে লাগানোর সময়ে, সে শ্রমিককে দিয়ে সৃষ্টি করায় — পারিশ্রমিক না-দিয়ে — তার শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত এক নতুন মূল্য। সুতরাং আইনগত সমান বিনিময়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে উৎপাদনে এক উৎকট আর্থনীতিক অসাম্য। পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায়ের মালিক — শ্রমিক কোনো উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয়। পুঁজিপতি শ্রম করে না — শ্রমিক কঠোর শ্রম করে। পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে, তাকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে নিজের জন্য কাজ করায় —

শ্রমিক হল পুঁজিবাদী শোষণের পাত্র, তার পারিশ্রমিকহীন শ্রম উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে — শ্রমিক তা থেকে কিছুই পায় না। তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য তাকে ইতিপূর্বেই প্রদান করা হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়মকানুন এই বিধানই দেয় যে এই তুল্যমূল্য ছাড়া, সামান্য মজুরি ছাড়া, আর কিছু পাওয়ার অধিকার নেই শ্রমিকের।

ভাড়াটে শ্রমিকদের পুঁজিবাদী শোষণ সারগতভাবেই নিষ্ঠুর ও নির্মম। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শারীরিক সামর্থ্য, স্বাস্থ্য বা মর্যাদার কোনো ধারই ধারে না। এই নির্মম তাড়না হৃদয়-মনকে ঊষর করে ফেলে, শ্রমিকের অকালবার্ধক্য ঘটায়। লভ্য সমস্ত উপায়কে নিয়োজিত করা হয় পুঁজির সেবায় এবং ব্যবহার করা হয় সম্ভাব্য সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার জন্য।

বুর্জোয়া সমাজের অধিবক্তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে পুঁজিবাদী শোষণ বলে কোনো জিনিস নেই, এবং পুঁজিপতিও একজন মেহনতি, সেও শ্রমিকের মতোই কঠোর ও নিবিড়ভাবে কাজ করে। তাঁরা দাবি করেন যে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে বলে — শ্রমিক করে একজন প্রকৃত সম্পাদনকারীর কাজ, আর পুঁজিপতি করে সংগঠক ও ব্যবস্থাপকের কাজ — তারা ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার পায়: শ্রমিক — মজুরি, পুঁজিপতি — মুনাফা। এইভাবে বুর্জোয়া মতবাদে মুনাফাকে বর্ণনা করা হয় পুঁজিবাদী শোষণের ফল হিসেবে নয়, বরং এক 'ন্যায়সংগত শ্রমের

পারিশ্রমিক' হিসেবে, যেটা পুঁজিপতি পায় তার উদ্যমশীলতার জন্য এবং সে তার উদ্যোগটিতে যে সমস্ত প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ ঘটায় তার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনে অংশগ্রহণের এই দুটি ধরন কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। পুঁজিপতি শ্রমিকের মতো শ্রম করে না। কোনো উৎপাদনী ক্রিয়া সে করে না। সাধারণত উৎপাদনের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনাতেও পুঁজিপতি নিযুক্ত থাকে না। এই উদ্দেশ্যে সে ইঞ্জিনিয়ার আর ম্যানেজারদের ভাড়া করে। একমাত্র যে কাজটি পুঁজিপতি করে তা হল ভাড়াটে শ্রমিককে দিয়ে যত বেশি সম্ভব উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করানোর চেষ্টায় সেই শ্রমিককে শোষণ করা।

মুনাফা হল উৎপাদনে বিনিয়োজিত পুঁজিপতির পুঁজি থেকে সুদ ও লভ্যাংশের জন্য অপেক্ষা করে থাকার সঙ্গে জড়িত গোড়ার দিকের 'কৃচ্ছ্রতা', 'বিলম্ব', 'ঝুঁকি', 'ঝঞ্ঝাট' অথবা 'দুশ্চিন্তার' জন্য পুঁজিপতির পুরস্কার — এই সব বক্তব্যও ভিত্তিহীন। ঝঞ্ঝাট আর দুশ্চিন্তার জন্য যদি এত দাম পাওয়া যেত, তা হলে বেকাররাই হত পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে ধনী বর্গ। বেকাররাই তাদের শোচনীয় অস্তিত্ব আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করে। তাদের ভাগ্যে কী ঝঞ্ঝাট অপেক্ষা করে আছে সেই আশংকায় তারাই সব সময়ে দিন কাটায়। কিন্তু বেকাররা ধনী হয় না, ধনী হয় পুঁজিপতিরা। তা ছাড়া পুঁজিপতিদের দিক থেকে বলার মতো কোনো 'কৃচ্ছ্রতাই' থাকে না, উপভোগে কোনো বিলম্ব ঘটে না

বা এই বিলম্বে কোনো দুশ্চিন্তাও হয় না। বরং থাকে মাত্রাতিরিক্ত বিলাসব্যসন, পরগাছাসুলভ ভোগ। অতিকথাটির বিপরীতরূপে, পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করে ভোগে বহু-কথিত 'আত্ম-সংযমের' ফলে নয়, বরং মজুরি শ্রমের উপরে শোষণ নিবিড় করে তোলার ফলে।

উপরে আলোচিত তত্ত্বগত দৃষ্টান্তটির গণ্ডী প্রসারিত করে, ধরা যাক যে আলোচ্য কারখানায় নিযুক্ত আছে ৩০০ শ্রমিক। আবশ্যকীয় সময়ে তারা বানায় ১,৮০০ শার্ট (৬×৩০০=১,৮০০) এবং সৃষ্টি করে তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের সমান ৬০০ ডলারের নতুন মূল্য (২×৩০০=৬০০)। উদ্বৃত্ত সময়ে তারা বানায় ৫,৪০০ শার্ট (১৮×৩০০=৫,৪০০), অর্থাৎ, ১,৮০০ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে (৬×৩০০=১,৮০০)। শ্রমিকদের মূর্ত শ্রমের দৈনিক মোট উৎপাদ হল ৭,২০০ শার্ট (১,৮০০+৫,৪০০=৭,২০০), বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট ২,৪০০ ডলারের নতুন মূল্য যার অঙ্গীভূত (৬০০+১,৮০০=২,৪০০)। এই ২,৪০০ ডলারের মধ্যে ১,৮০০ ডলার উপযোজিত হয় পুঁজিপতির দ্বারা — পুঁজিপতির দ্বারা এই কারখানার ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণের এটাই হল আসল ফল।

মূর্ত শ্রম ও উৎপাদনের উপায়ের মূল্য-স্থানান্তরণ

প্রত্যহ বানানো ৭,২০০ শার্টেরই মোট মূল্য কি ২,৪০০ ডলারের সমান? না, তা ২,৪০০ ডলারের বেশি। কারণটা এই যে পুঁজিপতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে

আগাম দেয় শুধু তার অস্থির পুঁজি নয়। সে তার স্থির পুঁজিও ব্যয় করে — উৎপাদনের উপায় কেনার জন্য। পুঁজিপতিকে তার স্থির পুঁজির দৈনন্দিন উপরি ব্যয় অবশ্যই পুষিয়ে নিতে হবে, তা না হলে সে সর্বস্বান্ত হবে। কীভাবে সে এটা করে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আবার মূর্ত শ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা জানি, মূর্ত শ্রম ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। সেই প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রমের উপায় — যন্ত্রপাতি, সাধনী, সরঞ্জাম — নিয়োগ করে শ্রম প্রয়োগের বস্তুটির উপরে কাজ করে, সেটি পরিবর্তিত করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি নতুন উৎপাদ প্রস্তুত করে। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে সেলাই কারখানার শ্রমিকরা নিয়োগ করে এই সব ধরনের শ্রমের উপায়, যেমন — সেলাই-কল, কাঁচি, সেলাইয়ের প্যাটার্ন, আর শার্টের উপরে ছবি ছাপানোর সরঞ্জাম। এই সমস্ত সরঞ্জামের সাহায্যে শ্রমিকরা কাপড়টা — এখানে শ্রম প্রয়োগের বস্তু — কেটে সেলাই করে এবং তার উপরে একটি ছবি ছাপে। প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার জড়িত, যেমন — কাপড়টা সেলাই করার জন্য সুতো, শার্টের উপরের ছবি ছাপানোর জন্য রঙ, যন্ত্রগুলির জন্য তেল, এবং সেই সঙ্গে আলোর জন্য ও যন্ত্র আর সাজসরঞ্জাম চালানোর জন্য বিদ্যুৎশক্তি। কারখানা ইমারত, তার সাজসরঞ্জাম, পরিবহণের উপায়, প্রভৃতিও উৎপাদনে নিয়োজিত হয়।

শ্রমিকদের মূর্ত শ্রম উৎপাদনের এই সমস্ত বস্তু-উপাদানগুলির মোট মূল্যকে মূর্ত উৎপাদটির মধ্যে

সংরক্ষিত রাখে। এই মূল্য তারা স্থানান্তরিত করে নতুন উৎপাদটিতে, সেটির সঙ্গে যোগ করে বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নতুন মূল্য। উৎপাদনের উপায়ের মোট মূল্যের এই স্থানান্তরণ নতুন ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি বাবদ সেগুলির ব্যয়ের পরিমাপের সঙ্গে সমানুপাতিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশেষ একটি যন্ত্র যদি ১০,০০০টি চূড়ান্ত উৎপাদ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে এই উৎপাদগুলির প্রত্যেকটিতে অঙ্গীভূত হবে যন্ত্রের মূল্যের ১/১০,০০০ ভাগ। উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের বেলাতেও তাই — সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ইমারত, অন্যান্য ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

কাঁচামালের ও বস্তু-উপাদানের মূল্যের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। স্থায়ী রূপে থাকা যন্ত্রগুলির সঙ্গে তফাৎ এই যে, উৎপাদনের এই বস্তু-উপাদানগুলি বার বার ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং তাদের মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যায় একটি শ্রমক্রিয়ায় এবং এই শ্রমক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট এক নতুন উৎপাদে তা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

পুঁজিবাদী উদ্যোগে প্রস্তুত একটি উৎপাদের মূল্য

সংক্ষেপে, আমরা বলতে পারি যে পুঁজিবাদী উদ্যোগে প্রস্তুত একটি উৎপাদের মূল্য তিনটি বড় বড় অঙ্গ-উপাদানকে বেষ্টন করে:

(১) ভাড়াটে শ্রমিকদের মূর্ত শ্রমের দ্বারা চূড়ান্ত উৎপাদটিতে স্থানান্তরিত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য; এর

পরিমাপ হয় ব্যবহৃত স্থির পুঁজির পরিমাণ দিয়ে (সপু);

(২) আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ে বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নতুন মূল্য; তা হল শ্রমিকদের শ্রমশক্তির মূল্যের সমান এবং শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অস্থির পুঁজির পরিমাণের সঙ্গে তা মেলে (অপু);

(৩) উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে ভাড়াটে শ্রমিকদের বিমূর্ত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য (উ)।

নিম্নলিখিত সূত্রটিতে চূড়ান্ত উৎপাদটির মূল্যের গঠনকাঠামো (গ) প্রকাশ পায়: গ=সপু+অপু+উ।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিশ্লেষিত সেলাই কারখানার কাজের দিকে আবার দৃষ্টি ফেরানো থাক। ধরে নেওয়া যাক যে কারখানাটির স্থির পুঁজি ৪,৪২,০০০ ডলার এবং তার গঠনকাঠামো নিম্নরূপ:

(১) ইমারত, অন্যান্য ব্যবস্থা . .	১,৮০,০০০ ডলার
(২) যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম . .	২,২৫,০০০ ডলার
(৩) কাঁচি, সেলাইয়ের প্যাটার্ন, অন্যান্য সাধনী	১৮,০০০ ডলার
(৪) কাপড় বাবদ দৈনিক খরচ .	১৭,০০০ ডলার
(৫) সুতো, রঙ, প্রভৃতি বাবদ দৈনিক খরচ	১,২৫০ ডলার
(৬) বিদ্যুৎশক্তি বাবদ দৈনিক খরচ	৭৫০ ডলার
মোট খরচ:	৪,৪২,০০০ ডলার

আমরা এও খেয়ালে রাখব যে ইমারত ও অন্যান্য

ব্যবস্থা ৩০ বছরে কাজে লাগানোর জন্য উদ্দিষ্ট, যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামের অবচয় ঘটে ৫ বছরের ভিতরে, আর কাঁচি, প্যাটার্ন ও অন্যান্য সাধনীর অবচয় ঘটে ২ বছরের মধ্যে।

এখন দেখা যাক শ্রমিকদের মূর্ত শ্রম উৎপাদনের উপায়ের মূল্যের কতটা পরিমাণ শার্টগুলির দৈনিক উৎপাদে স্থানান্তরিত করবে।

আমরা শুরু করব ইমারত ও অন্যান্য ব্যবস্থা দিয়ে। আমরা ধরে নিয়েছি যে সেগুলি পুঁজিপতির কাজে লাগবে ৩০ বছর। শ্রমিকদের বার্ষিক শ্রম-সময় হল ৫০ সপ্তাহ বা ৩০০ দিন (৬ দিন×৫০ সপ্তাহ=৩০০ দিন)। তা হলে এই দাঁড়ায় ইমারত ও অন্যান্য ব্যবস্থা পুঁজিপতির কাজে লাগবে ৯,০০০ দিন (৩০০ দিন× ৩০ বছর=৯,০০০ দিন)। সুতরাং তৈরি উৎপাদটিতে শ্রমিকরা দৈনিক ভিত্তিতে স্থানান্তরিত করবে ইমারত ও অন্যান্য ব্যবস্থার মূল্যের ১/৯,০০০ ভাগ। এই মূল্য ২০ ডলারের সমান (১,৮০,০০০ ডলার:৯,০০০ দিন=২০ ডলার)।

সেলাই-কল ও রঙ করার যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় ৫ বছর বা ১,৫০০ কর্ম-দিবস (৩০০ দিন×৫= ১,৫০০ দিন)। তা হলে এই দাঁড়ায় যে তৈরি উৎপাদটিতে শ্রমিকরা সেগুলির মূল্যের ১/১,৫০০ ভাগ প্রত্যহ স্থানান্তরিত করবে। এই পাত্রান্তরিত মূল্য ১৫০ ডলারের সমান (২,২৫,০০০ ডলার:১,৫০০=১৫০ ডলার)।

কাঁচি ও অন্যান্য সাধনীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম

প্রযোজ্য ২ বছর বা ৬০০ কর্ম-দিবসের জন্য (৩০০ দিন×২=৬০০ দিন); সেগুলির মূল্যের ১/৬০০ ভাগ বা ৩০ ডলার (১৮,০০০ ডলার:৬০০ দিন=৩০ ডলার) তৈরি শার্টগুলিতে প্রত্যহ স্থানান্তরিত হয়।

কাঁচামাল, বস্তু-উপাদান ও বিদ্যুৎশক্তির মূল্য শ্রমিকদের মূর্ত শ্রমের দ্বারা চূড়ান্ত উৎপাদটির মূল্যের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। আমাদের দৃষ্টান্তে, তা হবে কাপড় কেনা বাবদ ব্যয়িত ১৭,০০০ ডলার, সুতো, রঙ ও অন্যান্য উপকরণ কেনা বাবদ ব্যয়িত ১,২৫০ ডলার এবং বিদ্যুৎশক্তি বাবদ ব্যয়িত ৭৫০ ডলারের সমান।

সুতরাং সেলাই কারখানাটির শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদে প্রত্যহ স্থানান্তরিত ব্যয়িত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য হবে ১৯,২০০ ডলার। এই মূল্য আলাদা আলাদাভাবে নিম্নলিখিত এককগুলিতে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) ইমারত ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবচয়	২০ ডলার
(২) যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামের অবচয়	১৫০ ডলার
(৩) কাঁচি ও অন্যান্য সাধনীর অবচয়	৩০ ডলার
(৪) কাপড় খরচ	১৭,০০০ ডলার
(৫) সুতো, রঙ ও অন্যান্য উপকরণ খরচ	১,২৫০ ডলার
(৬) বিদ্যুৎশক্তি খরচ	৭৫০ ডলার
মোট খরচ:	১৯,২০০ ডলার

আমাদের হিসাব অনুযায়ী, শার্টগুলির দৈনিক উৎপাদে অঙ্গীভূত হয়েছে ২,৪০০ ডলারের নতুন মূল্য: সুতরাং মোট মূল্য হবে ২১,৬০০ ডলার (১৯,২০০ ডলার+২,৪০০ ডলার=২১,৬০০ ডলার)। উপরোক্ত প্রতীকগুলি ব্যবহার করে এই মূল্যের গঠনকাঠামোটা দেখানো যায় এইভাবে: ১৯,২০০ স্প+৬০০ অপ+ ১,৮০০ উ=২১,৬০০।

এ থেকে ১টি শার্টের মূল্য হিসাব করা সহজ। এর জন্য, আমরা প্রত্যহ উৎপন্ন শার্টগুলির সংখ্যা (৭,২০০) দিয়ে শার্টগুলির মোট মূল্যকে (২১,৬০০ ডলার) ভাগ করব। একটা শার্টের মূল্য হল ৩ ডলার।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উশুল করা

উৎপাদগুলি তৈরি হয়ে গেলেই পুঁজিপতি সেগুলি বাজারে সরবরাহ করে পাইকারি বা খুচরো বিক্রয়ের জন্য। পুঁজিপতি উৎপাদগুলি বিক্রয় করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে, যেটা সেগুলির মূল্যের তুল্যমূল্য। আমাদের দৃষ্টান্তে, সেলাই কারখানার মালিক ৭,২০০ শার্ট বিক্রয় করবে প্রত্যেকটি শার্ট ৩ ডলার দামে। ফলে, সে পাবে ২১,৬০০ ডলার (৩ ডলার×৭,২০০=২১,৬০০ ডলার)। উৎপাদগুলি পুঁজিপতির সম্পত্তি ছিল বলে, বিক্রয়লব্ধ অর্থও সেই পুঁজিপতির। সেই অর্থের সঙ্গে শ্রমিকদের কোনোই সম্পর্ক নেই। পুঁজিপতির কাছে তারা যে পণ্যটি বিক্রি করেছিল তার জন্য, অর্থাৎ তাদের শ্রমশক্তির জন্য

ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিমধ্যেই তাদের মজুরি পেয়ে গেছে।

এই অর্থ দিয়ে পুঁজিপতি কী করবে? প্রথমে, সে তার উৎপাদন-ব্যয় তুলে নেবে। আমাদের সেলাই কারখানাটির ক্ষেত্রে, এই ব্যয় ছিল এক দিনে স্থির পুঁজির ১৯,২০০ ডলার এবং এক দিনে অস্থির পুঁজির ৬০০ ডলার। পুঁজিপতি তার উৎপাদন-ব্যয়, ১৯,৮০০ ডলার পুষিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এই পরিমাণটা তুলে নেয়। মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২১,৬০০ ডলার হওয়ায়, পুঁজিপতির হাতে থেকে যায় নীট ১,৮০০ ডলার। উদ্বৃত্ত-মূল্য বিক্রয় করার জন্য এই অর্থটাই পুঁজিপতি পায়। ঠিক এই জায়গাটিতেই শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থের একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের রূপ ধারণ করে, যে অঙ্কটা দিয়ে পড়ে পুঁজিপতির হাতে। পুঁজিপতিই এই অর্থের একমাত্র মালিক। সে তা উপযোজন করেছে এবং তা দিয়ে সে যা খুশি করতে পারে। উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে, পুঁজিপতি বেঁচে আছে ভাড়াটে শ্রমিকদের শ্রমের উপরে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য — উদ্বৃত্ত-মূল্য

উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজনই পুঁজিবাদী উৎপাদনের চরম লক্ষ্য, তার প্রাথমিক চালকশক্তি। পুঁজিবাদী উৎপাদন চালানো হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার উদ্দেশ্যে, এবং পুঁজিপতি তদনুযায়ীই কাজ করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যই বুর্জোয়া শ্রেণীর লক্ষ্যগুলি স্থির করে দেয় এবং

পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ নির্ধারণ করে। পুঁজিপতি যতক্ষণ পর্যন্ত একটা উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়, ততক্ষণ সে কী উৎপন্ন করছে — শার্ট, পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, মেশিন-টুল, না টুথপেস্ট তাতে তার কিছু আসে যায় না। একমাত্র যে জিনিসটি সম্পর্কে তার ভাবনা, তা এই যে তার উৎপাদন মুনাফাদায়ক এবং তার বৈষয়িক স্বার্থার্জনের বাসনাকে তা পূরণ করে। বিখ্যাত মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান এ বিষয়ে বর্ণাঢ্য ভাষায় লিখেছেন। তাঁর 'গণতান্ত্রিক দৃরূত্ব' রচনায় পড়া যায়: 'ব্যবসায়ে... শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য বিদ্যমান — যে কোনো উপায়ে মুনাফা লাভ করা। রূপকথায় একটি ড্র্যাগন অন্য সব ড্র্যাগনকে গিলে খেয়েছে। মুনাফা হল আমাদের বর্তমান ড্র্যাগন যা অন্য সবকে গিলে ফেলেছে।'

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদের কোনো সীমা নেই। পুঁজিপতি তার উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন ও বিবর্ধন করার জন্য কোনো কিছুতেই নিরস্ত হয় না। সে তার জীবিকার্জন করে ভাড়াটে শ্রম শোষণ করে এবং শ্রমিকদের বাধ্য করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে। একটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্ভাবনা যত বেশি অধিগম্য, পুঁজিপতি তত বেশি সক্রিয়, সাহসিক আর নির্মম। গত শতাব্দীর মাঝখানে এই বিষয়টির উপরে জোর দিয়ে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা টি. জে. ডানিং লিখেছিলেন: 'পুঁজি কোনো মুনাফাকেই পরিহার করে না, কিংবা খুব সামান্য মুনাফাই পরিহার করে, ঠিক যেমন প্রকৃতি শূন্যকে পরিহার

করে। পর্যাপ্ত মুনাফা থাকলে পুঁজি খুবই সাহসী। নিশ্চিতভাবে ১০ শতাংশ মুনাফা পাওয়া গেলে যে কোনো জায়গায় তার নিয়োগ নিশ্চিত করা যাবে; ২০ শতাংশ নিশ্চয়ই ব্যগ্রতার জন্ম দেবে; ৫০ শতাংশ — সন্দেহাতীত দুঃসাহস; ১০০ শতাংশ তাকে সমস্ত মানবিক আইনকানুন পদদলিত করতে প্রস্তুত করে তুলবে; ৩০০ শতাংশ — এমন কোনো অপরাধ নেই যা করতে তা দ্বিধাগ্রস্ত হবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই যা নিতে দ্বিধা করবে, এমন কি তার মালিকের ফাঁসিতে ঝোলার সম্ভাবনা পর্যন্ত।'

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ পুঁজিবাদী উৎপাদনকে নির্ধারণ করে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের উপায় ও শ্রম-বাহিনীর বণ্টন নির্ধারণ করে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির গঠনকাঠামো বদলানোর, উঁচু মুনাফাদায়ক শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করার এবং যে সমস্ত শিল্পে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের সম্ভাবনা কোনো কারণে কমে যাচ্ছে সেগুলি কাটছাঁট করার তা এক প্রণোদনাস্বরূপ। তা হল এমন এক নতুন পণ্যের উৎপাদন গড়ে তোলার যাত্রাবিন্দু, যে পণ্য পুঁজিপতি-উদ্যোগপতিকে বাড়তি মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ পুঁজিপতিদের উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে এবং নতুন নতুন যন্ত্র, কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির পিছনে আরও বেশি ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। উৎপাদন যদি অলাভজনক হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ পুঁজিপতিদের প্ররোচিত করবে তার কোনো

কোনো উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে এবং তার কাজে-না-লাগা শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করতে। উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করা ও বাড়ানোর জন্য যে শ্রমিকদের পুঁজিপতির আর প্রয়োজন নেই, তারা তাদের কাজ হারিয়ে অনাহার আর দুঃখদুর্দশার সম্মুখীন হবে। এই শ্রমিকদের উৎপন্ন পণ্যগুলি থেকে বিক্রয় বাবদ চড়া আয়ের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তবে পুঁজিপতি সেগুলি আদৌ বিক্রয়ই করবে না। অভাবগ্রস্তদের তা বিলিয়ে দেওয়ার কথা তো চিন্তাই করবে না। সেই উৎপাদগুলি ধ্বংস করে ফেলা হবে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনকে উদ্দীপিত করে। সেটা আবার আয় বাড়ায় এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে উদ্দীপিত করে। কিন্তু, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি যদি পুঁজিপতির প্রাপ্তিকে বিপন্ন করে, তা যদি তার নিজের নয়, তার আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিশ্রুতিবাহী হয়, তা হলে সেই পুঁজিপতি হয় প্রগতির শত্রু, উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক নবোদ্ভাবনার শত্রু। এই ক্ষেত্রে সে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তা গোপন করে রাখে, তার প্রচারণাকে ব্যাহত করে। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পেটেন্টগুলি, অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কিনে নিয়ে সে তালাবন্ধ করে রাখে, এবং এইভাবে সেগুলিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠায়।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ নির্ধারণ করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যে বৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে

সঙ্গে, বৃদ্ধিলাভ করে পুঁজিপতিদের সম্পত্তি আর পুঁজিও। নিজেদের পুঁজি বাড়ানোর প্রয়াসে পুঁজিপতিরা একত্রে যোগ দেয়, নিজেদের মধ্যে সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করে এবং গঠন করে একচেটিয়া পরিমেলগুলি। পুঁজিপতি তার আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর গোপনে ক্ষতিসাধন করার জন্য, কিংবা ভাগ্য ভালো থাকলে তাকে সর্বস্বান্ত করার জন্য প্রতিটি সুযোগের সন্ধান করে। স্বার্থার্জনের তাড়নায়, তার অর্থের ঘাটতি দেখা দিলে সে বিনীতভাবে ক্রেডিট চায়, অথবা যখন তার প্রচুর অর্থ থাকে তখন ক্রেডিট দেয় — স্বভাবতই, সুদে। সততা হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। পুঁজিপতি ঝুঁকিপূর্ণ ক্রয়- বিক্রয়ের লেনদেন আর প্রতারণাপূর্ণ কারবারে লিপ্ত হয়, সামগ্রী আর জামানত নিয়ে ফাটকাবাজি করে, সংক্ষেপে, সবচেয়ে নোংরা ও বিতৃষ্ণাকর ব্যবসায়িক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অবিরত নির্মম শোষণ পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। এইভাবে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের পরগাছাসুলভ, লুঠেরা চরিত্র আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, সেই সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করে হয়ে ওঠে জনবিরোধী, অমানবিক, এবং সমাজ প্রগতির প্রয়োজনগুলির বিরোধী।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ হল সেই কম্পাস যা পুঁজিপতিদের দিক্‌নির্ণয় করে দেয় শুধু একটা দিকেই চলার জন্য: শিল্প শ্রমিকদের ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযানের দিকে। শ্রমিকদের উপরে শোষণ এমনিতেই কঠোর, তা

কঠোরতর হয়ে ওঠে যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যসন্ধানী পুঁজিপতি তাকে চরমে নিয়ে যায়। পারিশ্রমিকহীন শ্রমের শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নেওয়ার আগে পর্যন্ত, শ্রমিকদের শুষে শুকনো করে ফেলার আগে পর্যন্ত সে থামবে না। যে পদ্ধতিগুলি সে প্রয়োগ করে সেগুলি যে হানিকর, শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, কিংবা তার মৃত্যুও ঘটাতে পারে, তা নিয়ে পুঁজিপতি বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয়। শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, স্বাস্থ্য বা জীবন পুঁজিপতির ভাবনার বিষয় নয়। তার একমাত্র ভাবনা হল উদ্বৃত্ত-মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্যসন্ধানী পুঁজিপতি অপরাধ করতে কুণ্ঠিত হয় না: প্রতারণা, ব্ল্যাকমেল আর ঘুষের আশ্রয় নেয় সে। তার কাছে আইনের কোনো অর্থ নেই। সে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করতে, আরও ধনী, আরও ক্ষমতাশালী হতে ব্যগ্র। এর জন্য সে নীচতম রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে মদত দেবে, মদ্যাসক্তি, মাদকাসক্তি, আত্মিক অধঃপতনে উৎসাহ যোগাবে। এই তাড়নার বশেই সে জাতীয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সামরিক ব্যয়বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষাগুলির মূলে নিহিত আছে এটাই। এই হেতুও দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এক নতুন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা। উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ যেমন ঔপনিবেশিক রাজ্যদখলের কারণ হয়েছিল, তেমনি আজ তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সব ধরনের নয়া-উপনিবেশবাদী হঠকারিতায় অনুপ্রেরণা যোগায়। এটা হল সেই মূল

প্রণোদনা, যা অতি শিল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজিপতিদের উদ্বুদ্ধ করে মুক্ত দেশগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে, যাতে এই দেশগুলিতে তাদের নিজেদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যায়, এই জাতিগুলিকে শোষণ ও লুণ্ঠন করা যায় এবং এইভাবে তাদের আর্থনীতিক বিকাশকে ব্যাহত করা যায়।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলিতে সমস্ত বিকাশই অল্পবিস্তর মাত্রায় নির্ধারিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য দ্বারা. এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই হল লক্ষ্য, প্রণোদনা, প্রাথমিক চালকশক্তি। সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন এবং মজুরি শ্রমিকদের শোষণের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের দ্বারা তার উপযোজনই পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় আর্থনীতিক নিয়ম। কার্ল মার্কস 'পুঁজি'তে যথার্থভাবেই বর্ণনা করেছিলেন, 'উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন, অর্থাৎ মুনাফা হল উৎপাদনের এই প্রণালীর পরম নিয়ম।'* এই পরম নিয়মই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তঃসার; এটাই তার প্রধান আর্থনীতিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। এই নিয়মের ক্রিয়াই পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলিকে আরও জটিল করে তোলে।

পুঁজি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য

এখন যেহেতু আমরা জানি উদ্বৃত্ত-মূল্য কী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে তা কী ভূমিকা পালন করে, তাই আমরা দৃষ্টিপাত করব পুঁজির সারবস্তুটির দিকে।

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 580.

পূর্ববর্তী অংশগুলিতে আমরা পুঁজি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার সংজ্ঞানির্ণয় করেছি উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য পুঁজিপতির দ্বারা আগাম দেওয়া অর্থ বলে এবং সেলাই কারখানাটিতে বিনিয়োজিত তহবিল বলে। অর্থ-রূপ ছাড়াও, পুঁজি থাকতে পারে অন্য অনেক রূপে। এগুলি হতে পারে কয়লা খনি, তেলক্ষেত্র, কারখানা, বড় খামার, বিমানবন্দর, ব্যাংক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পুঁজির সারবস্তুর জায়গায় যাঁরা তার বাহ্যিক রূপটিকে প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করেন, সেই বুর্জোয়া পণ্ডিতরা তার সংজ্ঞানির্ণয় করেন উৎপাদনের উপায়ের সাকল্য বলে। এই সংজ্ঞার্থটি তাদের পক্ষে খুবই উপযোগী। যেহেতু উৎপাদনের উপায় এমন জিনিস যা মানবজাতির গোটা ইতিহাস জুড়েই ছিল, সেই হেতু তাঁরা দাবি করেন যে পুঁজি চিরন্তন। তা ছিল আদিম লোক-সম্প্রদায়ে এবং থাকবে দূর ভবিষ্যতে। সুতরাং পুঁজিবাদ নাকি চিরন্তন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করার প্রচেষ্টা তাই বৃথা।

কিন্তু পুঁজিকে তার বাহ্যিক, বস্তুগত রূপে পর্যবসিত করলে চলবে না। রূপটা যাই হোক না কেন, তার পিছনে রয়েছে পুঁজির সাধারণ আর্থনীতিক চরিত্র।

একটি কারখানা, একটি তেলক্ষেত্র, একটি বিমানবন্দর, একটি খামার, বা অন্য কোনো পুঁজিবাদী সম্পত্তি হল নির্দিষ্ট মূল্য। পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত মূল্যগুলি থেকে পৃথকরূপে, পুঁজিতে অনুস্যূত মূল্য উৎপাদন চলাকালে আত্ম-সম্প্রসারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য

উৎপন্ন করতে সক্ষম। ভাড়াটে শ্রমিকদের উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে ও শোষিত হয় বলেই এটা ঘটে।

সুতরাং আমরা পুঁজির সংজ্ঞানির্ণয় করতে পারি এমন একটা আত্ম-সম্প্রসারণশীল মূল্য বলে, যা ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে। পুঁজিপতিদের আর প্রলেতারীয়দের মধ্যেকার উৎপাদন-সম্পর্কগুলি পুঁজিতে অঙ্গীভূত: উৎপাদনের উপায়ের পুঁজিপতি মালিক তার জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনকারী ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণ করে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের পুঁজি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। আমরা দেখেছি, স্থির পুঁজি ব্যবহৃত হয় উৎপাদনের বস্তুগত উপায়গুলি ক্রয় করার জন্য। উৎপাদন চলাকালে তার মূল্য সম্প্রসারিত হয় না। তা নানান স্থায়ী পরিমাণে স্থানান্তরিত হয় সম্পূর্ণকৃত উৎপাদগুলিতে। সুতরাং স্থির পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করার একটি শর্ত মাত্র। তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য এক অপরিহার্য শর্ত, কিন্তু স্বকীয়ভাবে তার উৎস নয়।

অস্থির পুঁজির মূল্যের কথা বলতে গেলে, উৎপাদন চলাকালে তা অবশ্যই পরিবর্তিত হয়। অস্থির পুঁজি ব্যয়িত হয় শ্রমশক্তি ক্রয়ে। শ্রমশক্তি যারা বিক্রয় করে সেই ভাড়াটে শ্রমিকরা সৃষ্টি করে নতুন মূল্য, যা পুঁজিপতির অস্থির পুঁজির উৎপাদন-ব্যয় পুষিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এবং তদুপরি, উদ্বৃত্ত-মূল্য

উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। এইভাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য হল অস্থির পুঁজির একটা বৃদ্ধি। একমাত্র অস্থির পুঁজিই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে সক্ষম ভাড়াটে শ্রম শোষণের দরুন।

খোদ পুঁজিই, পুঁজিবাদী উদ্যোগে নিয়োজিত প্রযুক্তিবিদ্যাই উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস — এই মর্মে কিছু কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের বক্তব্যগুলি ভিত্তিহীন। তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে পুঁজি শ্রমের সঙ্গে সমাহারে উৎপাদনের একটি উপাদান, এবং শ্রম যেমন মজুরির জন্ম দেয়, ঠিক তেমনিই পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্ম দেয়। এই সমস্ত বক্তব্যের পিছনে রয়েছে এই চিন্তা যে পুঁজিপতি তার শ্রমিকদের শোষণ করে না, বরং উৎপাদনের যে উপাদানটির সে মালিক সেটির জন্য, তার পুঁজির জন্য তার যথার্থই প্রাপ্য একটা আয় সে পায়, আর শ্রমিকরা মজুরি পায় তারা উৎপাদনের যে উপাদানটির মালিক সেটির জন্য, তাদের শ্রমের জন্য।

পুঁজির 'উৎপাদনশীলতার' মতবাদটি স্থির পুঁজি ও অস্থির পুঁজির মাঝখানে, ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন ও মূল্য উৎপাদনের মাঝখানে একটা সীমারেখা টানে না; পুঁজিকে তা ভুলভাবে চিহ্নিত করে উৎপাদনের শুধু একটি উপায় হিসেবে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের উপরে শোষণ ছাড়া পুঁজি হতে পারে না। অন্য যে কোনো ব্যক্তির মতোই, পুঁজিপতি অর্থ ব্যয় করে তার পরিবারের ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সে মেহনতি

নয় বলে, এর জন্য একমাত্র যে উৎসটির উপরে সে নির্ভর করে, সেটি হল তার পুঁজি। উদ্বৃত্ত-মূল্য না থাকলে তার সমগ্র পুঁজিই শেষ পর্যন্ত খরচ হয়ে যাবে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য।

ধরা যাক, কোনো একজন পুঁজিপতি ১,০০,০০০ ডলার পুঁজির মালিক এবং সে প্রতি বছর উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে ২০,০০০ ডলার। এই পুঁজিপতি যদি তার নিজস্ব ভোগের জন্য বছরে ২০,০০০ ডলার ব্যবহার করে তা হলে ৫ বছরে সে খরচ করে ফেলবে ১,০০,০০০ ডলার, বা তার সমগ্র পুঁজি। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য না পেলে, তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সবই খরচ হয়ে যাবে তার নিজস্ব ভোগে। পুঁজিপতি তার ভোগ বাবদ খরচ তুলে নেয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাহায্যে। আমাদের দৃষ্টান্তে, ৫ বছরে তা হবে ১,০০,০০০ ডলারের সমান, অথবা পুঁজিপতির দ্বারা তার নিজস্ব ভোগের জন্য ব্যবহৃত অঙ্কটি। সংক্ষেপে, পুঁজিপতি তার নিজস্ব খরচের জন্য আগাম দেওয়া ১,০০,০০০ ডলার তুলে নিতে পারে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। অনুরূপভাবেই, সমস্ত পুঁজিই কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পুনরুৎপন্ন হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের দরুন।

উদ্বৃত্ত-মূল্য ও প্রতিযোগিতা

পুঁজি শুধু বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার সম্পর্ককেই প্রকাশ করে না, পুঁজিপতিদের

নিজেদের মধ্যেকার কতকগুলি আর্থনীতিক সম্পর্ককেও প্রকাশ করে। অসীম ধনসম্পদ লাভের প্রয়াসে প্রত্যেক পুঁজিপতিই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে যথাসম্ভব বেশি পুঁজি অর্জন করতে, এবং অন্য পুঁজিপতিদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদ উৎপাদন, পুঁজি বিনিয়োগ, বাজার ও কাঁচামালের উৎসের আরও সুবিধাজনক অবস্থার জন্য প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামকে ক্ষুরধার করে তোলে।

পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা একটি শিল্পের গণ্ডীগুলির ভিতরে এবং বিভিন্ন শিল্পের পুঁজিপতিদের মধ্যেও অত্যন্ত তীব্র। সবারই লক্ষ্য এক — সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করা, তাদের ধ্বংস করা, অর্থনীতিতে তাদের অবস্থানগুলি দখল করা।

প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের জন্য পুঁজিপতিরা বহুবিধ উপায়-পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সুবিধাজনক বিক্রয়ের অবস্থা ও সেই হেতু বিক্রয় বাবদ অধিকতর আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের উৎপাদগুলির মূল্য হ্রাস করার প্রয়াস পায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পুঁজিপতিরা উৎপাদন উন্নত করার জন্য, অভিনব প্রযুক্তি প্রবর্তন করার জন্য এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা কার্যকর করে। উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে তা বিষয়গতভাবে সাহায্য করে — মনে হতে পারে, এটা ইতিবাচক ফল-প্রভাব। কিন্তু, ব্যাপারটার আরেকটি দিকও আছে। উৎপাদন ব্যয়ে হ্রাস অর্জন করার

উদ্দেশ্যে, উদ্যোগপতিরা শ্রমিকদের উপরে শোষণকে নিবিড় করে তোলে কর্ম প্রক্রিয়া দ্রুতগতি করে ও বিরতিকাল কমিয়ে। শ্রমিকদের সংখ্যা নামিয়ে আনা হয় ন্যূনতম সংখ্যায়। অনেকে বরখাস্ত হয় এবং তাদের কাজগুলি চাপিয়ে দেওয়া হয় উদ্যোগটিতে যারা থেকে যায় তাদের উপরে। এই সব কিছু শ্রমিকদের উপরে প্রবল আঘাত দেয়, তাদের শ্রম ও জীবনের পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করার চেষ্টায় আলাদা আলাদা পুঁজিপতি আর কিছু কিছু পুঁজিপতির গোষ্ঠীগুলি, প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়গুলির বিরুদ্ধে রীতিমত আক্রমণাভিযান চালায়। তারা ক্রেডিটের পথগুলি রুদ্ধ করে দেয়, প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদগুলির দাম কমাতে বাধ্য করে, সেগুলি বয়কট করে, সদৃশ উৎপাদসমূহ উৎপন্নকারী নিজেদের শিল্পশালা বা উদ্যোগ তৈরি করে, ইত্যাদি। সমাজের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ সবই সম্পদের অপচয় এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। কোনো কোনো পুঁজিপতি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শ্রম-বাহিনী, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি ও জ্বালানীর উৎস থেকে বঞ্চিত করার জন্য গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যবসা থেকে হঠে যেতে বাধ্য করা ও সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় পুঁজিপতিরা অহরহই উপভোক্তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। পুঁজিপতির লক্ষ্য হল তার প্রতিদ্বন্দ্বী যা উৎপন্ন

করে না সেই জিনিসটি উৎপন্ন করা এবং তার ক্রেতাদের নিজের দিকে টেনে আনা। বাইরে থেকে সুদৃশ্য অথচ সেগুলির অধিকারীদের পক্ষে আসলে অকেজো কিংবা এমন কি ক্ষতিকর বহুবিধ উৎপাদ তৈরি করার কারণ এটাই: সুন্দর বর্ণাভা ও আকৃতির লিপস্টিক, কিন্তু যা ব্যবহার করলে একজিমা হয়, নতুন নতুন 'ভিটামিন' যা খেলে পাকস্থলীর গণ্ডগোল দেখা দেয়; গ্রন্থিথাতের নতুন ওষুধ যা খেলে পুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটে, মাথাধরার বড়ি, গর্ভবতী নারী যদি তা খায় তবে প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম হয়। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে, 'জেনারেল মোটরস' সংস্থা ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনের ফিটিংসহ 'শেভ্রলে' গাড়ি বাজারে ছেড়েছিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য দুর্ঘটনা হয়েছিল মোটর চালকরা পূর্ণগতিতে গাড়ি চালানোর সময়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে। এই ধরনের মোট ৬৭,০০,০০০ গাড়ি ছাড়া হয়েছিল।

ক্রেতালাভের সংগ্রামে, পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের পিছনে প্রচুর ব্যয় করে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে সামগ্রী কিনতে প্ররোচিত করা, এমন কি সেই সমস্ত সামগ্রীও যেগুলি তাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় — সংক্ষেপে, ক্রেতার টাকার থলি ধরে টান দেওয়া। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ডন মার্টিনডেইলের কথায়, 'কলকারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মতোই বিজ্ঞাপনকে সেই দক্ষতার সঙ্গে ও দ্রুতভাবে ভোক্তাদের সৃষ্টি করতে হবে।' শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিজ্ঞাপনের পিছনে প্রতি বছর খরচ করা

হয় ৫০ শতকোটি ডলারের বেশি। মার্কিন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে মোট স্থানের দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত অধিকার করে থাকে বিজ্ঞাপন। এক বছরে, একজন মার্কিন নাগরিক রেডিও ও টেলিভিশনে ৪০,০০০-এর বেশি বিজ্ঞাপনী শোনে এবং দেখে। ছাপানো বিজ্ঞপ্তি, চিঠি বা কুপনের আকারে মার্কিন ক্রেতাদের কাছে ডাকে পাঠানো বিশাল সংখ্যক বিজ্ঞাপনের জন্য বছরে খরচ হয় ব্যক্তি-পিছু ২০০ ডলারের বেশি। এদিকে, ১৯৮০ সালে দেখা গিয়েছিল যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৮০ কোটি মানুষের মাথা-পিছু আয় ১৫০ ডলারের বেশি ছিল না।

প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলি পেটেন্ট আর সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকল্পগুলি কিনে নেওয়া ও চেপে রাখার কাজে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়। উদ্ভাবনা আর আবিষ্কারগুলিকে লুকিয়ে রাখা হয় রহস্যের অন্তরালে। ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত আরেকটি কৌশল হল আর্থনীতিক গোয়েন্দাগিরি। এই উদ্দেশ্যে থাকে বিশেষ বিশেষ বিভাগ, সেগুলি এই কাজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন চরে ভর্তি। তাদের হাতে আছে লক্ষ করার জন্য, টেলিফোনে আড়ি-পাতার জন্য ও ফটো তোলার জন্য আধুনিকতম সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের যন্ত্রকৌশল তৈরি করে ৪০টির বেশি সংস্থা। আরেকটি কৌশল হল কম্পিউটরের স্মৃতিধৃত শিল্পের গোপন খবরাখবর চুরি করা।

দরকার হলে পুঁজিপতিরা গুপ্তচর সংস্থাগুলিকে

কাজে লাগায়। সি আই এর প্রত্যক্ষ মদত নিয়ে পরাক্রমশালী তেল-ব্যবসায়ীরা ভেনেজুয়েলায় আর্থনীতিক গোয়েন্দাগিরির এক ব্যাপক জালবিস্তার তৈরি করেছিল। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন ভাড়াটে চররা তেলের রপ্তানি-দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করেছিল। ফলে, ভেনেজুয়েলা হারিয়েছিল, এবং মার্কিন ব্যবসায়ীরা অর্জন করেছিল, মোট এক শতকোটি ডলারের বেশি। ১৯৮৩-র শেষ দিকে, সি আই এর জনৈক চর টি. হিলের নেতৃত্বাধীন গোয়েন্দাদের স্বরূপ ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিরাও আর্থনীতিক গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হতে শুরু করছে। ভেনেজুয়েলা মামলা চলার প্রায় সম সময়েই, নেদারল্যান্ডের আমস্টার্ডামে এক আদালত একজন পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল তার অনুপস্থিতিতে। ইউরেনিয়ম সমৃদ্ধিসাধন প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে শ্রেণীবদ্ধ তথ্য লাভের চেষ্টা করার অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং চার বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

আর্থনীতিক গুপ্তচরবৃত্তি ও লোকসানের বিরুদ্ধে পাল্টা-ব্যবস্থা হিসেবে বহু সংস্থা সুরক্ষা বাবদ ব্যয় বাড়ায়, বিপদ-সংকেতজ্ঞাপক ব্যবস্থাদি বসায়, সেগুলির মধ্যে থাকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল, এমন কি রাডার অবধি। সংস্থাগুলি পাকাপোক্ত চরে ভর্তি বিশেষ গুপ্তচর বিভাগ গঠন করে। Á la guerre comme á la guerre! এঙ্গেলস যে প্রতিযোগিতাকে সকলের ও

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই, আমৃত্যু যুদ্ধ বলে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, তা অকারণে নয়।

পরিস্থিতিহেতু যেখানে হিংসা ও বলপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই প্রকৃত যুদ্ধের মতোই, আর্থনীতিক প্রতিযোগীরা ব্যবহার করে অস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ, অন্তর্ঘাত। অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় ভাড়াটে মস্তানবাহিনীর সাহায্যে, যারা অগ্নিসংযোগ ও দুর্ঘটনার পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করে, দলিলপত্র চুরি করে, উৎপাদ ধ্বংস করে, এবং উঁচু দরের কর্মীদের হত্যা করে। যেসব কোম্পানি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে পিছু হঠতে অস্বীকার করে, তাদের তো প্রস্তুত থাকতেই হবে, কখন তাদের শিল্প কর্মশালাগুলিতে অগ্নিকাণ্ড হয়, গুদাম ঘর বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে যায় অথবা অজ্ঞাত কারণজনিত অন্য কোনো দুর্বিপাকের কবলস্থ হয়।

অধিকতর মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতারত কোম্পানিগুলি জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘুষদান, মিথ্যা আর বলপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ হয় না। কয়েকজন মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদের সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে একজন গড়পড়তা মার্কিন ব্যবসায়ী এতবার আইন লঙ্ঘন করে যে তার রোজ ৩১,৫০০ ডলার জরিমানা হওয়া উচিত। পুঁজিপতিরা শিকার নিয়ে কামড়া-কামড়ি করা এক পাল নেকড়ের মতো — যে কোনো সময়ে একে অন্যের টুঁটি কামড়ে ধরতে প্রস্তুত। পুঁজিবাদে যে দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতি দেখা দেয়, মহান

ফরাসী লেখক এমিল জোলা 'অর্থ' উপন্যাসে তা বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'অর্থের জন্য এই সমস্ত গোপন ও ঘৃণ্য লড়াইয়ে, যেখানে দুর্বলদের নাড়ীভুঁড়ি বার করে নেওয়া হয়, সেখানে কোনো বন্ধন, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব নেই, তা হল শক্তিমানদের নিষ্ঠুর নীতি, যারা অন্যদের খায়, তা না হলে অন্যেরা তাদেরই খেয়ে ফেলবে।'*

এই প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে শক্তিমান আরও শক্তিমান হয় আর তাদের দুর্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্রমে ক্রমে হঠে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে ৬টি বড় বড় পুঁজিবাদী দেশে দেউলিয়াবৃত্তির মোট সংখ্যা নথীবদ্ধ হয়েছিল ৫৮,০০০ আর ১৯৮২ সালে অঙ্কটা হয়েছিল ১,০২,০০০। বৃদ্ধিটা অবশ্য এক-এক দেশে এক-এক রকম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ছিল ৩·৪ গুণ, ব্রিটেনে — ২·৭ গুণ, পশ্চিম জার্মানিতে — ২ গুণের সামান্য কিছু কম। ব্যাপক দেউলিয়াপনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার হয়েছিল প্রায় ১০ লক্ষ লোক, আর পশ্চিম জার্মানিতে ৪,৫০,০০০ লোক।

* Emile Zola, *L'argent*, François Berncuard, Paris, 1928, pp. 339-340.

অধ্যায় ৪

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ

সীমাহীন স্বার্থার্জনের সন্ধানে পুঁজিপতিরা মজুরি শ্রমিকদের উপরে শোষণের মাত্রা ও নিবিড়তা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তারা শ্রমিকদের বাধ্য করে আরও বেশি পরিমাণ পারিশ্রমিকহীন শ্রম দিতে। তার ফল হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের নিয়ত বৃদ্ধি, অর্থাৎ, মজুরি শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুঁজিপতিদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের বৃদ্ধি। **উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ** হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তন, এবং পুঁজিবাদী শোষণের অনাপেক্ষিক মাত্রা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে তার অনাপেক্ষিক ফলের সূচক।

একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-

মূল্যের মোট পরিমাণকে হিসাব করা হয় সেই নির্দিষ্ট উদ্যোগটির সমস্ত মজুরি শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা সাকল্য হিসেবে। উদ্যোগটি এবং শোষিত মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যা যত বড়, উদ্যোগটির পুঁজিপতি মালিকের দ্বারা অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ তত বেশি।

শাখাগত স্তরে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করা হয় সেই নির্দিষ্ট শাখাটির সমস্ত উদ্যোগের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাকল্য হিসেবে। জাতীয় স্তরে, তা হল জাতীয় অর্থনীতির সব কটি শাখার দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাকল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্য একটা নির্দিষ্ট কালপর্ব ধরে উৎপন্ন হয় বলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করা হয় এক দিন, এক মাস, বা এক বছরে হিসাবে।

পুঁজিপতিদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণটা সুবিপুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৮১ সালে 'এক্সন'-এর মোট আয় পৌঁছেছিল ৩৪·৩ শতকোটি ডলারে; আই বি এম-এর — ১৭ শতকোটি ডলার; 'ফিলিপ মরিস'-এর — ৩·১ শতকোটি ডলার; 'ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর'-এর — ২·২ শতকোটি ডলার। অন্য দিকে, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৬৮টি দেশে (৯০টির মধ্যে) মোট জাতীয় উৎপাদ ১০ শতকোটি ডলারের কম; ৩৭টি উন্নয়নশীল দেশে তা এক শতকোটিরও কম।

একটি জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ একটা মাথা-ঘোরানো অঙ্কে

গিয়ে পেঁছিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৯ সালে তা ছিল ১৮০০০০০০০০০০ ডলার।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের বৃদ্ধি

বছরের পর বছর পুঁজিপতিদের দ্বারা অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ তুলনা করে প্রতিপন্ন হয়েছে যে একটিই মাত্র প্রবণতা আছে — ধীরনিশ্চিত বৃদ্ধির প্রবণতা।

মার্কিন জাতীয় অর্থনীতির একটা বড় শাখা, মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের বিকাশে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪৯ সালে, তা উৎপন্ন করেছিল ২২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য। এই অংকটা বেড়ে চলতে থাকে এবং ১৮৮৯ সালে, অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে, তা হয়ে দাঁড়ায় ২·২ শতকোটি — ৮৭০ শতাংশ বৃদ্ধি, বৃহৎ ব্যবসায়ের কাণ্ডারীদের পক্ষে নির্ভেজাল এক স্বর্ণখনি।

পরবর্তী চল্লিশ বছরে, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন বেড়েছিল অল্পবিস্তর অনুরূপ হারেই। ১৯২৯ সালে প্রসেসিং শিল্পের মজুরি শ্রমিকরা ২১·২ শতকোটি ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করেছিল — ১৮৮৯ সালের স্তরের তুলনায় ৯·৬ গুণ বেশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে ও পরে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বেড়েছিল আরও দ্রুতহারে। ১৯৬৯ সালে, মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের

দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট অঙ্কটা গিয়ে পৌঁছেছিল ২৪৬·২ শতকোটি ডলারে। অর্থাৎ, ১৯২৯ সালের তুলনায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বেড়েছিল ১১·৬ গুণ।

আমরা দেখেছি, ১৯৬৯ সালে, আলোচ্য ১২০ বছর কালপর্বের শেষে, মার্কিন প্রসেসিং শিল্প ১৮৪৯ সালের তুলনায় ১,০৮৪ গুণ বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করেছিল। পুঁজিপতিরা কিন্তু তাতেই থেমে যায় নি। অপরিমেয় মুনাফার সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে, ১৯৭০-র দশকে তারা উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধির হার অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিল। তার ফলে, বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ ভিক্টর পের্লোর হিসাব অনুযায়ী, মার্কিন প্রসেসিং শিল্প ১৯৮০ সালে একটা নজির স্থাপন করেছিল ৫৩৯ শতকোটি ডলার অঙ্কের উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে।

বৃহত্তম পুঁজিপতিদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে; অর্থনীতিতে তাদের নেতৃস্থানীয় অবস্থান তাদের সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করে। ১৯৭০-১৯৮০, এই দশ বছরে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির পরিচায়ক অঙ্কগুলি থেকে তা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। সেই সময়ে, মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমগ্র পরিমাণটা বেড়েছিল প্রায় ২·২ গুণ। সেই একই কালপর্বে, ৫০০টি বড় বড় মার্কিন শিল্প কর্পোরেশনের মোট নীট মুনাফা ২১·৬ শতকোটি ডলার থেকে বেড়ে হয়েছিল ৮১·২ শতকোটি ডলার,

বা ৩·৮ গুণ — বৃহত্তম ও প্রবলতম পুঁজি-মালিকদের অনুকূলে প্রত্যক্ষগোচর তফাৎ। একচেটিয় বুর্জোয়ার আয়ের অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি সমসাময়িক পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান পরগাছাসুলভ প্রকৃতিকেই প্রমাণ করে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে ও অন্যান্য অনর্জিত আয়ে লক্ষণীয় বৃদ্ধি অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনে, পুঁজিপতিদের প্রাপ্ত মুনাফা ১৯৩৮ সালের ১ শতকোটি পাউন্ড স্টার্লিং থেকে বেড়ে ১৯৮০ সালে হয়েছিল ২৪ শতকোটি পাউন্ড স্টার্লিং। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালে, মোট পুঁজিবাদী মুনাফা জাপানে বেড়েছিল ২৫ গুণ, ফ্রান্সে ১২ গুণ এবং পশ্চিম জার্মানিতে ৯ গুণ।

ভাড়াটে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি

পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ব্যবস্থার সাহায্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়ায়। পুঁজিপতিদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় প্রধানত ভাড়াটে শ্রমিকদের বর্ধিষ্ণু সংখ্যার দরুন। যত বেশি শ্রমিক পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত হয়, তত বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়।

প্রাথমিক সঞ্চয়নের কালপর্বে পুঁজিই সৃষ্টি করেছিল মজুরি শ্রমের প্রথম বাহিনীগুলি। তার পর থেকে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করার জন্য ক্রমেই আরও বেশি লোকের প্রয়োজন হওয়ায় মজুরি শ্রমের পংক্তিগুলিতে যোগ দিয়েছিল

শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা — নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা। ভূমিহীন কৃষকদের ও কারিগরদের, আর সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে কর্মপ্রার্থী অভিবাসী শ্রমিকদেরও একটা নিয়মিত অন্তর্প্রবাহ ঘটেছিল।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মজুরি শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ, ১৯০০ সালে ৮ কোটি ২০ লক্ষ, এবং ১৯৫০ সালে ৩০ কোটি। তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকের তথ্য অনুযায়ী, সমস্ত অ-সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীতে আছে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ, কিংবা ১৮৫০ সালের তুলনায় ৫৭ গুণ বেশি।

আলাদা এক-একটি দেশের পক্ষেও দ্রুত বৃদ্ধিহার লক্ষিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শিল্পোৎপাদন ও পরিবহণে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৮৫৯ সালের ১৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৮৯৯ সালে হয়েছিল ৬৮ লক্ষ। ১৯৮১ সালে মজুরি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০০৩ লক্ষ। জার্মানিতে শিল্প ও পরিবহণ শ্রমিকদের সংখ্যা ১৮৪৮ সালে ছিল ৭ লক্ষ এবং ১৯০৭ সালে ১ কোটি ১৬ লক্ষ। ১৯৮১ সালে, পশ্চিম জার্মানিতে মজুরি শ্রমিকের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২ কোটি ৩৪ লক্ষ। মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও দ্রুত বেড়ে চলেছে। বর্তমানে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক হল মজুরি শ্রমিক।

শোষিত মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যা যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে পুঁজির দ্বারা তাদের শোষণের নিবিড়তাও। প্রথমটি পুঁজিবাদী শোষণের পরিসর বিস্তৃত করে, আর দ্বিতীয়টি তাকে করে তোলে কঠোরতর। শোষণ নিবিড় করে পুঁজিপতি শ্রমিককে বাধ্য করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে এবং আরও বেশি পারিশ্রমিকহীন শ্রম দিতে। ভাষান্তরে, শ্রমিকদের সংখ্যার একটা বৃদ্ধিই হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের বৃদ্ধির এক বিস্তৃত উপাদান ও বৃদ্ধি এবং শোষণের বৃদ্ধি হল এক নিবিড় উপাদান।

পুঁজিবাদী শোষণের মাত্রার সূচকই হল **উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার**। উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণকে তা নির্ধারণ করে।

এই বইতে আমরা আগে জেনেছি যে অস্থির পুঁজিই ব্যবহৃত হয় শ্রম-বাহিনী ভাড়া করার জন্য, যাদের কাজ সৃষ্টি করে শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য এবং তদতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য। ফলত উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণ হিসাব করতে হবে সমগ্র পুঁজির শুধু অস্থির অংশটিকেই হিসাবে ধরে, সমগ্র পুঁজিটাকে নয়।

তা হলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হল অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত — একটি শতাংশে অভিব্যক্ত। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয় $\dot{U}$ হিসেবে। তা হলে:

$$\text{উ}' = \text{উ}/\text{অপু} \times ১০০।$$

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার শোষণের মাত্রাকে প্রকাশ করে। নতুন সৃষ্ট মূল্যের কোন অংশটি শ্রমিকের শ্রমশক্তির তুল্যমূল্য আর কোন অংশটি তার উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের তুল্যমূল্য তা প্রদর্শন করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যত বেশি হয়, নতুন সৃষ্ট মূল্যের তত বড় অংশটি পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত হয় এবং শোষণের মাত্রা তত বেশি হয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার কীভাবে হিসাব করা হয় দেখা যাক। আমাদের দৃষ্টান্তের সেলাই কারখানাটিতে পুঁজিপতি তার অস্থির পুঁজির ২ ডলার খরচ করে একজন শ্রমিককে ভাড়া করার জন্য (অপু=২)। এই শ্রমিকটিকে শোষণ করে সে পায় ৬ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য (উ=৬)। তা হলে, $\text{উ}' = \text{উ}/\text{অপু} \times ১০০ = ৬/২ \times ১০০ = ৩০০\%$। এর মানে এই যে আমাদের দৃষ্টান্তে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ৩০০ শতাংশ। নতুন সৃষ্ট মূল্যতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশটা শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্যের অংশটির চেয়ে তিনগুণ বেশি। কিংবা, শ্রমিকের সৃষ্ট প্রতি চার ডলার থেকে শ্রমিককে দেওয়া হয় এক ডলার, আর পুঁজিপতি নেয় তিন ডলার।

গোটা একটা উদ্যোগের হিসাবও আমাদের একই ফলাফল দেয়। প্রত্যহ আগাম দেওয়া অস্থির পুঁজি যেহেতু ৬০০ ডলার (অপু=৬০০), এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য ১,৮০০ ডলার (উ=১,৮০০), তাই

$$\text{উ}' = ১,৮০০/৬০০ \times ১০০ = ৩০০\%।$$

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার আবশ্যকীয় শ্রমের সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমের অনুপাত হিসেবেও প্রকাশ করা যেতে পারে, কেননা, আমরা দেখেছি, শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য সৃষ্ট হয় আবশ্যকীয় শ্রমের দ্বারা, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য — উদ্বৃত্ত শ্রমের দ্বারা। তা হলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার প্রকাশ করা যেতে পারে এইভাবে:

উ′=উ/অপু×১০০=উদ্বৃত্ত শ্রম/আবশ্যকীয় শ্রম×১০০।

যেহেতু আবশ্যকীয় শ্রম পরিমাপ করা হয় আবশ্যকীয় শ্রম-সময় দিয়ে এবং উদ্বৃত্ত শ্রম উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় দিয়ে, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এইভাবেও প্রকাশ করা যায়:

উ′=উ/অপু×১০০=উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়/আবশ্যকীয় শ্রম-সময়×১০০।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, ২ ঘণ্টা হল আবশ্যকীয় শ্রম-সময় এবং ৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হিসাব করার জন্য আমরা যদি উপরোক্ত সূত্রটি ব্যবহার করি, তা হলে সেই একই অঙ্কে এসে পৌঁছব, যে অঙ্কে এসে পৌঁছতাম অস্থির পুঁজির মূল্য আর উদ্বৃত্ত-মূল্য অনুযায়ী হিসাব করলে:

উ′=৬ ঘণ্টা/২ ঘণ্টা×১০০=৩০০%।

এইভাবে হিসাব করলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার আবশ্যকীয় ও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের অনুপাতটা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত করে; অন্য ভাষায় বলতে গেলে, তা দেখায় কর্ম-দিবসের কোন অংশটায় শ্রমিক নিজের জন্য কাজ করে এবং কোন অংশটায় পুঁজিপতির

জন্য কাজ করে। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এটাই দেখায় যে শ্রমিক নিজের জন্য যতটা কাজ করে, পুঁজিপতির জন্য করে তার তিনগুণ বেশি।

শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি

পুঁজিবাদের বিকাশলাভের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ধীরনিশ্চিত গতিতে বাড়ে, কেননা পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ত বৃদ্ধির প্রয়াস পায়।

মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের বিকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে এটা প্রত্যয়জনকভাবে প্রকাশ পায়।

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৪৯ সালে এই শিল্প উৎপন্ন করেছিল ২২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য, আর অস্থির পুঁজি ছিল ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। তা হলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ছিল ৯৬ শতাংশ ($U' = 22{,}7/23{,}7 \times 100 = 96\%$)।

পরবর্তী চল্লিশ বছরে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়েছিল ১·৩ গুণের সামান্য কিছু কম — ১৮৮৯ সালে তা গিয়ে পেঁছিছিল ১২২ শতাংশে।

১৮৮৯—১৯২৯ সালে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ক্রমে ক্রমে বেড়েছিল। ১৮৮৯ সালের স্তরের তুলনায় ১৯২৯ সালে তা বেড়েছিল ১·৫ গুণ, এবং পেঁছিছিল ১৮৪ শতাংশে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ও বিশেষত পরের বছরগুলিতে পুঁজি তার আক্রমণাভিযান বাড়িয়ে তুলেছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। তার প্রকাশ

ঘটেছিল উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে। ১৯২৯ থেকে ১৯৬৯, এই চল্লিশ বছরে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১·৭ গুণ বেড়ে ৩১৪ শতাংশে পৌঁছেছিল।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১৯৭০-এর দশকে বেড়ে চলেছিল। ১৯৭৪ সালে তা হয়েছিল ৩২৮ শতাংশ। এইভাবে, ১৮৪৯ থেকে ১৯৭৪, এই ১২৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়েছিল ৩·৪ গুণ। কী ভয়ঙ্কর বেগশক্তি! এর নিহিতার্থ এই যে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন মার্কিন শিল্প শ্রমিক যেখানে তার কর্ম-দিবসের ৫০ শতাংশ কাজ করত পুঁজিপতির জন্য, সেখানে সমসাময়িক শ্রমিক কর্ম-দিবসের ৭৭ শতাংশই পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য কাজ করে, সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য বস্তুতপক্ষে পুঁজিপতির পরগাছাসুলভ বাসনা-পূরণের পিছনেই যায়।

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও শোষণের মাত্রা বেড়ে চলছে, বাড়তি আরও দ্রুত হারে।

ব্রিটেনে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১৯৩৮ সালের ১৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৩ সালে হয়েছিল ২৩৮ শতাংশ। ফ্রান্সে, অঙ্কটা ছিল ১৯৩৮ সালে ১৬২ আর ১৯৫২ সালে ৩১৫। পশ্চিম জার্মানিতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১৯৫০ সালের ১৬২ শতাংশের তুলনায় ১৯৭৪ সালে গিয়ে পৌঁছেছিল ২৩৮ শতাংশে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শোষণের মাত্রা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় ১·৫—২ গুণ বেশি, কখনও বা এমন কি তারও বেশি।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হারের মধ্যেকার সম্বন্ধ

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হিসাব করা হয় ১০০ দিয়ে গুণিত অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত দিয়ে, সেই জন্য তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের প্রত্যক্ষ আনুপাতিক এবং অস্থির পুঁজির আয়তনের বিপরীত আনুপাতিক। অন্যান্য সব অবস্থা সমান থাকলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ যত বড়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার তত বেশি।

ধরে নেওয়া যাক যে আমাদের দৃষ্টান্তের শ্রমিকটি এক দিনে উৎপন্ন করেছিল ৬ ডলার মূল্যের নয়, বরং ধরুন, ১২ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা হলে তার হার হবে ১২/২×১০০=৬০০%, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য যখন ৬ ডলার তখনকার চেয়ে দুইগণ বেশি।

যদি উ'=উ/অপু হয়, তা হলে উ=উ'×অপু, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সঙ্গে ও অস্থির পুঁজির আয়তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আনুপাতিক। পুঁজিপতির দ্বারা আগাম দেওয়া অস্থির পুঁজি যত বড় হয়, অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও শোষণের মাত্রা তত বেশি হয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও সেই হেতু পুঁজিপতির সম্পদ তত বেশি হয়।

যে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে কোনো পুঁজিপতির পুঁজির আয়তন সীমিত থাকে। পুঁজিপতি খেয়ালখুশিমতো তার পুঁজি সম্প্রসারিত করতে পারে না। এর জন্য, হয় তাকে আয়ের একটা বাড়তি উৎস

খুঁজে বার করতে হবে, না হয় একটা বড় ঋণ জোগাড় করতে হবে, যে কাজটা মোটেই সহজ নয়। পুঁজিপতি তার অস্থির পুঁজি সম্প্রসারিত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না বলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বাড়াতে চেষ্টা করে। কার্যত এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং সে মজুরি শ্রমিকের উপরে শোষণের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলে, পুঁজির আত্মস্বার্থের জন্য তাকে আরও বেশি নিবিড়ভাবে কাজ করতে বাধ্য করে।

অধ্যায় ৫

পুঁজিপতিরা কীভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ায়

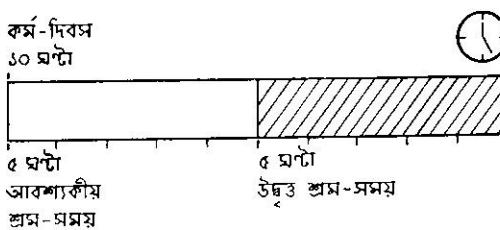
শোষণের মাত্রাবৃদ্ধির অর্থ এই যে মজুরি শ্রমিক নিজের জন্য কম সময় ধরে কাজ করে আর পুঁজিপতির জন্য বেশি কাজ করে। এর দরুন, শ্রমিকের কাছ থেকে নিংড়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত শ্রমের অনুপাতটা বাড়ে, আর আবশ্যকীয় শ্রমের অনুপাতটা কমে যায়। এই হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ভিত্তি।

শোষণ নিবিড় করা এবং তাই উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি প্রয়োগ করে নানান ধরনের উপায়-পদ্ধতি, তার সবগুলিই পাশবিক ও অমানুষিক। সেগুলি পুঁজির কর্তৃত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তারই স্বার্থসিদ্ধি করে, অন্য দিকে, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়।

অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য

পুঁজিবাদী শোষণ নিবিড় করার প্রথম ও সরলতম উপায় হল কর্ম-দিবস প্রসারিত করা। তা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়কে দীর্ঘ করে এবং তাই উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ বাড়ায়। যত বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম নিয়োজিত হয়, সৃষ্টি হয় তত বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য। তাই, কর্ম-দিবস প্রসারিত করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার বাড়ায়।

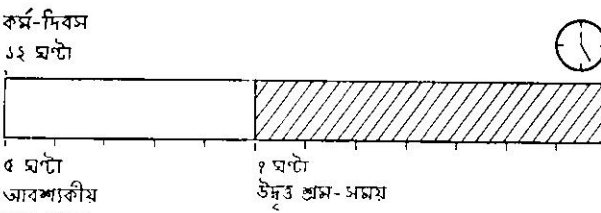
ধরে নেওয়া যাক যে গোড়ায় কর্ম-দিবস ছিল ১০ ঘণ্টা, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ছিল ৫ ঘণ্টা, আর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ও ছিল ৫ ঘণ্টা। একটি সরল চিত্রে এটা দেখানো যায়:



এটাও ধরে নেওয়া যাক যে এক ঘণ্টায় শ্রমিক উৎপন্ন করে ২ ডলারের সমান মূল্য। তার মানে এই যে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ে সে উৎপন্ন করে ১০ ডলারের সমান তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যরমূল্য (অপু=২ ডলার×৫ ঘণ্টা=১০ ডলার)। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে সে ১০

ডলারের সমান এক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে (উ=২ ডলার×৫ ঘণ্টা=১০ ডলার)। তা হলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হল ১০০ শতাংশ (উ′=উ/অপ্র×১০০=১০/১০×১০০=১০০%)।

পুঁজিপতি যদি বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের চেষ্টায় কর্ম-দিবস দুই ঘণ্টা বাড়িয়ে মোট ১২ ঘণ্টা করে, তা হলে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হবে আগেকার মতোই ৫ ঘণ্টা, কিন্তু উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বেড়ে হবে ৭ ঘণ্টা (৫ ঘণ্টা+২ ঘণ্টা=৭ ঘণ্টা)। ছবিতে তা দেখানো যেতে পারে এইভাবে:



এখন শ্রমিক পুঁজিপতির জন্য কাজ করে ৫ ঘণ্টা নয়, ৭ ঘণ্টা। ফলত, সে উৎপন্ন করে ১০ ডলার নয়, ১৪ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বেড়েছে ৪ ডলার, বা ১·৪ গুণ।

সেইভাবেই, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়েছে ৪০ শতাংশ (উ′=উ/অপ্র×১০০=১৪/১০×১০০=১৪০%)।

আমরা দেখেছি, কর্ম-দিবস প্রসারিত করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন বাড়াতে পারে। বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় মজুরি শ্রমিকের শ্রম

ব্যয়ে এক অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির ফলে, একটি প্রসারিত কর্ম-দিবসে তার শ্রমশক্তির ব্যয়ে এক অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির ফলে। যত বেশি বিমূর্ত শ্রম ব্যয়িত হয় ও যত বেশি শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হয়ে যায়, তত বেশি মূল্য উৎপন্ন হয়।

কর্ম-দিবসের এক অনাপেক্ষিক দীর্ঘকরণের দ্বারা ও সেই হেতু শ্রমশক্তি ব্যয়ে এক অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বলা হয় **অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনই পুঁজিবাদী শোষণের মর্মবস্তু। যে কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্যই আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের সীমানা পেরিয়ে প্রসারিত কর্ম-দিবসের ফল। তা হল শ্রম-সময়ের এমন এক প্রসারণ যা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজক উদ্বৃত্ত শ্রম সংঘটিত করে এবং বাড়ায়।

আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার এই উপায়টি সরলতম ও সহজতম। এর জন্য কোনো বিশেষ উৎপাদন-প্রযুক্তি বা শ্রম সংগঠন-কৌশল দরকার হয় না। তা অর্জন করার জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় হল মজুরি শ্রমের উপরে পুঁজির আর্থনীতিক ক্ষমতা। সেই জন্যই, পুঁজিবাদী বিকাশের এমন কি আদিতম পর্যায়গুলিতে, যখন পুঁজিপতিদের কাছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর অন্য কোনো উপায় ছিল না তখনও, পুঁজির দ্বারা এই পদ্ধতিই প্রযুক্ত হত। তাদের কাছে অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনই ছিল শোষণ বাড়ানোর প্রধান পদ্ধতি।

কর্ম-দিবস ও তার সীমা

কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে, পুঁজিপতি আর মজুরি শ্রমিকের স্বার্থ বৈরমূলক। আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের সীমা অতিক্রম করে কর্ম-দিবসকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করতে চেষ্টা করবে, আর শ্রমিক তার কাজের ঘণ্টাগুলি যথাসম্ভব কম করার জন্য লড়াই করবে। পুঁজিপতির আদর্শ হল ২৪ ঘণ্টার একটা কর্ম-দিবস, যেটা এমন একটা জিনিস যা অর্জন করা যায় না, শোষণ যত কঠোরই হোক না কেন। কর্ম-দিবসের কিছু কিছু সীমা থাকে, তা অমান্য করা যায় না। এই সীমাগুলি নির্ধারিত হয় দুটি বিষয় দিয়ে।

প্রথম। একজন লোকের নিজ কর্মক্ষমতা, প্রাণশক্তি বজায় রাখা ও পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নিজের শারীরিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য সময়ের দরকার হয়। বিশ্রাম, নিদ্রা ও আহারের জন্য তার অবশ্যই সময় পাওয়া দরকার। জামা-কাপড় ও আশ্রয়ও তার দরকার, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উষ্ণ রাখা দরকার। তার অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনও মেটাতে হবে, তা না হলে সে মারা যাবে। এই সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য শ্রমিককে অবশ্যই কিছুটা অবসর সময় দিতে হবে। জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য ও কাজ করার সামর্থ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য একজন লোকের যে-সময়টা দরকার, সেটাকে কর্ম-দিবসের অংশ করা যায় না; পুঁজিপতি সেটা উপযোজন করতে পারে না।

এই সময়টার দৈর্ঘ্য কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের একটা শারীরিক সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়।

দ্বিতীয়। নৈতিক, অথবা সামাজিকভাবে আরোপিত, সীমাও আছে। একজন শ্রমিকের নিজের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর সময় থাকা দরকার। তার সময় দরকার পড়ার জন্য, রেডিও শোনার জন্য, টিভি দেখার জন্য, সিনেমায় যাওয়ার জন্য, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য, ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর উপায়ের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেশ থেকে দেশান্তরে এক-এক রকম; সেগুলি নির্ভর করে দেশটির বিকাশ, সাংস্কৃতিক স্তর এবং যে অবস্থায় সেখানকার শ্রমিক শ্রেণী গঠিত হয়েছিল, তার উপরে। এযাবৎ, উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিকদের তুলনায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের প্রয়োজনগুলি পরিমাণে বেশি।

আমরা দেখেছি, কর্ম-দিবস অনির্দিষ্টভাবে বাড়ানো যায় না। সেই রকম, তা কমানেরাও একটা সীমা আছে: তাকে সংক্ষিপ্ত করে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের সমান করা যায় না, কেননা সে ক্ষেত্রে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করবে না এবং তাই উৎপাদন সংগঠিত করার জন্য পুঁজি আগাম দেবে না।

কর্ম-দিবসের প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণী আর পুঁজিপতিদের শ্রেণীর মধ্যে শক্তির অনুপাতের উপরে, এবং তা হল কর্ম-দিবসের স্থায়িত্বকাল নিয়ে তাদের সংগ্রামের পরিণতি।

আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়ার চেষ্টায় পুঁজিপতি কর্ম-দিবস প্রসারিত করার জন্য কোনো কিছু করতেই পরাঙ্মুখ হবে না। শক্তিস্থিতির ভারসাম্য তার অনুকূলে থাকলে, পুঁজিপতি কর্ম-দিবসের শুধু সামাজিক সীমাগুলিই নয়, শারীরিক সীমাগুলিও লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের একেবারে আদি পর্বগুলিতেই, বুর্জোয়া শ্রেণী কর্ম-দিবস দীর্ঘ করা সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল। এই সমস্ত আইনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের দিয়ে পুঁজিপতিদের জন্য সর্বাধিক সময় কাজ করিয়ে নেওয়া। ১৩৪৯ সালে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড কর্তৃক জারি করা প্রথমতম শ্রম সংবিধিতে বিধান দেওয়া হয়েছিল যে কর্ম-দিবস শুরু হবে সকাল ৫টায় এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৭টা বা ৮টায়, তার মধ্যে তিনবার এক ঘণ্টার বিরতি থাকবে। এইভাবে কর্ম-দিবসের প্রকৃত দৈর্ঘ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছিল ১১ বা ১২ ঘণ্টা। ১৪৯৬ সালের একটি সংবিধিতে ১৩৪৯ সালের সংবিধির আদেশকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন করা হয়। রাণী এলিজাবেথের জারি করা ১৫৬২ সালের এক সংবিধিতে বিরতিকাল ৩ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ২-২·৫ ঘণ্টা করা হয়, এবং এইভাবে কর্ম-দিবসের প্রকৃত দৈর্ঘ্য প্রসারিত করা হয়।

এইভাবে বর্ধিত অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যও বুর্জোয়াদের সন্তুষ্ট করে নি। তাই, শ্রমিকদের উপরে আর্থনীতিক চাপ বাড়িয়ে দিয়ে বুর্জোয়ারা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দী ধরে কর্ম-দিবস দীর্ঘ করে চলেছিল। ফলে, ১৮শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইংলণ্ডের বহু কারখানায় ও কর্মশালায় কর্ম-দিবসের ভয়াবহ দৈর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছেছিল ১৬-১৮ ঘণ্টায়।

প্রলেতারিয়েত বৃদ্ধিলাভ করায় এবং আরও সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে আরও সচেতন হয়ে ওঠায়, সংক্ষিপ্ততর কর্ম-দিবসের জন্য অদম্যভাবে সংগ্রাম করতে থাকে। বুর্জোয়ারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। কর্ম-দিবস সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনেকগুলি আইন জারি করা হয়। এই ধরনের প্রথম আইনটি ইংলণ্ডে জারি করা হয় ১৮৩৩ সালে; তাদের কাজের সর্বোচ্চ সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১৩ বছর বয়স অবধি শিশুদের জন্য ৮ ঘণ্টা এবং বালক-বালিকাদের জন্য (১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের) ১২ ঘণ্টা। ১৮৪৪ সালের কারখানা আইনে মেয়েদের জন্য কাজের সর্বাধিক সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১২ ঘণ্টা। ১৮৪৭ সালে, এই আইনগুলি আবার সংশোধন-পরিবর্তন করা হয় এবং নারী ও বালক-বালিকাদের জন্য কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ১০ ঘণ্টা করা হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বাড়তে থাকায় বুর্জোয়ারা আরও কিছু কিছু রেয়াত দিতে বাধ্য হয়। ১৯০১ সালে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট সীমা ব্রিটিশ শ্রমিকদের সমস্ত বর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। নতুন

নিয়মকানুনে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের কাজের সর্বাধিক সময় নির্দিষ্ট করা হয় শনি-রবিবার বাদে অন্য দিনগুলিতে রোজ ১২ ঘণ্টা ও শনিবারে ৫·৫ ঘণ্টা (সপ্তাহে মোট ৬৫·৫ ঘণ্টা)। নারী ও বালক-বালিকারা কাজ করত সপ্তাহে ৫৬·৫ ঘণ্টা। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশেও অন্য কতকগুলি শ্রম বিধান জারি করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অধিকাংশ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশেই ১০ ঘণ্টার কর্ম-দিবস প্রচলিত হয়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব রাশিয়ায় ৮ ঘণ্টার কর্ম-দিবস চালু করে; এর দরুন এবং অন্যান্য দেশে স্বীয় অধিকারের জন্য শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের দরুন বুর্জোয়াদের হার মানতে হয়েছিল। ১৯১৯ সালে কতকগুলি বুর্জোয়া দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ওয়াশিংটনে মিলিত হয়ে ৮ ঘণ্টার কর্ম-দিবস চালু করে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ কথা সত্যি যে সব সরকারই এই চুক্তি স্বীকার করে নি। কিন্তু কালক্রমে, অনেক শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশেই ৮ ঘণ্টার কর্ম-দিবস প্রবর্তিত হয়।

এর পর কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য নিয়ে সংগ্রামে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৩৬ সালে, শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যুদয়ে ও গণফ্রন্ট সরকার গঠনের পর, ফ্রান্সে ৪০ ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ সম্পর্কে আইন পাশ হয়। পরে, ৪০ ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ চালু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্য কতকগুলি দেশে। জানুয়ারি

১৯৮২-তে সংক্ষিপ্ততর কর্ম-সপ্তাহ (৩৯ ঘণ্টা) চালু করে ফ্রান্সে এক নতুন সংবিধি গৃহীত হয়।

সংক্ষিপ্ততর কর্ম-দিবসের ব্যবস্থা করে গৃহীত আইনগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্ব। কিন্তু, অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদে, পুঁজিপতিরা এমন কি আজও এই সমস্ত আইনকে অবজ্ঞা করে। এই সমস্ত আইনের দ্বারা চাপানো সীমাগুলি তারা সুকৌশলে লঙ্ঘন করে, এবং আইন-নির্ধারিত কাজের চেয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেয় শ্রমিকদের দিয়ে। কর্ম-সপ্তাহের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ছিল ১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০·৫ ঘণ্টা, জাপানে — ৪৬ ঘণ্টা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্ম-সপ্তাহের দৈর্ঘ্য হল ৪৫ থেকে ৫৬ ঘণ্টা পর্যন্ত, দক্ষিণ কোরিয়ায় — ৫৩·৮, সিঙ্গাপুরে ও শ্রীলঙ্কায় — ৪৮·৬ ও গুয়াটেমালায় — ৪৬·৫ ঘণ্টা, ইত্যাদি।

কর্ম-দিবস দীর্ঘ করার ও সেইভাবে অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন বাড়ানোর একটি পদ্ধতি হল ওভারটাইম বা অধিকাল কাজ, তা ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি তথা নবীন উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও। সামরিক শিল্পগুলিতে তা এক নিয়মিত ব্যাপার, সেখানে সমরবাদের স্বার্থে এমন কি শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকেও বলি দেওয়া হয়। মালিকদের বাড়তি মুনাফার একটি উৎস এই অধিকাল কাজ শ্রমিকদের উপরে খুবই অনিষ্টকর ফল-প্রভাব বিস্তার করে, তাদের শক্তির অতিরিক্ত শ্রম

করিয়ে শ্রান্ত করে ফেলে, তাদের স্বার্থ নষ্ট করে এবং শিল্পজনিত আঘাতের কারণ হয়।

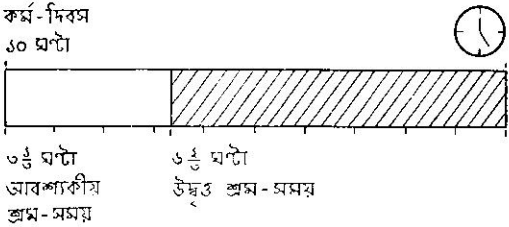
শ্রমের নিবিড়করণ

পুঁজিপতিরা যদিও কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের উপরে আইনগত সীমাগুলি ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, তবুও অনাপেক্ষিক শ্রম নিয়োগ বাড়িয়ে, শ্রমশক্তির অনাপেক্ষিক ব্যয় বাড়িয়ে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করার বাসনা কিছুটা বিঘ্নিত হয় এই সীমাগুলির দরুন। শ্রমিকের শক্তির শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে না-নেওয়া পর্যন্ত, শ্রমিকের সমস্ত শ্রমশক্তি নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত পুঁজিপতি সন্তুষ্ট হয় না। অন্যভাবে কাজ করাটাই তার স্বার্থার্জনের অন্তহীন প্রবৃত্তির সঙ্গে বেমানান হত। সেই জন্যই পুঁজিপতি শ্রমের নিবিড়তা ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলে, যাতে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য বিস্তৃত না-করেই শ্রমিককে দিয়ে তার চরমতম শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ব্যয় করানো যায়।

শ্রমের নিবিড়করণের অর্থ হল কাজের গতিহার দ্রুত করে তোলা। উৎপাদ বাড়ানো হয় শ্রম-নিবিড়তা বাড়িয়ে, অর্থাৎ শ্রম-সময়ের প্রতি একক-পিছু শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি শ্রম করিয়ে, আরও শ্রমশক্তি ব্যয় করিয়ে। কোনা সাময়িক বিরতির সুযোগ না রেখে কর্ম-দিবস যেন ঘনীভূত করা হয়। পুঁজিপতি এমন ব্যবস্থা করে যাতে শ্রমিক কর্ম-দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত

কাজ করে তারই জন্য। দীর্ঘতর কর্ম-দিবসের মতো, উচ্চতর শ্রম-নিবিড়তা শ্রমের অনাপেক্ষিক ব্যয়, শ্রমশক্তির অনাপেক্ষিক ব্যয় বাড়ায়। একমাত্র তফাৎ এই যে প্রথম ক্ষেত্রে বৃদ্ধিটা অর্জিত হয় বাড়তি কাজের সময়ের মধ্যে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একই ফল অর্জিত হয় কর্ম-দিবসের প্রতিটি ঘণ্টার উপরে শ্রমশক্তির ব্যয় বাড়িয়ে।

শ্রমের নিবিড়করণের অর্থ এই যে প্রতি ঘণ্টায় শ্রমের আরও বেশি অনাপেক্ষিক মোট পরিমাণ ব্যবহৃত হয়; তাই উৎপাদটিতে অঙ্গীভূত হয় আরও বেশি শ্রম এবং উৎপন্ন হয় আরও বেশি মূল্য। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনকে এই সমস্ত পরিবর্তন কীভাবে প্রভাবিত করে দেখা যাক। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মতো, ধরে নেওয়া যাক যে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য ১০ ঘণ্টা, শ্রমশক্তির মূল্য ১০ ডলার, এবং এক ঘণ্টায় শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য হল ২ ডলার। শ্রম-নিবিড়তা ১·৫ গুণ বেড়েছে ধরে নিলে, শ্রমিক এখন এক ঘণ্টায় উৎপন্ন করে ১·৫ গুণ বেশি মূল্য, অথবা ৩ ডলার। এখন শ্রমশক্তির মূল্য শ্রম-নিবিড়তায় বৃদ্ধি ঘটার আগে যেমন হয়েছিল তেমন ৫ ঘণ্টায় পুনরুৎপন্ন হয় না, পুনরুৎপন্ন হয় ৩১/৩ ঘণ্টায় (১০/৩=৩ ১/৩)। এটাই হল আবশ্যকীয় শ্রম-সময়। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হল ৬ ২/৩ ঘণ্টা) (১০ ঘণ্টা–৩ ১/৩ ঘণ্টা=৬ ২/৩ ঘণ্টা)। এই সময়ে শ্রমিক সৃষ্টি করে ২০ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য (৩ ডলার×৬ ২/৩ ঘণ্টা=২০ ডলার)। নিচের সরল ছকটিতে তা দেখানো যায়:



এবারে দেখা যাক শ্রমের নিবিড়করণের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি কী অর্জন করেছে। এর আগে, সে উদ্বৃত্ত-মূল্যে ১০ ডলার আদায় করে নিয়েছিল। শ্রমের নিবিড়করণের দরুন, এই অংকটা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বেড়েছে ১০০ শতাংশ (উ=উ/অপু×১০০=১০/১০×১০০=১০০%), ১০০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ (উ=২০/১০×১০০=২০০%)।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের মধ্যে শ্রমের নিবিড়করণ যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করেছে, তারই দরুন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে ও হারে এই বৃহৎ বৃদ্ধিটা ঘটে। প্রথম, শ্রমিক তার উচ্চতর শ্রম-নিবিড়তার দরুন তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন করে সংক্ষিপ্ততর সময়ে। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় তদনুযায়ী বাড়ে: শ্রমিক এখন আরও বেশি সময় ব্যয় করে পুঁজিপতির জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের প্রতিটি ঘণ্টায় শ্রমিক আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। অতএব, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের প্রতি ঘণ্টায় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ্য, দুটোই বেড়ে

গেছে। ভাষান্তরে, শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতা বাড়িয়ে পুঁজিপতি বিরাট মুনাফা লাভ করে; সেই জন্যই, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের, তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার কী পরিণতি ঘটতে পারে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই পুঁজিপতি শ্রম-নিবিড়তা বাড়িয়ে চলে।

শ্রমের নিবিড়করণ অর্জনের জন্য পুঁজিপতি কোন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে? সে শ্রমিককে আরও দ্রুত কাজ করতে বাধ্য করে, নির্দিষ্ট সময়ে আরও বেশি উৎপাদনী ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে বাধ্য করে; উৎপাদন-চক্রগুলিতে সাময়িক বিরতিগুলিও সে হ্রাস করে অথবা পুরোপুরি বাদ দেয়। একই উদ্দেশ্যে সে প্রত্যেকটি একক শ্রমিকের চালানোর জন্য আরও বেশি মেশিন-টুল ও লেদ-যন্ত্র বসায়, কাজের গতিহার ত্বরান্বিত করে, কনভেয়রের দ্রুতি বাড়ায়, ইত্যাদি। পুঁজিপতি উদ্যোগপতিরা ক্রমেই আরও বেশি উঁচু কোটা নির্ধারণ করে এবং আরও ব্যাপক পরিসরে কালমাপক যন্ত্রভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।

যেসব পুরনো যন্ত্রপাতি মাঝারি ধরনের নিবিড় শ্রমের পক্ষে উপযুক্ত, সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা হয় এমন সব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে, যেগুলির জন্য শ্রমিকদের তরফ থেকে সর্বাধিক প্রচেষ্টা দরকার হয় (যেমন, ইতালির একটি কারখানায় বসানো আধা-স্বয়ংক্রিয় পাইপ-প্রস্তুতকারক যন্ত্র, যেটির চালককে প্রতি দুই সেকেণ্ডে চোদ্দটি ক্রিয়া করতে হয়)। কাজের ক্রমবর্ধমান বেগমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ও বজায় রাখার জন্য কম্পিউটর ও টেলিভিশন ক্রমেই বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত

হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রব্যবস্থাগুলি মার্কিন 'ক্রাইসলার' ও 'ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক' সংস্থায় কর্মীদের সর্বাধিক কাজের বোঝা ও অবিরাম কাজের নিয়ন্ত্রণ করে।

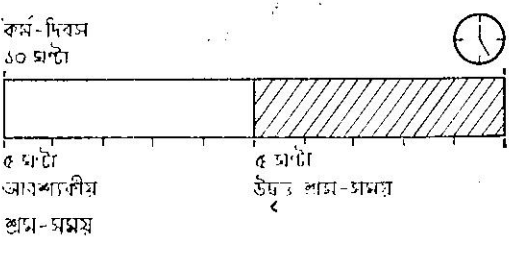
বর্তমানে, কায়িক শ্রমের নিবিড়তা পুঁজিবাদী দেশগুলির বহু শিল্পোদ্যোগেই শারীরবৃত্তীয় সীমায় গিয়ে পেঁছেছে। সেই সঙ্গে, চলতি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অবস্থায়, বিশুদ্ধ কায়িক কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় বরং স্নায়বিক কর্মশক্তির ব্যয়ই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক একজন শ্রমিককে আরও বেশি যন্ত্র চালাতে হয়, আরও বেশি সাধিত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং দ্রুত পরিবর্তমান প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাকে নিজে থেকেই অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, প্রায়শই জরুরী পরিস্থিতিতে। ফলে, শ্রমিকের উপরে ভাবাবেগগত বোঝা চাপে মাত্রাতিরিক্ত। নিয়ত স্নায়বিক ও মানসিক চাপ শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উপরে বিপর্যকর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে নিঃশেষে শ্রান্ত করে ফেলে, এবং তার ফলে প্রায়শই মানসিক রোগ দেখা দেয়।

শ্রমিকরা কর্ম-দিবসের বিস্তৃতি ও শ্রমের নিবিড়করণ, উভয়েরই বিরোধিতা করে। পুঁজিবাদধর্মী যে র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক চাপের মাত্রাতিরিক্ততা ঘটে, শ্রমিকরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়; তারা দাবি করে অনুকূলতম কাজের অবস্থা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য

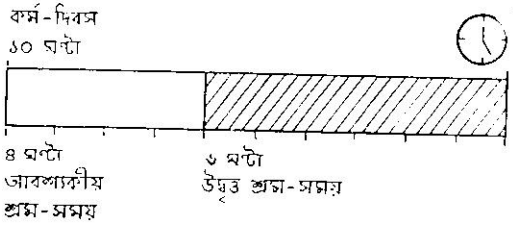
শ্রমশক্তির অনাপেক্ষিক ব্যয় বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পুঁজিপতিদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শ্রমিকরা অদম্যভাবে প্রতিরোধ করে বলে, পুঁজিপতিরা পারিশ্রমিকহীন শ্রম আদায় করে নেওয়ার অন্যান্য পদ্ধতির, সূক্ষ্মতর পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, যেমন — নির্দিষ্ট কর্ম-দিবসের কাঠামোর ভিতরে আবশ্যকীয় ও উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যেকার অনুপাত পরিবর্তন করে এবং সেইভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার, দুটোই বাড়িয়ে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যে দৃষ্টান্তটি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখান থেকেই অগ্রসর হওয়া যাক: কর্ম-দিবস — ১০ ঘণ্টা, শ্রমশক্তির মূল্য — ১০ ডলার, এক ঘণ্টায় মজুরি শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য — ২ ডলার, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় — ৫ ঘণ্টা, এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় — ৫ ঘণ্টা।



যদি ধরে নিই যে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ৫ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৪ ঘণ্টা করা হয়েছে, তা হলে উদ্বৃত্ত

শ্রম-সময় (১০ ঘণ্টার কর্ম-দিবস ধরে নিয়ে) হবে ৬ ঘণ্টা। ছবিতে এটা দেখা যেতে পারে এইভাবে:



প্রসারিত উদ্বৃত্ত সময়ের দ্বারা পুঁজিপতি কীভাবে মুনাফা করবে? ৬ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত সময়ে শ্রমিক সৃষ্টি করবে ১২ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য (২ ডলার×৬=১২ ডলার), সুতরাং পুঁজিপতি আরও ২ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করবে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সর্বমোট পরিমাণ বাড়বে ১·২ গুণ (১২ ডলার/১০ ডলার=১·২ গুণ)। তদনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বাড়বে: উ=উদ্বৃত্ত সময়/আবশ্যকীয় সময়=৬ ঘণ্টা/৪ ঘণ্টা×১০০= ১৫০%, বৃদ্ধিটা হল ১·৫ গুণ (১৫০%/১০০%= ১·৫)।

সুতরাং উদ্বৃত্ত সময়ের পক্ষে এক বৃহত্তর অনুপাত শ্রমকে নিবিড় করে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়ায়। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমিয়ে এবং তার সঙ্গে উদ্বৃত্ত সময় বাড়িয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় তাকে বলে **আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমানোর ব্যাপারটা পুঁজিপতি কীভাবে করে? একটাই মাত্র উপায় আছে — শ্রমশক্তির

মূল্য হ্রাস করা। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ৫ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৪ ঘণ্টা করা সম্ভব শুধু এই শর্তে যে শ্রমশক্তির মূল্য ১০ ডলার থেকে কমিয়ে ৮ ডলার করা হয়েছে। শ্রমশক্তির তুল্যমূল্য, ৮ ডলার, উৎপন্ন হয় ৪ ঘণ্টার শ্রম-সময়ে (৮ ডলার/২ ডলার=৪ ঘণ্টা)।

আমরা জানতে পেরেছি, শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমিকের ও তার পরিবারের জীবিকানির্বাহের উপায়ের মূল্য দিয়ে। সুতরাং সেই নির্দিষ্ট অবস্থায় শ্রমশক্তির মূল্যহ্রাস একমাত্র সম্ভব শ্রমিক ও তার পরিবারের দ্বারা ব্যবহৃত সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য হ্রাস করে। পণ্যসামগ্রীর মূল্য যেহেতু শ্রম-উৎপাদনশীলতার বিপরীত আনুপাতিক, সেই জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েই শ্রমিকের জীবিকার্জনের উপায়ের মূল্য, ও তাই তার শ্রমশক্তির মূল্যও কমানো সম্ভব।

এ হল আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের ভিত্তি: এর শিকড়টা রয়েছে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মধ্যে। এই বৃদ্ধিকে পুঁজিপতিরা নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করে বলে, তারা শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং তাই আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে।

সংক্ষেপে, পর-পর এক-একটি পর্যায়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের আর্থনীতিক বন্দোবস্তটিকে আমরা বর্ণনা করতে পারি এইভাবে:

প্রথম। শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ে সেই সমস্ত

শিল্পে, যেগুলি শ্রমিকের (ও তার পরিবারের) জীবিকানির্বাহের উপায় যোগায়, মুখ্যত সেই সমস্ত শিল্পে যেগুলি উৎপন্ন করে শ্রমিকদের ভোগ্যসামগ্রী এবং এই সমস্ত ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার্য উৎপাদনের উপায়।

দ্বিতীয়। আলোচ্য শিল্পগুলিতে উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা শ্রমিকের (ও তার পরিবারের) অস্তিত্বরক্ষার উপায়ের নিম্নতর মূল্যের লক্ষ্যার্জন করে।

তৃতীয়। শ্রমিকের অস্তিত্বরক্ষার উপায়ের মূল্য যত কম হয়, তার শ্রমশক্তির মূল্যও তত কম হয়।

চতুর্থ। শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস পাওয়ায়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তার তুল্যমূল্য উৎপন্ন করার জন্য আগের চেয়ে কম সময় প্রয়োজন হয়; ভাষান্তরে, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস পায়।

পঞ্চম। একটি কর্ম-দিবস নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হলে, কম আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের অর্থ হয় আরও বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

ষষ্ঠ। আরও বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের অর্থ এই যে শ্রমিক পুঁজিপতির জন্য কাজ করে আগেকার তুলনায় বেশি সময় এবং তাই নিয়োগ করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম।

সপ্তম। বেশি পরিমাণে শ্রমনিয়োগ অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে, তার সবটাই চলে যায় পুঁজিপতির কাছে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য ও শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

শ্রম-উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি উদ্বৃত্ত-মূল্যে বৃদ্ধি ঘটায় বলে, পুঁজিপতি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়াস পায় — যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুনাফাদায়ক হয়। ঐতিহাসিকভাবে, পুঁজিবাদে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে তিনটি প্রধান পর্যায় আছে: সরল পুঁজিবাদী সহযোগিতা, শ্রম বিভাজন ও ম্যানুফ্যাকচার, এবং যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও বৃহদায়তন শিল্প (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের পর্যায়ে উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা অর্জিত হয় সাজসরঞ্জাম, উৎপাদনী প্রযুক্তি ও শ্রম সংগঠনে উন্নয়ন ঘটিয়ে, এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়িয়ে; তার সঙ্গে চলে পুঁজিপতিদের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কৃতিত্বগুলির ব্যবহার এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের উপরে পুঁজির আরও বেশি আক্রমণাভিযান।

পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের তাগিদের ফলে পুঁজিবাদী বিকাশের সমস্ত পর্যায়ে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হয়। এই পর্যায়গুলি ধরে শ্রম-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিহার মন্থর হয় না, বরং ত্বরিতই হয়। তার মানে এই যে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সম্প্রসারিত পরিসরে বৃদ্ধি পায়। এর উদাহরণ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক শিল্প শ্রমিক-পিছু উৎপাদ বেড়েছিল ১৮৫৯-১৮৯৯ সালে ১·৭ গুণ, ১৮৯৯-১৯৩৯ সালে ২·২ গুণ এবং ১৯৩৯-

১৯৭৯ সালে ৩·৮ গুণ। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও শ্রম-উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধিহার এই রকমই ছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালে তা বেড়েছিল জাপানে ১১ গুণ, ইতালিতে ৫ গুণ, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে ৪ গুণ, ফ্রান্সে ৩·৬ গুণ এবং ব্রিটেনে ২·৫ গুণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও শ্রম-উৎপাদনশীলতা বেড়েছে দর্শনীয়ভাবে।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জনগণের কল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নত করার, মানবজাতিকে রোগমুক্ত করার অসীম সুযোগ সৃষ্টি করে। ধীরনিশ্চিত সামাজিক প্রগতির নতুন নতুন সম্ভাবনা তা উন্মুক্ত করে এবং উন্নততর দেশগুলির তরফ থেকে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু পুঁজিবাদ এই সমস্ত সুযোগের ব্যবহারকে পরিহার করে, এই সুযোগগুলি তার কায়েমি স্বার্থের পরিপন্থী; তার কায়েমি স্বার্থ হল — উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়িয়ে তুলে পুঁজিপতিদের সম্পদশালী করার উপায় হিসেবে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে ব্যবহার করা।

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য

শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে পুঁজিপতিরা যে শুধু আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে তাই নয়, **অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যও** উপযোজন করে।

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য হল সেইটা, একজন একক

পুঁজিপতি যেটা লাভ করে পণ্যসামগ্রীর সামাজিক মূল্য আর সেই বিশেষ পুঁজিপতিটির মালিকানাধীন উদ্যোগটিতে উৎপাদিত সেগুলির একক মূল্য — এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের দরুন। এই পার্থক্যটা হল আলোচ্য উদ্যোগটিতে বিদ্যমান উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতার — গড় শ্রম-উৎপাদনশীলতার তুলনায় — ফলে।

এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছি তাতে শ্রমিকটি কাজ করত দিনে ১০ ঘণ্টা, তার শ্রমশক্তির মূল্য ছিল ১০ ডলার এবং তার উৎপন্ন করা উদ্বৃত্ত-মূল্য ছিল ১০ ডলার। যদি ধরে নিই যে একজন শ্রমিক রোজ উৎপন্ন করে উৎপাদের ১০ একক, তার প্রত্যেকটিতে এই শ্রমিকটির মূর্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের মূল্য থেকে স্থানান্তরিত পুরনো মূল্যের ১ ডলার অঙ্গীভূত রয়েছে, তা হলে তার সমগ্র দৈনিক উৎপাদের মোট মূল্য হবে ৩০ ডলারের সমান (১০ সপু+১০ অপু+১০ উ=৩০)। উৎপাদের একটি এককের সামাজিক মূল্য ৩ ডলার (৩০ ডলার/১০=৩ ডলার)।

পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে দিয়ে তার শ্রম-উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করিয়ে নিতে পারে, তা হলে শ্রমিকটি এক দিনে উৎপাদের ২০ একক উৎপন্ন করবে। আগেকার মতো, এর প্রতিটি এককে অঙ্গীভূত রয়েছে পুরনো মূল্যের ১ ডলার, সর্বমোট ২০ ডলার। আগে আমরা জানতে পেরেছি (প্রথম অধ্যায়), নতুন সৃষ্ট মূল্য শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে বদলায় না।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে তা ২০ ডলারের সমান, শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগেকার মতো। উৎপাদনের ব্যয়িত উপায়গুলির মূল্যের সঙ্গে মিলিয়ে তা দাঁড়ায় মোট ৪০ ডলার (২০ সপু+১০ অপু+১০ উ=৪০) — উৎপাদের এই সমস্ত ২০টি এককের মোট মূল্য। অতএব, একটি এককের আলাদা মূল্য হল ২ ডলার (৪০ ডলার/২০=২ ডলার)।

কিন্তু বাজারে, এই সমস্ত পণ্যের পুঁজিপতি মালিক সেগুলি বিক্রি করবে, অন্য সমস্ত পুঁজিপতির মতোই, সেগুলির সামাজিক মূল্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দামে, অর্থাৎ একক প্রতি ৩ ডলার। তদনুযায়ী, ৩০টি এককের জন্য সে পাবে ৬০ ডলার, তা থেকে ২০ ডলার চলে যাবে উৎপাদনের উপায় বাবদ ব্যয় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ১০ ডলার যাবে শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য। বাকি ৩০ ডলার পুঁজিপতির হাতে গিয়ে পড়বে উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসেবে, যেটা শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে ২০ ডলার বেশি (৩০ ডলার — ১০ ডলার=২০ ডলার)। এই ২০ ডলার হল অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য, যেটা সৃষ্টি হয়েছে এই পুঁজিবাদী উদ্যোগটিতে উৎপন্ন সমস্ত পণ্যের সামাজিক ও আলাদা-আলাদা মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যের দরুন (৬০ ডলার — ৪০ ডলার=২০ ডলার)।

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে পুঁজিপতি শুধু উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণই নয়, তার হারও বাড়ায়। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার তিনগুণ বেড়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তা ছিল ১০০ শতাংশ

(উ'=উ/অপু×১০০=১০/১০×১০০=১০০%)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা বেড়েছে আরও ২০০ শতাংশ (উ'=উ/অপু ×১০০=৩০/১০×১০০=৩০০%)।

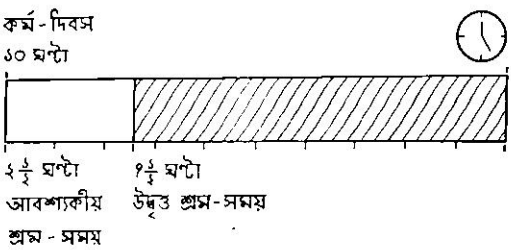
উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক ও অতিরিক্ত রূপগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে।

মূল সাদৃশ্য হল সেগুলির অভিন্ন উৎস — শ্রম-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, যদিও এখানেও একটা পার্থক্য আছে। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় **একক শ্রম-উৎপাদনশীলতায়** একটা বৃদ্ধির দরুন, অর্থাৎ, শুধু সেই সমস্ত উদ্যোগে যেখানে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়। তাই, একটি সেলাই কারখানার মালিক যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করে তার একমাত্র কারণ হল এই বিশেষ সেলাই কারখানায় শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পক্ষান্তরে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় **সামাজিক শ্রম-উৎপাদনশীলতা** বৃদ্ধির ফলে, অর্থাৎ কোনো একক উদ্যোগে নয়, জাতীয় অর্থনীতির সেই সমস্ত শাখায়ই, যেগুলি এমন সব সামগ্রী তৈরি করে যা শ্রমশক্তির মূল্য গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অতিরিক্ত ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের ক্ষেত্রে আরেকটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই যে দুটিই উৎপন্ন হয় কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যে অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির দরুন নয়, বরং আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করে অর্জিত অধিকতর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের দরুন। যে বন্দোবস্তটির দ্বারা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জিত হয়, তা আমরা আগেই দেখেছি। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনকে তা কীভাবে প্রভাবিত করে, সেটা দেখা যাক। ধরে নেওয়া

যাক যে কর্ম-দিবস ১০ ঘণ্টা, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ৫ ঘণ্টা, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ৫ ঘণ্টা, শ্রমশক্তির মূল্য ১০ ডলার, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যও ১০ ডলার।

আমরা জানি যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি এই সমস্ত পরস্পরসম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করে: উদ্বৃত্ত-মূল্য বেড়ে হয় ৩০ ডলার, অথচ শ্রমশক্তির মূল্য থেকে যায় ১০ ডলারেই। তার মানে এই যে মোট ৪০ ডলারের নতুন মূল্য প্রত্যেক ১০ ঘণ্টায় উৎপন্ন হয়, অথবা ৪ ডলারের নতুন মূল্য উৎপন্ন হয় প্রতি ১ ঘণ্টায়, বনাম আগেকার ২ ডলার (৪০ ডলার:১০ ঘণ্টা=৪ ডলার)। এখন, শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন হচ্ছে ২ ১/২ ঘণ্টার কাজে (১০:৪=২ ১/২)। এই ২ ১/২ ঘণ্টা হল আবশ্যকীয় শ্রম-সময়। তদনুযায়ী, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হল ৭ ১/২ ঘণ্টা (১০ ঘণ্টা — ২১/২ ঘণ্টা=৭ ১/২ ঘণ্টা)। ৭ ১/২ ঘণ্টায় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য হল ৩০ ডলার (৪ ডলার×৭ ১/২ ঘণ্টা=৩০ ডলার)। ছবিতে এটা প্রকাশ করা যায় এইভাবে:



এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের একটা বৃদ্ধি ঘটেছে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাসের দরুন, যেমন

হয়ে থাকে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের বেলায়। কিন্তু, এখানেও বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের বেলায় কম আবশ্যকীয় সময়টা হল শ্রমশক্তির হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যের ফল, আর অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের বেলায় শ্রমশক্তির মূল্য পরিবর্তিত হয় না: শ্রমিকের ব্যক্তিগত শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুন সে তার কাজের প্রত্যেক ঘণ্টায় একটু বেশি সামাজিক মূল্য উৎপন্ন করতে সক্ষম আবশ্যকীয় শ্রম-সময়টাকে কমিয়ে। সুতরাং তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন করতে শ্রমিকের এখন একটু কম সময় দরকার হয়।

আরও একটি পার্থক্য রয়েছে অতিরিক্ত ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজনকারী পুঁজিপতিদের সংখ্যার মধ্যে। উচ্চতর সামাজিক শ্রম-উৎপাদনশীলতা শ্রমিকদের মোট সংখ্যার শ্রমশক্তির নিম্নতর মূল্যের কারণ হয় বলে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজিত হয় সমস্ত পুঁজিপতির দ্বারা, সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা। আর, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য শুধু উপযোজিত হয় একক পুঁজিপতিদের দ্বারা, যারা তাদের উদ্যোগগুলিতে এমন সব কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনা প্রবর্তন করেছে যেগুলি এখনও পর্যন্ত জাতীয় স্তরে ব্যবহৃত হয় নি। অনেকাংশে এই সমস্ত নবোদ্ভাবনার দরুনই এই উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত মজুরি শ্রমিকদের শ্রম-উৎপাদনশীলতা উচ্চতর; এবং আমরা জানি যে মজুরি শ্রমিকদের উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতাই অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস।

এটা অবশ্যম্ভাবী যে প্রারম্ভিকভাবে আলাদা এক-একটি উদ্যোগে প্রবর্তিত কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন ও নবোদ্ভাবনাগুলি কালক্রমে জাতিব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পরে, অধিকতর উৎপাদনশীল শ্রম গড় সামাজিক শ্রম হয়ে যায়। ফলে, পণ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস পায়। একক ও সামাজিক মূল্যের মধ্যে একটা পার্থক্য আর থাকে না, এবং তাই যে-পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করত তাদের জন্য কোনো বাড়তি মুনাফাও আর থাকে না। এ সবই প্রমাণ করে যে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে বিশিষ্টভাবে পৃথকরূপে, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য কোনো একটি আলাদা উদ্যোগের মালিকের দ্বারা নিয়তই অর্জিত হতে পারে না; একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই শুধু তা অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু, কোনো একটি উদ্যোগে তার অস্তিত্ব না থাকলেও, অন্য একটি উদ্যোগে তা উৎপন্ন হতে শুরু করে, এইভাবে তা পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনার উদ্দীপনা যোগায়।

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের চেষ্টায় পুঁজিপতিরা তাদের উদ্যোগগুলিতে শ্রম-উৎপাদনশীলতা গড়ের চেয়ে উচ্চতর একটা স্তরে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেয়। এই বিষয়টা মনে রেখেই তারা নতুন প্রযুক্তি আর আরও যুক্তিসহ উৎপাদনী সংগঠন প্রবর্তন করে। সেটা করে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কিছু

সুবিধা লাভ করে। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। তারাও অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তাই তারাও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রবর্তন করে। ফলে, নির্দিষ্ট শিল্পটির ভিতরে সমস্ত উদ্যোগেই নতুন প্রযুক্তি ধীরনিশ্চিতভাবে প্রবর্তিত হয়, পুরনো যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশলগত সাজসরঞ্জামকে তা ক্রমে ক্রমে প্রতিস্থাপিত করে। সামগ্রিকভাবে, তা কৃৎকৌশলগত প্রগতি নিশ্চিত করে এবং সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অধিকতর বিকাশের অবকাশ সৃষ্টি করে।

আমরা দেখেছি, পুঁজিপতিকে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনে যে ব্যাপারটা উৎসাহ যোগায়, সেটা সমাজের স্বার্থ নয়, কৃৎকৌশলগত প্রগতির চেতনা নয়, শ্রমিকের শ্রম সহজতর করার বাসনা নয় কিংবা ক্রেতাদের উপকারার্থে তার পণ্যগুলির দাম কমানোর বাসনাও নয়। পুঁজিপতির একমাত্র প্রণোদনা হল অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করার ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করার বাসনা।

মুনাফার তাগিদে উন্নত দেশগুলির পুঁজিপতিরা আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে; তাকে তারা ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য। আমাদের কালে, ক্রমেই বেশি করে প্রযুক্ত হয় নতুন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রতিস্থাপিত করে পুরনো প্রযুক্তিকে, এবং পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর পরিসরে। কম্পিউটর, মাইক্রোপ্রসেসর, ম্যানিপুলেটর ও রোবট

ব্যবহার করে পুঁজিপতিরা বিরাট মুনাফা লাভ করে। সেগুলির প্রবর্তন বেড়ে চলেছে দ্রুতহারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কম্পিউটরটি প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। ১৯৮৪ সালেই পুঁজিবাদী জগতে ব্যবহৃত হয়েছিল সুপারকম্পিউটর, ১ লক্ষ বড় কম্পিউটর, ১০ লক্ষ মিনিকম্পিউটর এবং ২ কোটি ব্যক্তিগত কম্পিউটর। সর্বপ্রথম রোবট ব্যবহৃত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬২ সালে। ১৯৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলির সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ও জাপানে — ৫২ হাজার পর্যন্ত। আধুনিক প্রযুক্তির পিছনে পুঁজিপতিরা ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৮২ সালে, আধুনিক উৎপাদনের উপায় বাবদ মার্কিন কর্পোরেশনগুলি ব্যয় করেছিল ৫৫ শতকোটি ডলার — যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের জন্য তাদের মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক।

প্রযুক্তিগত নবোদ্ভাবনাগুলি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুনাফা লোটার চেষ্টায় পুঁজিপতিরা নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবনাগুলির ব্যবহারিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টাকে ক্রমাগত সংক্ষিপ্ত করে। অতীতে, একটি উদ্ভাবনাকে লাভজনক করার জন্য অন্তত কয়েক ডজন বছর প্রয়োজন হত; আজ পুঁজিপতি উদ্যোগপতিরা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনাগুলি থেকে মুনাফা অর্জন করে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করার অল্প কিছুকাল পরেই। গত শতাব্দীতে, টেলিফোনের ধারণাটার বিকাশ থেকে প্রথম টেলিফোন যন্ত্রটির আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত কেটে

গিয়েছিল ৫৬ বছর। ২০শ শতাব্দীতে টেলিভিশনের প্রবর্তনের আগে গবেষণা ও উন্নয়নকর্মের জন্য দরকার হয়েছিল ১৪ বছর, লেসারের জন্য ৯ বছর, এবং ট্রান্জিসটরের জন্য মাত্র ৫ বছর।

নতুন প্রযুক্তি পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল প্রবর্তন করে বহু পুঁজিবাদী সংস্থা শ্রম ব্যয় অর্ধেক কমিয়েছিল। একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র সংযোজন করে তৈরি করতে এখন দরকার হয় একজন লোক এক ঘণ্টায় যত কাজ করতে পারে সেই হিসাবে ১৮,০০০ ঘণ্টা; আগে, তার জন্য দরকার হত ৯৯,০০০ ঘণ্টা (বা ৫·৫ গুণ বেশি সময়)। অন্য অসংখ্য উদাহরণ থেকে এটাই দেখা যায় যে প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠতার ফলে শ্রম-উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ ঘটে, তা আবার উৎপাদনের মধ্যে উৎপন্ন অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজনের মধ্য দিয়ে আরও বেশি মুনাফার্জন নিশ্চিত করে।

এই শ্রেষ্ঠতাকে পুঁজি শুধু আভ্যন্তরিকভাবেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও ব্যবহার করতে প্রয়াস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিতর্কাতীত নেতা ছিল, কিন্তু আজ অন্য কতকগুলি পুঁজিবাদী দেশ তার নাগাল ধরে ফেলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাপানে সংযোজন করে একটি রঙীন টিভি সেট তৈরি করতে দরকার হয় একজন লোক এক ঘণ্টায় যত কাজ করে সেই হিসাবে মাত্র ১·৯ ঘণ্টা, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরকার হয় ৩·৫-৪·৫ ঘণ্টা। 'ফোর্ড'

মোটরগাড়ি কারখানার দৈনিক উৎপাদ হল কর্মে-নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি-পিছু ২টি মোটরগাড়ি, আর জাপানের 'টয়োটা' কারখানার উৎপাদসংখ্যা হল ৯টি মোটরগাড়ি।

উন্নত দেশগুলির পুঁজিপতিরা যখন উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে কারবার করে তখন প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠতা থেকে বিশেষভাবেই বিরাট মুনাফা লাভ করে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলির চেয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১০০-রও বেশি উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় শিল্প বলতে রয়েছে শুধু অকিঞ্চিৎকর সংখ্যক ছোট ছোট আধা-হস্তশিল্প উদ্যোগ, যেগুলির ভিত্তি হল নিতান্তই সেকেলে ও অচল প্রযুক্তি আর প্রাকৃতিক উপকরণাদি ব্যবহার ও প্রক্রিয়ণের আদিম পদ্ধতি। উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করে কাঁচামালের নিষ্কাশনের উপরে, প্রক্রিয়ণের উপরে নয়। তাই, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিষ্কাশিত আকরিক ধাতুর মাত্র ৩০ শতাংশকে প্রক্রিয়ণ করে ধাতুতে পরিণত করা হয়। পৃথিবীর ধাতু দিয়ে তৈরি পণ্যসামগ্রীর মাত্র ৪·১ শতাংশ উৎপন্ন হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। গবেষণা ও উন্নয়নকর্মেও তারা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তাদের মাথা-পিছু ব্যয়বরাদ্দ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় প্রায় ১৪০ গুণ কম।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচেয়ে পরগাছাসুলভ ক্ষেত্র, সামরিক উৎপাদনে প্রযুক্তিগত নবোদ্ভাবনা ও

বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলিকে প্রয়োগ করে পুঁজিপতিরা বিরাট বাড়তি মুনাফা পায়। জাতীয় অর্থনীতিগুলি ক্রমেই আরও বেশি সামরিকীকৃত হয়ে উঠতে থাকায়, সামরিক শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হতে থাকায় ঠিক সেখানেই গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা বাজেটের বৃহত্তম অংশটিকে গ্রাস করা হয়। বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশলগত ও সামাজিক প্রগতির প্রকৃত স্বার্থের হানি ঘটিয়ে তা সমর-শিল্পপতিদের এনে দেয় আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য। এক নতুন বিশ্বযুদ্ধের অধিবক্তাদের জন্য আরও বেশি মুনাফা আদায় করার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক সহায়-সম্পদকে এইভাবে ভিন্নপথে চালিত করার পরিসরের উদাহরণস্বরূপ: আজ সব মিলিয়ে ৫,০০,০০০ লোক, কিংবা পৃথিবীর বিজ্ঞানকর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নিযুক্ত রয়েছে সামরিক গবেষণা ও উন্নয়নকর্মে।

যদিও অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য বস্তুতই কৃৎকৌশলগত প্রগতিকে উদ্দীপনা যোগায়, তবুও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের উপরে তার অভিঘাতের আরেকটি দিক আছে। একজন পুঁজিপতি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। তারা যদি সমান স্তরে থাকে, তবে কোনো অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য জুটবে না। সুতরাং যে পুঁজিপতি একটা উদ্ভাবনা প্রবর্তন করেছে, অন্যদের কাছ থেকে সেটা গোপন করে রাখা তার মৌল স্বার্থের ব্যাপার। সেই উদ্ভাবনাটি প্রতিযোগীরা যাতে গ্রহণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই

উদ্ভাবনা থেকে মুনাফা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য সে একটা পেটেণ্ট নেয়, এবং তার সঙ্গে অর্জন করে উদ্ভাবনাটির ব্যবহার আটকে রাখার অধিকার। ইতিমধ্যে, পুঁজিপতি তার প্রতিযোগীদের কৃৎকৌশলগত গবেষণা সীমিত করার এবং নবোদ্ভাবনাগুলির প্রবর্তন ও প্রযুক্তিগত তথ্যাদির প্রসার দমন করার ব্যবস্থাও অবলম্বন করে, এইভাবে সাধারণভাবে কৃৎকৌশলগত প্রগতিকে সে বিঘ্নিত করে। কখনও কখনও এই ধরনের কার্যকলাপের পরিণতি হয় আরও গভীর, যেমন বলা যায় সেই সমস্ত জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির কথা যারা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগগুলির ওষুধের অত্যাবশ্যক ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে হস্তান্তরণ সীমিত করে। এই কর্পোরেশনগুলি সেই সব দেশের ওষুধগুলির বাজারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিপুল মুনাফা লোটে। এই ধরনের কার্যকলাপ ঔষধ শিল্পের বিকাশকে শুধু যে বিঘ্নিত করে তাই নয়, কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতিও ঘটায়।

মজুরি আর পুঁজিবাদী শোষণ

শোষণ বাড়াতে ব্যগ্র পুঁজিপতি সমস্ত সীমা ভাঙতে প্রস্তুত। এই স্বার্থান্বেষী লক্ষ্য নিয়ে সে শ্রমিকদের উপরে আর্থনীতিক চাপের লভ্য সমস্ত উপায়ই ব্যবহার করে। সে তার লক্ষ্যার্জনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর যেসব কৌশল ব্যবহার করে তার একটি হল মজুরি।

মজুরি হল শ্রমশক্তির দামের বা মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ। শ্রমিক তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে যা পায় এবং নিজের ও তার পরিবারের জন্য পণ্যসামগ্রী কেনার পিছনে যা খরচ করে, মজুরি হল তাই। শ্রমিকের মজুরির আয়তন তার জীবনযাপনের অবস্থা নির্ধারণ করে এবং তার মূল চাহিদাগুলি কতখানি পূরণ হয় তাও নির্ধারণ করে। শ্রমিক ও তার পরিবার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মজুরির উপরে।

শ্রমিকের জীবনে মজুরি যে প্রকাণ্ড ভূমিকা পালন করে, পুঁজিপতি সে বিষয়ে ভালোভাবেই অবহিত। মজুরি প্রদানের বন্দোবস্তটা এমনভাবে করা হয় যাতে পুঁজিপতির জন্য ভাড়াটে শ্রমিকের কাজকে উদ্দীপনা যোগানো যায়, তাকে দিয়ে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করানো যায়। পুঁজিবাদী সমাজে ক্রিয়াশীল মজুরি প্রদানের সমস্ত ব্যবস্থা ও রূপ ঠিক এই উদ্দেশ্যটিই সাধন করে।

সময় হিসাবে মজুরি হল মজুরির গোড়ার দিককার ও সরলতর রূপগুলির অন্যতম; শ্রমিককে পয়সা দেওয়া হয় কাজের পিছনে যে সময়টা সে ব্যয় করেছে তদনুযায়ী (যেমন, সে এক দিনের কাজের জন্য যা পায়, তার দ্বিগুণ পায় দুই দিনের কাজের জন্য, ইত্যাদি)।

পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য প্রদান করে একমাত্র তখনই, যদি সে একটি পূর্ণ কর্ম-দিবস কাজ করে। যদি ধরে নিই যে তার শ্রমশক্তির মূল্য ২ ডলার এবং কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য ৮ ঘণ্টা, তা

হলে শ্রমিকটি প্রতি ঘণ্টায় ২৫ সেণ্ট উপার্জন করে। পুঁজিপতিটির উদ্যোগে ৮ ঘণ্টার পূর্ণ কর্ম-দিবস কাজ করার পরেই শুধু সে তার ২ ডলার পাবে। তদনুযায়ী, ৭ ঘণ্টার কাজের জন্য তাকে দেওয়া হবে ১·৭৫ ডলার। সেটা এক দিনে ব্যয়িত তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্যের চেয়ে কম হবে বলে শ্রমিকটির দৈনিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট হবে না। তাই সময়ভিত্তিক ব্যবস্থায় মজুরি শ্রমিককে একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগে একটি পূর্ণ কর্ম-দিবস কাজ করতে হয়।

সময় হিসাবে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থায় পুঁজিপতির পক্ষে আরও বেশি সুযোগের ফাঁক থাকে, পুঁজিপতি ঘণ্টা-প্রতি পারিশ্রমিকের হার কমাতে পারে। তার মানে এই যে শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য পেতে হলে আরও বেশি ঘণ্টা কাজ করতে হবে। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, ঘণ্টা-প্রতি পারিশ্রমিকের হারে ৫ সেণ্ট হ্রাস ঘটালে (২৫ সেণ্ট থেকে ২০ সেণ্ট) শ্রমিক ৮ ঘণ্টার বদলে ১০ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হবে। তার মানে হল শ্রমিকের জন্য একটা দীর্ঘতর কর্ম-দিবস, এবং পুঁজিপতির জন্য আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

পুঁজিবাদের আদি পর্যায়ে সময় হিসাবে মজুরি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত; বহু শিল্পে এখনও তা মজুরির মূল রূপ। পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সে শিল্প শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে (৮০ শতাংশ) মজুরি দেওয়া হয় সময় ভিত্তিতে, প্রসেসিং শিল্পগুলিতে মার্কিন শ্রমিকদের ৭০ শতাংশকে এবং সমস্ত ব্রিটিশ

শিল্প শ্রমিকের ৬০ শতাংশকেও মজুরি দেওয়া হয় সেই ভিত্তিতে।

পারিশ্রমিক দানের আরেকটি মূল প্রথা হল **ফুরন মজুরি**, যেখানে পারিশ্রমিক উৎপাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধরে নেওয়া যাক যে একজন শ্রমিক, যার শ্রমশক্তির মূল্য হল প্রতি কর্ম-দিবস ২ ডলার, সে প্রত্যহ উৎপাদের ৫টি একক উৎপন্ন করে। উৎপাদের একক-পিছু দাম তা হলে হবে ৪০ সেণ্ট (২ ডলার : ৫=৪০ সেণ্ট)। এই ক্ষেত্রে, শ্রমিকটির দৈনিক মজুরি হবে ২ ডলার (৪০ সেণ্ট×৫=২ ডলার)। ভাষান্তরে, উৎপাদে বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে। পুঁজিপতির দিক দিয়ে দেখলে, ফুরন মজুরি খুবই মুনাফাদায়ক। এক-একটি গোটা কাজের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পায় বলে শ্রমিক বাধ্য হয় প্রত্যেক ঘণ্টায় আরও বেশি উৎপাদ তৈরি করতে, অর্থাৎ তার শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়াতে। ফলে, পুঁজিপতি উপযোজন করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

কার্যক্ষেত্রে, পুঁজিপতিরা সময় হিসাবে মজুরি আর ফুরন মজুরির রূপগুলির কোনো কোনো উপাদানকে একসঙ্গে মেলায়। শ্রমিকদের দেওয়া হয় এক ধরনের প্রণোদনামূলক মজুরি, যার ভিত্তি হল পার্থক্যমূলক সময়ানুযায়ী হার, যেখানে ঘণ্টা-প্রতি পারিশ্রমিকের হার নির্ভর করে উৎপাদের হারগুলি কতখানি সম্পূর্ণ করা হয়েছে, তার উপরে। শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি শ্রম করানোর জন্য, পুঁজিপতি সময়ানুযায়ী হারের ভিত্তিতে ও ফুরন-হারের ভিত্তিতে নানা ধরনের বোনাস

দেয়; আরও বেশি সূক্ষ্ম মজুরির ছকও আছে। কিন্তু, রূপটা যাই হোক না কেন, পরিজ্ঞাত সমস্ত পারিশ্রমিক ব্যবস্থাই রচিত হয়েছে একটি লক্ষ্যই সামনে রেখে — শ্রমিককে দিয়ে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করানো।

পুঁজিবাদে মজুরি হল একাধারে শোষণ নিবিড় করার উপায় এবং তা গোপন করার উপায়। মজুরির রূপে প্রদত্ত পারিশ্রমিক এই ঘটনাটাকে গোপন করে যে শ্রমিক কর্ম-দিবসের একটি অংশে কাজ করে পুঁজিপতির জন্য, কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই; সেই অংশটিতে সে উৎপন্ন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য। মজুরি প্রদানব্যবস্থা কর্ম-দিবসের আবশ্যকীয় ও উদ্বৃত্ত সময়ে বিভাজনটাকে কিংবা স-পারিশ্রমিক ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমে বিভাজনটাকে দেখতে দেয় না।

এটা হয় দুইটি বিষয়ের দরুন। প্রথম, মজুরি সর্বদাই দেওয়া হয় শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার পরে। দ্বিতীয়, মজুরি দেওয়া হয় কাজ-করা সময় অনুযায়ী, অথবা উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণ অনুযায়ী, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয় যেন শ্রমিকের সমস্ত কাজেরই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, শ্রমিককে তার শ্রমের জন্য পুঁজিপতি যেন পুরোপুরি পারিশ্রমিক দেয়।

শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে পারিশ্রমিক দান

প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিপতি শ্রমিককে তার সম্পন্ন করা শ্রমের জন্য মূল্য-পরিশোধ করে না, তার শ্রমশক্তির

মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেয় শুধু। এমন কি শ্রমিক যদি পূর্ণ মজুরি পায়, তা হলেও সে কর্ম-দিবসের একটা বিশেষ অংশ কাজ করে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই, পুঁজিপতিদের জন্য সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য। তবুও পুঁজিপতি সন্তুষ্ট হয় না; শুধু উদ্বৃত্ত সময় থেকেই নয়, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় থেকেও মুনাফা লাভ করতে পারলে সে খুশি হত।

ঘটনা এই যে পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য দেয় না, দেয় শুধু তার একটি অংশের মূল্য। সে সেটা করতে পারে এমন মজুরি স্থির করে, যেটা শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে কম। ফলে, এই হ্রস্বীকৃত অঙ্কের সমান মূল্য উৎপন্ন করতে শ্রমিকের অনেক কম সময় লাগে। এইভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় তদনুযায়ী বেড়ে যায়, এবং শ্রমিক উৎপন্ন করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

কিন্তু শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তিকে মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে রাজী হয় কেন? কেননা, এ ব্যাপারে তার অন্য কোনো উপায় নেই। নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয়ই শ্রমিকের পক্ষে তার নিজের ও পরিবারের অস্তিত্বরক্ষার উপায় উপার্জন করার একমাত্র পথ। সে বিক্রয়টা স্থগিত রাখতে পারে না, অনুকূলতর একটা শ্রম-বাজারের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। নিজেকে ও তার পরিবারকে যদি সে ভরণপোষণ করতে চায়, তা হলে পুঁজিপতি তাকে যে শর্তই দিক না কেন তা মেনে নিতেই হবে, অথবা তার আয়ের একমাত্র উৎসটি হারাতে হবে।

শ্রম-বাজারে শ্রমিক আর পুঁজিপতির অবস্থানের পার্থক্যও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিপতির সামনে শ্রমের যোগানের অভাব কখনোই ঘটে না, লক্ষ লক্ষ বেকার তা যোগান দেয়। যারা কর্মহীন তারা যে কোনো শর্ত মেনে নিতে ব্যগ্র, তাই পুঁজিপতি এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে, মজুরির নিচু হার স্থির করে। মজুরির এই হার যারা মেনে নিতে চায় না তারা তাদের কাজ হারায়, শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের পক্ষে তা বাস্তবিকই একটা বিপর্যয়স্বরূপ হয়ে ওঠে। তাই, নতুন নতুন বঞ্চনা, শ্রমশক্তির মূল্যের আরও বেশি নিচে আরও কম মজুরি মেনে নিতে শ্রমিকরা বাধ্য হয়।

মজুরির বৈষম্যের মধ্য দিয়েও পুঁজিপতি একই ফল পায়; এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি আঘাত পড়ে নৃজাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক একই পরিমাণ কাজের জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের মজুরির অর্ধেক মজুরি পায়। কৃষ্ণাঙ্গ, পুয়ের্তো রিকান ও অন্যান্য নৃজাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মজুরির বৈষম্য থেকে মার্কিন শিল্পপতিরা বছরে গড়ে ৪৬ শতকোটি ডলার মুনাফা লোটে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে, স্থানীয় জনসমষ্টির গড় মজুরি শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের গড় মজুরির চেয়ে দশগুণ কম।

পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে নারী ও শিশু শ্রম

নারী ও শিশু শ্রম শোষণ করে পুঁজিপতিরা বিপুল উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে।

পুঁজিবাদের গোড়ার দশকগুলিতে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে সমস্ত শ্রমিকই ছিল পুরুষ। শ্রমসাধ্য কায়িক প্রচেষ্টা যার সঙ্গে জড়িত এমন সব পুঁজিবাদী কর্মশালায় ও ম্যানুফ্যাকচারে কায়িক শ্রম নারীদের সাধ্যাতীত ছিল। তাই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্যে তার পরিবারের জীবিকানির্বাহের উপায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন এমন সব নতুন পেশা সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য অধিক কায়িক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হত না। এটাই নারী ও শিশুদের নিয়ে গিয়েছিল পুঁজিবাদী উদ্যোগে মজুরি-প্রত্যাশী শ্রম-বাহিনীর মধ্যে। তারা ছিল সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় অদক্ষ কম-মজুরি-পাওয়া শ্রমের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ।

নারী ও শিশু শ্রম ব্যবহার করে পুঁজিপতি শোষণের ক্ষেত্রটি অনেকখানি বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন সে শুধু পুরুষ শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যই নয়, তার পরিবারের সদস্যদের, তার স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যও উপযোজন করতে সক্ষম হল। গোটা ১৯শ শতাব্দী ধরে পুঁজিপতির কাছে এটা ছিল উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক ক্রমবর্ধমান লাভজনক উৎস। ফলত, ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র শিল্পে পুরুষ শ্রমিকরা ছিল সমগ্র শ্রম-বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ, তার বেশি নয়; বাকিটা ছিল নারী ও শিশুরা।

২০শ শতাব্দী মজুরি-সন্ধানী শ্রম-বাহিনীর মধ্যে আরও বেশি নারীকে নিয়ে এসেছে। নারী শ্রমিকরা

বস্তুতপক্ষে অধিকতর মনোনয়নযোগ্য হয়ে উঠেছে কতকগুলি শিল্পে, যথা যে সমস্ত শিল্পে দরকার হয় দ্রুততা ও কর্মনিপুণতা, যেমন রেডিও ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্য অনেক শিল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে নারীরা হল মজুরি ও বেতন উপার্জনকারীদের প্রায় ৪০ শতাংশ।

আজও পুঁজিবাদী উৎপাদনে জড়িত রয়েছে বিরাট সংখ্যক শিশু। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইতালিতে শিশু শ্রম-বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষের বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলির সূচকের তুলনায় এটা একটা ভগ্নাংশ মাত্র, সেখানে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের কমপক্ষে ১৪ শতাংশকে পারিশ্রমিকের জন্য অবশ্যই কাজ করতে হয় যাতে নিজেদের ও অংশত তাদের পরিবারের অন্নসংস্থান করা যায়। অর্থাৎ, ৫ কোটি ১০ লক্ষ বালক-বালিকা নিযুক্ত রয়েছে উৎপাদনকর্মে, এবং তাও আবার কঠোরতম ও সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক-পাওয়া কাজে।

নারী ও শিশু শ্রম শোষণ পুঁজিবাদী শোষণের একটা সরল বিস্তৃতির চেয়েও বেশি কিছু। এর নিহিতার্থ হল শোষণের উচ্চতর মাত্রা, এবং তদনুযায়ী, উদ্বৃত্ত-মূল্যের উচ্চতর হার। স্ত্রী ও সন্তানরা মজুরি উপার্জন করে বলে তাদের ভরণপোষণের ব্যয়টা পুরুষ শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য থেকে অপসারিত হয়। আগে শ্রমিকটি একমাত্র জীবিকার্জনকারী হিসেবে যা উপার্জন করত, এখন গোটা পরিবারকে কাজ করতে হয় সেটা উপার্জন

করার জন্য। ফলত, তার শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস পায়, আর উদ্বৃত্ত-মূল্য তদনুযায়ী বাড়ে।

এই ব্যাপারটির আরও একটি দিক আছে। শ্রমিকের স্ত্রী ও সন্তানরা শ্রমের বাজারে তার প্রতিযোগীদের পংক্তিতে যোগ দিয়েছে: তারাও তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে চায়। শ্রম-বাহিনীর অধিকতর যোগানের ফলে পুঁজিপতি ভাড়া করার আরও নিম্নতর শর্ত দেওয়ার সুযোগ পায়, উন্মুক্ত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়ার নতুন নতুন সম্ভাবনা।

নারী ও শিশুদের উপরে শোষণ পুঁজিপতির কাছে বেশ বড় বৈষয়িক লাভের প্রতিশ্রুতিবাহী। সে তাদের দেয় মজুরির নিম্নতম হার। মজুরির বৈষম্য এখানে অত্যন্ত বিরাট; দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একই ধরনের কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকরা যে মজুরি পায়, নারীরা পায় সেই মজুরির গড়ে মাত্র ৫৯ শতাংশ, কেউ কেউ পায় আরও কম — পুরুষদের যে মজুরি দেওয়া হয় তার অর্ধেক; নারী শ্রম-বাহিনীর ৭৬ শতাংশ নিযুক্ত রয়েছে সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক-পাওয়া কাজে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও নারী শ্রমিকদের অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভালো নয়। অস্ট্রিয়ায় শিল্পে নিযুক্ত নারীদের তিন-চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক পায় পুরুষ শ্রমিকদের সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক-পাওয়া অংশগুলির চেয়েও কম। জাপানী নারীদের উপার্জিত মজুরি হল একই কাজে পুরুষরা যা উপার্জন করে তার মাত্র ৫৬ শতাংশ। পৃথিবীব্যাপী স্তরে পরিস্থিতিটা আরও খারাপ। নারীরা হল পৃথিবীর শ্রম-বাহিনীর ৩৫

শতাংশ, অথচ তাদের সম্মিলিত উপার্জনের পরিমাণ হল মোট উপার্জনের মাত্র এক-দশমাংশ। নারী শ্রমিকদের উপরে সেই অতি শোষণের ফল হল পুঁজিপতিদের জন্য সুবিশাল অতিরিক্ত মুনাফা: শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬৩ শতকোটি ডলার, পশ্চিম জার্মানিতে ১০ শতকোটি মার্ক, গ্রেট ব্রিটেনে ১·২ শতকোটি পাউন্ড স্টার্লিং, আর ফ্রান্সে ৩৫ শতকোটি ফ্রাঁ।

বিদেশী শ্রমিকদের শ্রম শোষণ

একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগে নিযুক্ত শ্রম-বাহিনীর দাম কমানোর আরেকটি উপায় হল সেই সমস্ত দেশ থেকে শ্রমিকদের আহরণ করা যেখানে সস্তা শ্রমশক্তির যোগান বৃহত্তর। এই শ্রমশক্তির দাম সবচেয়ে কম। তাদের মোট শ্রম-সময়ে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের অংশটাও তাই ন্যূনতম। সেই সমস্ত দেশের শ্রমিকরা দীর্ঘ কাজের ঘণ্টা, অত্যন্ত নিবিড় শ্রম ও সরাসরি মজুরির বৈষম্য সমেত যে কোনো শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত। এই কারণে বিদেশী শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় সর্বাধিকভাবে বিস্তৃত করা হয়; পুঁজিপতিকে তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার উভয়েরই মাধ্যমে প্রভূত ও চির-সম্প্রসারণশীল মুনাফা এনে দেয়।

পুঁজি তার মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ কখনও হারায় না। সস্তা বিদেশী শ্রমশক্তি সংগ্রহ করাটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বহুলপ্রচলিত। ৫০০-র বেশি

শ্রমিক-যোগানদার কাজ করে পাকিস্তানে; ফিলিপাইনে প্রায় ৬০০; ভারতে প্রায় ৫০টি এজেন্সির সরকারি লাইসেন্স আছে বিদেশে কাজ করার জন্য শ্রমিক-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। শ্রমিক-যোগানদার বহু এজেন্সি আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'মালটিন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট গ্রুপ'-এর কেন্দ্রীয় অফিস রয়েছে ঢাকায় (বাঙলাদেশ) এবং একটি শাখা অফিস রয়েছে জিদ্দায় (সৌদি আরব); সেটি তার বহুবিস্তার করেছে চোদ্দটি দেশে এবং সেই সব কটি দেশেই সংস্থাটির দালালরা সরকারি লাইসেন্সধারী। সংস্থাটি শুধু এশীয় দেশগুলি থেকেই প্রতি বছর রপ্তানি করে ২০,০০০ শ্রমিক, সস্তা বিদেশী শ্রমশক্তি যোগান দিয়ে বিরাট মুনাফা অর্জন করে: পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা থেকে একজন অদক্ষ শ্রমিকের জন্য সংস্থার প্রাপ্য পুরস্কার হল ১০০ ডলার, এবং ফিলিপাইন থেকে একজন দক্ষ শ্রমিকের জন্য সংস্থাটি নেয় তার চারগুণ বেশি, অর্থাৎ ৪০০ ডলার।

বুর্জোয়া সরকারগুলি ও নিয়োগকর্তাদের সমিতিগুলিও সস্তা বিদেশী শ্রমিক-সংগ্রহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সে সরকার সেই সুদূর ১৯১৬ সালে শ্রমশক্তি সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করত; ১৯২৪ সালে একটি শেয়ারহোল্ডিং নিয়োগকর্তাদের সমিতি গঠিত হয়েছিল যেটি প্রায় একান্তভাবেই বিদেশী শ্রমিক ভাড়া করার ব্যাপারে আধিপত্য করত।

বিদেশী শ্রমিক বাহিনী সংগ্রহ উন্নত পুঁজিবাদী

দেশগুলিতে শোষণকে অনেকখানি সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে, পরিবারের সদস্যবৃন্দ সমেত ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি বিদেশী শ্রমিক উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বাস করে। তাদের বেশির ভাগটাই এসেছে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি থেকে, মেক্সিকো বা পাকিস্তান থেকে। পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলি থেকে আসা অধিবাসীরাও আছে, তাদের উপরে চলে কঠোরতম শোষণ।

বিদেশী শ্রমিকদের পারিশ্রম থেকে নিয়োগকর্তারা প্রচুর মুনাফা পায়, কেননা বিদেশী শ্রমিকদের জন্য তারা ধার্য করে কৃপণের মতো মজুরি — স্থানীয় শ্রমিকদের যা দেওয়া হয় তার চেয়ে গড়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কম। আমদানি হওয়ার অব্যবহিত পরে, যখন শ্রমিকরা আতিথ্যকর্তা দেশটির ভাষা ভালোভাবে জানে না, শ্রম আইনের সঙ্গে পরিচিত নয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে তখনও সম্পর্ক স্থাপন করে নি, তখন শোষণটা হয় বিশেষভাবেই কঠোর; সেই পর্যায়ে তারা ভাড়ার নিকৃষ্টতম শর্তগুলি মেনে নেয়। যারা দেশের মধ্যে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়েছে, অর্থাৎ 'চোরাপথে' যাদের আনা হয়েছে তাদের বেলাতেও এ কথা সত্য। আবার স্বদেশে বিতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে এই শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার পুরোপুরি বশংবদ হয়, তাই তাদের করতে হয় পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বৃহত্তম অংশটা।

পুঁজিবাদের যত বিকাশ ঘটে, শোষণ তত বেশি বিচিত্র ও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। শোষণের বিদ্যমান স্তরে পুঁজিপতি কখনও সন্তুষ্ট হয় না; সর্বোচ্চ মাত্রায় পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্যার্জনের নতুন নতুন পদ্ধতি সে বার করতে চেষ্টা করে।

শোষণের নতুন নতুন পদ্ধতির সন্ধানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হল **টেলরতন্ত্র**; মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর-এর নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে; ২০শ শতাব্দীর গোড়ায় ইনি শ্রম সংগঠিত করার এক নতুন পদ্ধতি উপস্থাপন করেছিলেন।

টেলরতন্ত্রের ভিত্তি হল সর্বোচ্চ বিন্দু পর্যন্ত বিকশিত শ্রম বিভাজন, যার দ্বারা উৎপাদন-প্রক্রিয়া ভেঙে ছোট ছোট ক্রিয়ায় ভাগ করা হয়। প্রতিটি পৃথক কাজের ভার দেওয়া হত শ্রমিকদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উপরে — সবচেয়ে দক্ষ ও কর্মনিপুণ — যাদের সেই কাজটি করার সবচেয়ে ব্যয়-সাশ্রয়মূলক ও দক্ষ উপায় শেখানো হত। প্রতিটি ক্রিয়ার সময় পরিমাপ করা হত সর্বাধিক যথাযথতায়, মিনিটে, সেকেন্ডে, এমন কি এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশেও। অর্জিত শ্রেষ্ঠ ফলাফলকে তার পর উৎপাদনে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের পক্ষেই মান হিসেবে নির্ধারণ করা হত। নতুন মানটিকে কিছুটা হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত যে তা সম্পন্ন করতে পারলে মজুরি বাড়ানো হবে।

বুর্জোয়া প্রচার কালবিলম্ব না করে টেলরতন্ত্র কাজ

সংগঠিত করার এক বিজ্ঞানসম্মত প্রথা বলে ঘোষণা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও উৎপাদনী উদ্যোগগুলিতে টেলর প্রথা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। টেলরতন্ত্রের গুণগান করে আত্মপ্রকাশ করেছিল অনেক প্রকাশনা, তাতে দাবি করা হয়েছিল যে শ্রমিকের স্বার্থের কথা এতে গণ্য করা হয়েছে এবং উৎপাদনে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আসলে, টেলরতন্ত্র ছিল শোষণ বাড়িয়ে তোলার একটি নতুন পদ্ধতি মাত্র, একটি 'বিজ্ঞানসম্মত' স্বেদ-নিষ্কর্ষণ প্রণালী।

টেলর প্রণালী শ্রম-নিবিড়তাকে সর্বাধিক মাত্রায় তোলে। শ্রমিকদের তা বাধ্য করে আরও বেশি শ্রম নিয়োগ করতে এবং প্রত্যহ আরও বেশি কায়িক ও মানসিক শ্রম করতে। শ্রমশক্তি ব্যয়ে যে বৃদ্ধি ঘটে, সামান্য মজুরি বৃদ্ধির দ্বারা তা পুরোপুরি পূরণ হয় না। টেলরের মতানুযায়ী, শ্রমনিয়োগে (পিণ্ড লোহা বোঝাই করা) ৩·৭ গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে কারখানা-মালিকের খরচ কমিয়েছিল প্রতি টনে ২·৩ গুণ, অথচ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেড়েছিল মাত্র ১·৬ গুণ। এই দৃষ্টান্তটি প্রমাণ করে যে, সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় পুঁজিপতিই — শোষণ আরও বাড়িয়ে সে অর্জন করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

ফোর্ডতন্ত্র

মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ডের মালিকানাধীন মোটর কারখানা শোষণ নিবিড় করার জন্য টেলর

প্রণালী প্রয়োগ ও বিকশিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত যোগায়। একটি মোটরগাড়ি তৈরির প্রক্রিয়াকে ভেঙে ছোট ছোট ক্রিয়ায় ভাগ করা হয়েছিল, প্রতিটি ক্রিয়া সম্পন্ন করত পৃথক এক-একজন শ্রমিক। এই সমস্ত ক্রিয়া কঠোরভাবে বিন্যস্ত ছিল একটিমাত্র উৎপাদন লাইনে।

ফোর্ড তার পর আরও এগিয়ে যান। প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়ণ ও সংযোজন ক্রিয়াকে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন কনভেয়রের সঙ্গে। তাঁর শ্রমিকরা তাদের কাজগুলি আগেকার মতো যন্ত্রের উপরে বা স্ট্যান্ডগুলির উপরে সম্পন্ন করত না, করত একটা চলমান কনভেয়রে। কনভেয়রে কাজ করার সময়ে শ্রমিকরা বাধ্য হত শ্রমের একটা নির্দিষ্ট গতিহার বজায় রাখতে, যে গতিহার চলমান কনভেয়র স্থির করে দিত; গতিহার কেউ কমাতে পারত না কিংবা কোনো ক্রিয়া বাদ দিতে পারত না। যদিও মালিক কনভেয়রের দ্রুতি সহজেই বাড়িয়ে দিতে পারতেন, সেই দ্রুতি হিসাব করা হয়েছিল 'ধাবন-বেগের মান নির্ধারকদেরই' দেখানো ফলাফল অনুযায়ী, যারা সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমনিয়োগ করেছিল তাদেরই দেখানো ফলাফল অনুযায়ী। সমস্ত কনভেয়র বরাবর, প্রত্যেক পঞ্চম থেকে দশম শ্রমিক ছিল 'ধাবন-বেগের মান নির্ধারক', তারা কাজ করত আরও বেশি পারিশ্রমিক আর পদোন্নতির সম্ভাবনার জন্য।

দ্রুতগতিতে চলমান কনভেয়র শ্রমিকদের কায়িক ও স্নায়বিক চাপ বাড়িয়ে তুলত সর্বাধিক মাত্রায়। যারা

এর প্রতিরোধ করত, রক্ষীরা আর তত্ত্বাবধানকারীরা তাদের প্রশমিত করত লাঠি, ধাতুনির্মিত গাঁট, সীসার নল বা চাবুক দিয়ে পিটিয়ে এবং পঙ্গু করে। ফোর্ড যে মুনাফা লুটতেন তা বিবর্ধিত করার জন্য শ্রমিকরা বাধ্য হত আত্মসমর্পণ করতে এবং আরও বেশি কর্মশক্তি নিয়োগ করতে।

শ্রমিকদের উপরে বিপুলভাবে বাড়ানো শোষণের মধ্য দিয়ে ফোর্ড খুব তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে উঠেছিলেন, শেষ পর্যন্ত হয়েছিলেন সবচেয়ে পরাক্রমশালী মার্কিন কোটিপতিদের অন্যতম। ফোর্ড মোটর কোম্পানি (১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) তার অস্তিত্বের প্রথম দশ বছরেই তার উৎপাদ বছরে ২,৬৫,০০০ মোটরগাড়িতে এনে দাঁড় করিয়েছিল। পরবর্তী দশ বছরে এই অংকটা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। ১৯২৩ সালে ফোর্ড মোটরগাড়ির উৎপাদ গিয়ে পেঁছেছিল ২২,০০,০০০-এ, অন্যান্য শিল্পপতির সামনে তা এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে কনভেয়র ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল ব্যাপকভাবে।

এখনও, অন্য বহু পুঁজিপতি কনভেয়র প্রণালী গ্রহণ করার পরেও, ফোর্ড পরিবার শ্রমিক-শোষণের জন্য তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে। যখন এর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল তখনকার মতো এখনও পৃথিবীর দীর্ঘতম কনভেয়র হল প্রধান ফোর্ড কারখানা-স্থিত কনভেয়র। এটি ৩,৩০০ মিটার দীর্ঘ; প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এর উপরে কাজ করে ৮,০০০ শ্রমিক,

বা প্রত্যেক ৮ ঘণ্টার শিফ্‌টে ২,৫০০-র বেশি শ্রমিক; তার মানে এই যে প্রত্যেক মিনিটে সম্পন্ন হয় ৮,০০০-এর বেশি ক্রিয়া। সেগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির ক্রিয়া, নিছক এক প্রস্ত যান্ত্রিক সঞ্চালন। কাজের গতিহার যে খুব উঁচু শুধু তাই নয়; শ্রমিকদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে মালিকের কোনোই ভাবনা নেই: কাউকে মেঝেতে শুয়ে নাট আঁটো করতে হয়, অন্যরা কনভেয়ের বরাবর হামাগুড়ি দিয়ে একটা দরজা ঠিকমতো লাগায়, অথবা গাড়ির ভিতরে কুঁজো হয়ে বসে কলকব্‌জা লাগায়। সমগ্র কনভেয়র বরাবর আছে শুধু দুটি বিশ্রামের জায়গা, প্রত্যেকটি আছে ৮টি ধাতব টুল, দুটি প্লাস্টিকের টেবিল আর দুটি বিক্রয়-যন্ত্র — তার একটিতে হাল্‌কা পানীয় ও অন্যটিতে কফি আর চা।

কনভেয়র ব্যবস্থাযুক্ত উৎপাদন মুনাফায় তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে, ফোর্ড মোটর কোম্পানি তার ২ লক্ষ শ্রমিকের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতি ঘণ্টায় নীট মুনাফা করেছিল ১·৫ ডলার। বর্তমানে, ফোর্ড মোটরগাড়ি কারখানাগুলিতে নিযুক্ত আছে মোট ৪ লক্ষের বেশি শ্রমিক, তারা বিপুল মুনাফা এনে দেয়।

দক্ষ শ্রমের সম্প্রসারিত শোষণ

শোষণের অন্য সব রূপের মতো কনভেয়র ব্যবস্থাটায়ও অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকদের শোষণ করে

পুঁজিপতিরা সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে। তা অতীতে যা ছিল বর্তমানেও তাই আছে, ভবিষ্যতেও সেই রকমই থাকবে। কিন্তু, আধুনিক পুঁজিবাদ আরও এগিয়ে যায়।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব কৃৎকৌশলগত ও প্রযুক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক বিরাট ত্বরায়ণ ঘটিয়েছে। পুঁজিপতিদের সামনে তা উন্মুক্ত করে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলার, এবং ফলত, উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর নতুন নতুন সুযোগ। এই সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মিবৃন্দ — বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ শ্রমিক।

নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পুঁজিবাদ দক্ষ শ্রমের শোষণ দ্রুত সম্প্রসারিত করে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মোট শ্রম-বাহিনীতে দক্ষ শ্রমিকদের ভাগটা ১৯৪০ সালের ২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ সালে হয়েছে ৩৮·৫ শতাংশ, কিংবা ১·৪ গুণ বেড়েছে। কর্মীদের প্রশিক্ষণের গড় মেয়াদ বেড়েছে যথাক্রমে ৮·৬ থেকে ১২·৫ বছর। এই একই কালপর্বে, ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা ২,৯৭,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২,০০,০০০, কিংবা ৪ গুণের বেশি। একই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম জার্মানিতে মোট শ্রম-বাহিনীতে দক্ষ শ্রমিকদের ভাগটা ১৯৬০

সালের ৪০·৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭৫ সালে হয়েছিল ৪৫ শতাংশ।

দক্ষ শ্রমিকদের শোষণ অত্যন্ত মুনাফাদায়ক। দক্ষ শ্রম হল জটিল শ্রম, সরল অদক্ষ শ্রমের তুলনায় তা প্রতি সময়-এককে বেশি মূল্য উৎপন্ন করে। ফলত, তা উৎপন্ন করে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য। দক্ষ শ্রমিকদের শোষণ সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সর্বমোট পরিমাণের উৎপাদনে জটিল শ্রমের অংশও বেড়ে যায়। বর্তমানে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা উপযোজিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের ৮০ থেকে ৮৩ শতাংশই উৎপন্ন করে দক্ষ শ্রম। উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে অংশগ্রাহী উৎপাদন-কর্মীদের গণ্ডী প্রসারিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ার, কৃৎকুশলী, পরিকল্পক, ডিজাইনার, প্রোগ্রামার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মীদেরও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দক্ষ শ্রম ও শ্রমিকদের সাধারণ প্রশিক্ষণের অংশের দিক দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে: ২৫ কোটি শিশু স্কুলশিক্ষা পায় না; প্রাপ্তবয়স্ক জনসমষ্টির ৪৮ শতাংশ নিরক্ষর; ২৩টি সবচেয়ে কম উন্নত দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের বেশি। জনসমষ্টির প্রতি ১০,০০০ জনে ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মীদের সংখ্যা উন্নত দেশগুলির চেয়ে ১৮ গুণ কম।

এই ব্যবধান দূর করার জন্য উন্নত পুঁজিবাদী

দেশগুলি কিছুই করছে না। বরং সদ্যমুক্ত দেশগুলি থেকে 'মস্তিষ্ক নির্গমনে' তারা উৎসাহ যোগায়। প্রত্যেক বছর, তৃতীয় বিশ্ব থেকে ১৩,০০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হয় (গত ১৫ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে ৩ গুণ)। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে দেশান্তরী হয়েছে ৩ লক্ষের বেশি ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক ও আইনজীবী। বর্তমানে সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সদ্যমুক্ত দেশগুলি থেকে আগত প্রায় ৫ লক্ষ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসক কাজ করে, অর্থাৎ তাদের মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশের কাছাকাছি।

শোষণের নতুন নতুন রূপ

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব-সৃষ্ট নতুন অবস্থায় পুঁজিপতিরা শ্রম শোষণ করার নতুন নতুন ব্যবস্থা বার করে। তারা চেষ্টা করে, এক দিকে, শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রম বাড়ানোর সুযোগগুলি সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে, এবং অন্য দিকে, শোষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রা যথাসম্ভব গোপন করে রাখতে, যাতে শ্রমিকদের আর মালিকদের স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব সৃষ্টি করা যায়।

কোনো কোনো উদ্যোগ একটা প্রণোদনাদায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যা মুনাফায় অংশীদারি বলে পরিচিত। তা শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত করে তাদের শ্রম-নিবিড়তা বাড়াতে। এই উদ্যোগগুলি তাদের শ্রমিকদের

কিছু শেয়ার কিনতে দেয়, যেন একটা মালিক-কর্মচারি 'অংশীদারিত্ব' প্রতিষ্ঠা করে এবং সংস্থার কল্যাণে শ্রমিকদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। শ্রমিকদের এমন কি এটাও বিশ্বাস করানো হয় যে উদ্যোগটির ব্যবস্থাপনায় তারা অংশগ্রহণ করে। তাদের মজুরির সম্পূরক অর্থ দেওয়া হয় বোনাস, উপহার, ইত্যাদির রূপে, এটা দেখানোর জন্য যে মালিকরা শ্রমিকদের বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যত্নবান। শ্রম-নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য প্রয়োগ করা হয় সব ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও ভাবাদর্শগত উপায়, যেগুলির আসল উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের আরও কঠোর শোষণের অধীনে এনে পুঁজিপতিদের আয় বাড়ানো।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে যেসব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তার একটি হল 'পর্যায়ক্রমিকতা', যার দ্বারা শ্রম-নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় কাজ ও উৎপাদনী ক্রিয়াগুলির পর্যায়ক্রমিকতার দরুন। একটা নির্দিষ্ট কালপর্বে, শ্রমিকরা তাদের কর্মস্থল বদলে চলে; অথচ তাদের কাজগুলি থাকে সারগতভাবে একই। কাজটা কম একঘেয়ে বলে অধিকতর শ্রম-নিবিড়তা অর্জিত হয়।

এই দিকে আরেকটি পদক্ষেপ হল 'প্রসারিত শ্রমক্রিয়া' প্রথা, যার দ্বারা প্রতিটি বিশেষ শ্রমিক সমস্ত শ্রমক্রিয়া সম্পন্ন করে একটা সংক্ষিপ্ত উৎপাদন-চক্রের ভিতরে। চক্রটির ভিতরকার ক্রিয়াগুলিকে নিয়তই আগের চেয়ে একটু বড় করে তোলা হয়, এবং মূল উৎপাদন ক্রিয়াগুলি সম্পন্নকারী শ্রমিকদের উপরে কতকগুলি বাড়তি কাজের ভার দেওয়া হয়, যে কাজগুলি আগে

করেছে সহায়ক শ্রমিকরা, যেমন — প্যাকিং, নিয়ন্ত্রণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ। যে সমস্ত উদ্যোগে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে উৎপাদের শ্রম-নিবিড়তায় ২৫ শতাংশ হ্রাস ঘটেছে এবং কর্মচারীদের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমেছে। তদনুযায়ী, মালিকদের মুনাফা বেড়েছে।

'শ্রম সমৃদ্ধকরণ' প্রথা পুঁজিপতিদের কাছে অত্যন্ত মুনাফাদায়ক। সারগতভাবে তা হল উচ্চতর বর্গের প্রসারিত শ্রমক্রিয়ার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাধীনে কর্মরত শ্রমিকদের শুধু যে সংশ্লিষ্ট কাজগুলিরই দায়িত্ব দেওয়া হয় তা নয়, কিছুটা মাত্রায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্রিয়ার দায়িত্বও দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার নিহিতার্থ হল প্রসারিত তথ্য ব্যবস্থা এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করার কাজে শ্রমিকদের বিরাট মাত্রায় অংশগ্রহণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রম সমৃদ্ধকরণ ব্যবস্থা যারা প্রথম প্রবর্তন করেছিল তাদের অন্যতম, মার্কিন সংস্থা 'মনসাণ্টো' দেখিয়েছিল যে এই ধরনের ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে সংস্থাটি নাইলন তন্তু উৎপাদনে প্রত্যেক চালকের নিয়ন্ত্রণের পরিধি ১·৫ গুণ প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিল, সুতরাং অনুরূপ পরিমাণে শ্রম-নিবিড়তাও বেড়েছে।

'শ্রম মানবিকীকরণ' প্রথা হল মূলত 'শ্রম সমৃদ্ধকরণ' ব্যবস্থার একটি প্রসারিত রূপ, কাজের অবস্থা উন্নত করা, কাজের প্রতি এক অনুকূলতর মনোভাব সঞ্চারিত করা এবং কাজের কঠোরতর

নিয়মশৃঙ্খলা কায়েম করার জন্য উদ্দিষ্ট কতকগুলি ব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'শ্রম মানবিকীকরণ' ব্যবস্থা একটা সামাজিক চরিত্রের দাবিদার। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মনীতিতে অদলবদল এবং শ্রমিকদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন হল এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান।

'শ্রম মানবিকীকরণ' প্রথার অন্তর্নিহিত নীতিগুলির আরও বিকাশ ঘটানো হয়েছিল 'শ্রম-জীবনের গুণগত মান' ব্যবস্থায়। শ্রমিকদের আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, এই ব্যবস্থার রূপকাররা একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগের প্রতিটি শ্রমিক যে বোনাস ও সুবিধাগুলি ভোগ করে সেইগুলি এবং তার উৎপাদনী অবদানের মধ্যে প্রবলতর এক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রথায় শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানো ও তাদের উদ্যমে উৎসাহ যোগানোর সংস্থান আছে। মনে হয় যেন ব্যবস্থাপনাকর্ম কার্যকর করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকা অনেকখানি বেড়েছে। শ্রমিককে তার নিজের সংসারে যেসব কাজ করতে হয় এবং যেভাবে সে তার অবসর সময় কাটায় তার সঙ্গে কাজের সময়-সারণিকে পরস্পরসম্পর্কিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষিত হয় এই প্রথায় (নিশ্চয় শুধু কথায়)।

মালিকরা 'স্বশাসিত শ্রম গোষ্ঠী'-র প্রথা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে; এতে দলগত (গোষ্ঠীগত) শ্রম পুনর্বিন্যাসের সংস্থান আছে, যার দ্বারা শ্রমিকদের একটি বিশেষ দল একটি নির্দিষ্ট বিভাগের উপরে ন্যস্ত

সমগ্র উৎপাদন পরিকল্পনা পূরণ করার জন্য দায়ী হয়। শ্রমিকরা নিজেরাই দলটির গঠনকাঠামো ও গঠনবিন্যাস স্থির করে। প্রতিটি শ্রমিক একটিমাত্র উৎপাদন ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক ধরনের কাজ সম্পন্ন করে, সেই সময়কার প্রয়োজন অনুযায়ী দলটির ভিতরে এই কর্তব্যকর্মগুলি পরিবর্তিত বা পুনর্বণ্টিত হয়। চলতি উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলি সংগঠিত ও তত্ত্বাবধান করার জন্য এবং কাজের শৃঙ্খলার জন্য দলটি দায়ী থাকে।

'স্বশাসিত শ্রম গোষ্ঠী' প্রথা মালিকদের পক্ষে খুবই মুনাফাদায়ক। একটি দৃষ্টান্ত হল মার্কিন কোম্পানি 'জেনারেল ফুডস'। টোপেকায় (কানসাস রাজ্য) তার কারখানাগুলিতে এই প্রথা গ্রহণ করার ফলে এই শিল্পের গড় সূচকের উপরে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল ৩৫ শতাংশ। তার মানে হল প্রত্যেক শ্রমিক-পিছু বাড়তি ১০,০০০ ডলার প্রত্যাগম।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য, ফোর্ড কনভেয়রের দিকে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং তাকে তার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। কিন্তু আজ কিছু কিছু পুঁজিপতি শ্রম সংগঠনের প্রাক-ফোর্ড পদ্ধতিতে ফিরে গেছে। হ্রস্বতর কনভেয়রগুলির উপরে সংযোজনকার্য, যেখানে প্রত্যেক শ্রমিক একটির পরিবর্তে একাধিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তা আবার প্রচলিত হয়েছে। গোটা একটা দল কাজটি করে এবং ফলাফলের জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকে। প্রয়োজন হলে শ্রমিকরা

তাদের কাজের জায়গা বদলায়। এই পদ্ধতি কোনো কোনো রেডিও কারখানায় চালু আছে। কালমার ও বোরাস-স্থিত (সুইডেন) 'ভোলভো' মোটর কারখানা স্ট্যান্ড সংযোজনকার্যের দিকে গেছে, প্রতিটি স্ট্যান্ডের কাজ দেখাশোনা করে একটি স্বশাসিত শ্রম গোষ্ঠী। অন্য কয়েকটি মোটর কারখানাও স্ট্যান্ড সংযোজনকার্য চালু করেছে। হুস্বতর কনভেয়র আর স্ট্যান্ড সংযোজনকার্য শ্রমকে কম একঘেয়ে করে এবং উৎপাদন ক্রিয়াগুলিকে করে একটু বৈচিত্র্যময়। শ্রম-উৎপাদনশীলতায় ২০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি হয় এ থেকেই। উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা ও শ্রম-নিবিড়তা পুঁজিপতিদের আয় বাড়ায়।

শ্রমের নিবিড়করণ ও শ্রম-সময় হানি হ্রাসকরণ — এই হল 'নমনীয় শ্রম-সময়' প্রথার লক্ষ্য; এই প্রথায় শ্রমিকরা ও কর্মচারীরা কাজের সপ্তাহের ভিতরে তাদের শ্রম সংগঠিত করার কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে। তাদের শুধু প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে হয়, উদ্যোগটি তাদের সামনে যে কয়েকটি বিকল্প কর্ম-নির্ঘণ্ট দেয় তা থেকে তাদের কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য দিনের ঘণ্টাগুলি তারা ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারে। পুঁজিপতিরা এই প্রথাকে এমন এক প্রথা হিসেবে উপস্থিত করতে চায়, যা শ্রমিকদের প্রয়োজনগুলির প্রতি সযত্ন মনোযোগ দেয়; প্রকৃতপক্ষে, এটা হল পুঁজিপতির উপকারার্থে সর্বাধিক উৎপাদনশীলতায় তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার একটা নতুন উপায়।

শ্রম সংগঠনের নতুন নতুন প্রথাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অধুনাতম কৃতিত্ব বলে উপস্থিত করার যত কঠিন চেষ্টাই পুঁজিপতিরা করুক না কেন, ঘটনাটা এই যে এই সমস্ত প্রথাই ভেবে বার করা হয়েছিল একটিমাত্র উদ্দেশ্য মনে রেখে — শোষণ নিবিড় করা। এর সবগুলিরই উদ্দেশ্য হল আরও বেশি মুনাফা আদায় করে নেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের কৃতিত্বগুলিকে ব্যবহার করা এবং শ্রমিকদের আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করার অধিকতর দক্ষতাকে ভালোভাবে কাজে লাগানো।

উদ্বৃত্ত-মূল্য ও শিল্পজনিত আঘাত-ক্ষতাদি

উৎপাদন সংগঠিত করার সময়ে পুঁজিপতির মাথায় থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করার সম্ভাবনা, কিন্তু যারা তা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কাজের অবস্থা আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপারে সে সর্বদাই মিতব্যয়িতা দেখায়। শ্রমের অত্যধিক দ্রুতি, লোকে ঠাসাঠাসি কর্মশালা, কোলাহল, গরম আর ধুলো — এই হল অধিকাংশ পুঁজিবাদী উদ্যোগের চারিত্রবৈশিষ্ট্য। এগুলি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির পক্ষে হানিকর, এমন কি তাদের আয়ুও এতে কমে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫-৫৯ বছর বয়ঃগোষ্ঠীর শ্রমিকদের গড় মৃত্যুহার শিল্পপতি, ম্যানেজার আর কর্মকর্তাদের উঁচু মহলগুলির তুলনায় ২ থেকে ৫ গুণ বেশি।

ব্রিটিশ অদক্ষ শ্রমিকদের বেলায় সূচকটি মালিকদের বা বাবুকাজের কর্মচারীদের তুলনায় ১·৪ গুণ বেশি।

ক্রমবর্ধমান শোষণের একটি প্রত্যক্ষ পরিণতি হল শিল্পজনিত আঘাত-ক্ষত ও পেশাজনিত রোগের উচ্চহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন মিনিটে একজন শ্রমিক নিহত হয় অথবা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়, এবং প্রতি এগারো সেকেণ্ডে একজন শ্রমিক আহত হয়। পশ্চিম জার্মানিতে রোজ ৮,০০০ শিল্প সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তাগিদের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতেও ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শিল্পজনিত আঘাত-ক্ষতের ঘটনা ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুরস্কে শিল্প সংক্রান্ত দুর্ঘটনাগুলিতে প্রতি বছর ১,৫০০ মানুষ প্রাণ হারায়, আর হাজার হাজার শ্রমিক পঙ্গু হয়।

অধ্যায় ৬

উদ্বৃত্ত-মূল্য কে অর্জন করে?

উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্ট হয় শিল্পে, কৃষিতে, নির্মাণকর্মে ও বৈষয়িক উৎপাদনের অন্যান্য শাখায় নিযুক্ত ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা। এই সমস্ত শিল্পে যারা নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে শুধু সেই পুঁজিপতিদের ভোগেই তা চলে যায় না। তা বণ্টিত হয় শোষকদের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও, যেমন — বণিক, ব্যাংকার, বড় বড় ভূস্বামী। তারা সবাই উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে, কারণ সেটাই তাদের ধনবৃদ্ধির উৎস। এক তিক্ত প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে, তাদের প্রত্যেকেই চেষ্টা করে পিঠাটির আরও বড় একটা টুকরো পেতে। বুর্জোয়া সমাজে, ফরাসী লেখক এমিল জোলা যেমন লিখেছিলেন, 'অর্থই সব কিছু, অর্থই ঈশ্বর, অর্থই রাজা, অর্থ রক্তের

চেয়ে দামি, অর্থ তার অসীম ক্ষমতার জন্য পূজিত হয় এবং তুচ্ছ বিবেক-দংশনকে পরিহার করা হয়।'

মুনাফা

বৈষয়িক উৎপাদনে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিরা প্রথমে তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়। এরা হল শিল্পপতি ও উদ্যোগপতি, যারা কৃষি, নির্মাণকর্ম ও অর্থনীতির অন্যান্য উৎপাদনশীল শাখার ভাড়াটে শ্রম শোষণ করে।

প্রত্যেক পুঁজিপতি তার উদ্যোগটির উৎপাদকে বাজারে আনে। তার উৎপাদের বিক্রয় তাকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ দেয়। এই অঙ্কটি থেকে সে প্রথমে ও সর্বাগ্রে তার খরচগুলি অথবা **উৎপাদন-ব্যয়গুলি** তুলে নেয়। এই ব্যয়গুলির মধ্যে আছে উৎপাদনের উপায় ক্রয় ও শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে তার ব্যয়িত অর্থ। এই উৎপাদন-ব্যয়ই দেখায় পণ্যটি উৎপন্ন করতে পুঁজিপতির কত ব্যয় হয়েছে।

উৎপাদ বিক্রয় থেকে লব্ধ মোট আয় তার উৎপাদনের মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি। একটা নির্দিষ্ট বাড়তি অংশ থাকে, যেটা পুঁজিপতির মুনাফা। **মুনাফা** হল সেই অর্থ যা পুঁজিপতির লভ্য হয় মোট আয় থেকে উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর, অর্থাৎ তা হল মোট আয় আর মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেকার পার্থক্য। এই হল মুনাফার বাহ্যিক আকৃতি।

মুনাফার সারবস্তু কী দিয়ে তৈরি হয়?

আগে আমরা জানতে পেরেছি, যে কোনো পণ্যের মূল্য তিনটি অঙ্গ-উপাদানে বিভক্ত: (১) স্থির পুঁজির মূল্য (সপু); (২) অস্থির পুঁজির মূল্য (অপু); এবং (৩) উদ্বৃত্ত-মূল্য (উ)। তাই একটি পণ্যের মূল্য হিসাব করা হয় এইভাবে: প=সপু+অপু+উ। প্রথম দুটি অঙ্গ-উপাদানকে মেলালে (সপু+অপু) আমরা পাই উৎপাদন-ব্যয়। মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেকার পার্থক্য হল প–(সপু+অপু)। যেহেতু প=সপু+অপু+উ, তা হলে প–(সপু+অপু)=(সপু+অপু+উ)–(সপু+অপু)=উ। এই বাড়তি অংশ উ হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। আমরা দেখেছি, পুঁজিপতি এই বাড়তি অংশ উপযোজন করে তার পুরস্কার বা মুনাফা হিসেবে। তার হিসাব-বইতে, মুনাফা-লোকসানের হিসাবপত্রে, ব্যালান্স শীটে তা এই নামেই স্থান পায়। তাই মুনাফা হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি রূপ। বৈষয়িক উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগকারী ম্যানুফ্যাকচারাররা ও অন্যান্য পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত-মূল্য পায় মুনাফার রূপে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের শোষণমূলক অন্তঃসারকে মুনাফা গোপন করে রাখে। পুঁজিপতি তার উদ্যোগটির মুনাফাদায়কতা পরিমাপ করার সময়ে মোট আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে মুনাফার তুলনা করে। উৎপাদনে বিনিয়োজিত পুঁজির প্রতিটি ডলার পিছু প্রত্যাগম যত বেশি, উদ্যোগটি তত বেশি মুনাফাদায়ক। মুনাফাদায়কতার যে মূল্যায়নে মুনাফার পরিমাপ করা হয় উৎপাদনে বিনিয়োজিত মোট পুঁজির উপরে, সেই

মূল্যায়ন এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে যেন মোট পুঁজির দ্বারাই মুনাফা উৎপন্ন হয়। উৎপাদনের এই ধরনের ব্যাখ্যানে স্থির ও অস্থির পুঁজির মধ্যেকার পার্থক্যটা গণ্য করা হয় না, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত উৎসটিকে গোপন রাখা হয়। মুনাফার রূপে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে দেখা হয় অস্থির পুঁজির দ্বারা উৎপন্ন হিসেবে নয়, বরং মোট আগাম দেওয়া পুঁজির দ্বারা উৎপন্ন হিসেবে।

মুনাফার হার

আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়ার জন্য পুঁজিপতি তার উদ্যোগের মুনাফাদায়কতা বাড়াতে চেষ্টা করে। উৎপাদনে নিয়োজিত তার পুঁজির জন্য অনুকূলতম শর্ত নিশ্চিত করতে সে তার লভ্য সমস্ত উপায়েরই আশ্রয় নেয়। উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বিনিয়োজিত পুঁজির মুনাফাদায়কতা তুলনা করার জন্য মুনাফার হার হিসাব করা হয়।

মুনাফার হার হিসাব করা হয় একটি শতাংশ হিসেবে প্রকাশিত মোট আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অনুপাত হিসেবে: $মু = \frac{উ}{আ} \times$ $\times ১০০ = \frac{উ}{সপু + অপু} \times ১০০$, যেখানে মু হল মুনাফার হার এবং আ হল আগাম দেওয়া পুঁজি।

ধরে নেওয়া যাক যে একটি নির্দিষ্ট আগাম দেওয়া পুঁজি ১,০০,০০০ ডলারের সমান। তার স্থির ও

অস্থির অংশগুলি হল যথাক্রমে ৮৫,০০০ ডলার ও ১৫,০০০ ডলার। ধরা যাক যে তা ২০,০০০ ডলারের সমান উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে। তা হলে মুনাফার হার হল $\frac{২০}{৮৫+১৫} \times ১০০ = ২০\%$। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মুনাফার হার বস্তুতপক্ষে প্রায় ২০ শতাংশ।

মুনাফার হার বিভিন্ন বিষয় দিয়ে নির্ধারিত হয়। প্রধান বিষয়টি হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যত বেশি, মুনাফার হারও তত বেশি। এই প্রত্যক্ষ সম্পর্কটা এই ঘটনার দরুন যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে একটি বৃদ্ধি উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে একটি বৃদ্ধি ঘটায়, যেটা আবার মুনাফার হার বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত সমস্ত পদ্ধতিই মুনাফার হারকেও বাড়ায়।

মুনাফার হারে একটি বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে আরও যে একটি বিষয় সাহায্য করে, সেটি হল পুঁজির গঠনবিন্যাসে পরিবর্তন। উদ্বৃত্ত-মূল্য একমাত্র অস্থির পুঁজির দ্বারাই উৎপন্ন হয় বলে, মোট পুঁজিতে অস্থির পুঁজির অংশটি বৃহত্তর হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে এক যথোপযুক্ত বৃদ্ধি ঘটে; এবং তার মধ্য দিয়ে মুনাফার হারে বৃদ্ধি ঘটে। তদনুযায়ী, অস্থির পুঁজির অংশটি কমে গেলে মুনাফার হার কমে যায়। পুঁজিপতি যে স্থির পুঁজি বাবদ ব্যয়সংকোচ করতে চেষ্টা করে, সেই ঘটনাটাও মুনাফার হারের উপরে প্রভাব ফেলে। একটি দৃষ্টান্ত হল নিরাপত্তামূলক

ব্যবস্থা ও কাজের অবস্থা বাবদ ব্যয় হ্রাস করা। আগাম দেওয়া পুঁজির একটি অংশ এইভাবে মুক্তিলাভ করে বলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং তৎসংশ্লিষ্টভাবে মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়।

আরও যে একটি বিষয় মুনাফার হার বাড়ায় তা হল পুঁজির প্রত্যাবৃত্তির বেগমাত্রা। হ্রস্বতর এক প্রত্যাবৃত্তি-কাল অধিকতর মুনাফা উৎপন্ন করে।

মুনাফার গড় হার

প্রত্যেক পুঁজিপতিই চায় যাতে তার পুঁজি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পুঁজির চেয়ে অধিকতর মুনাফার হার উৎপন্ন করে। দেখা যায় যে সমপরিমাণ পুঁজিগুলির গঠনবিন্যাস হয় ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো উদ্যোগে অস্থির পুঁজির অংশটি বেশি, অন্যান্য উদ্যোগে স্থির পুঁজির অংশটি বেশি। সুতরাং সমপরিমাণ পুঁজি আগাম দিয়ে পুঁজিপতিরা পায় ভিন্ন ভিন্ন মুনাফা; তাই তাদের মুনাফার হারও ভিন্ন ভিন্ন।

ধরা যাক যে একটি জুতো কারখানায় ১,০০,০০০ ডলার বিনিয়োজিত হয়েছে এবং একটি মেশিন-টুল কারখানায় ১,০০,০০০ ডলার বিনিয়োজিত হয়েছে। জুতো শিল্পের জন্য পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসটি হল ৫০,০০০ ডলার স্থির পুঁজি আর ৫০,০০০ ডলার অস্থির পুঁজি। মেশিন-টুল শিল্পে, তার প্রযুক্তির উচ্চতর স্তরের দরুন, স্থির পুঁজির অংশটি অস্থির পুঁজির অংশের চেয়ে বেশি:

ধরুন যথাক্রমে ৯০,০০০ ডলার ও ১০,০০০ ডলার। সরলতার খাতিরে, ধরে নেওয়া যাক যে স্থির পুঁজির মোট মূল্য উৎপাদটিতে স্থানান্তরিত হয় এক বছর ধরে। তা হলে প্রতিটি উদ্যোগের জন্যই উৎপাদন-ব্যয় হল ১,০০,০০০ ডলার। যদি ধরে নিই যে প্রতিটি শিল্পের মুনাফার হার ১০০ শতাংশ, তা হলে জুতো কারখানাটি ৫০,০০০ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করবে ১,৫০,০০০ ডলার মোট মূল্যের উৎপাদ সহ ($প_1$=সপু+অপু+উ=৫০,০০০+৫০,০০০+৫০,০০০=১,৫০,০০০) এবং মেশিন-টুল কারখানাটি উৎপন্ন করবে ১০,০০০ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য, উৎপাদের মোট মূল্য হবে ১,১০,০০০ ডলারের সমান ($প_2$=সপু+অপু+উ=৯০,০০০+১০,০০০+১০,০০০=১,১০,০০০)।

দেখা যাচ্ছে, জুতো কারখানার মালিকের মুনাফার হার ৫০ শতাংশ ($মু=\frac{উ}{সপু+অপু}\times১০০=\frac{৫০}{৫০+৫০}\times১০০=৫০\%$). আর মেশিন-টুল কারখানার মালিকের মুনাফার হার মাত্র ১০ শতাংশ ($মু=\frac{উ}{সপু+অপু}=\frac{১০}{৯০+১০}\times১০০=১০\%$)। আর এটা হচ্ছে সমান পুঁজি ব্যয় করে!

মেশিন-টুল কারখানার মালিক অবশ্য এই পরিস্থিতি বরদাস্ত করবে না। সে মেশিন-টুলের উৎপাদন কমিয়ে দেবে এবং এইভাবে মুক্ত-হওয়া পুঁজি বিনিয়োগ করবে জুতো শিল্পে। ফলে, মেশিন-টুলের যোগান কমে যাবে এবং সেগুলির বাজার দাম বেড়ে গিয়ে সেগুলির মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। জুতোর যোগান বাড়বে এবং তার

দাম কমে গিয়ে তার মূল্যের চেয়ে কম হবে। পুঁজিপতিরা মেশিন-টুল শিল্প থেকে পুঁজি বার করে নিয়ে জুতো শিল্পে বিনিয়োগ করতে শুরু করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি শিল্পই সমান মুনাফা দিতে শুরু না-করে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় শিল্পে মুনাফার হার সমান হয়ে যায়। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, তা হতে হবে ২৫ শতাংশ। তখন জুতো শিল্পে বিনিয়োজিত ১,০০,০০০ ডলার, আর মেশিন-টুল শিল্পে বিনিয়োজিত ১,০০,০০০ ডলার সমান মুনাফা দেবে ২৫,০০০ ডলারের।

এই অঙ্কটা দুটি উদ্যোগের প্রত্যেকটিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের অঙ্কের সমান নয়, কেননা মেশিন-টুল কারখানার মালিক সেই উদ্যোগের শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে ১৫,০০০ ডলার বেশি পাবে, আর জুতো কারখানার মালিক সেখানকার শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়ে ১৫,০০০ ডলার কম পাবে।

মেশিন-টুল ও জুতো শিল্প — এই দুটি শিল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা মুনাফার হারের সমান হওয়ার প্রক্রিয়া বিবেচনা করেছি। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি জুড়ে একই প্রক্রিয়া ঘটে। শিল্পগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সকল শিল্পে সমান পুঁজি মোটামুটি সমান মুনাফা উৎপন্ন করে। একমাত্র এটাই যে কোনো শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ সমানভাবে মুনাফাদায়ক করে তোলে, এবং এটাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অস্তিত্ব ও বিকাশের এক অপরিহার্য শর্ত।

সমস্ত শিল্পে মুনাফার হার সমান হওয়ার ফলে সমস্ত পুঁজিপতির পক্ষেই নির্দিষ্ট একটা **মুনাফার গড় হার** প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা হিসাব করা হয় সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্য আর সমগ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োজিত সর্বমোট সামাজিক পুঁজির অনুপাত হিসেবে; মুনাফার একক হারের মতোই তা প্রকাশ করা হয় শতাংশে।

সমস্ত পুঁজিপতিই মুনাফা পেতে শুরু করে এই গড় হারে — জুতো, মেশিন-টুল, সীবন, লোহা ও ইস্পাত, জাহাজনির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পে। মুনাফার এই গড় হারই হল বৈষয়িক উৎপাদনে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিদের লব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূর্ত রূপ। পুঁজি বিনিয়োগের আয়তন অনুযায়ী পুঁজিপতিদের মধ্যে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুনর্বণ্টনকে তা নিশ্চিত করে। প্রলেতারিয়েতকে শোষণ করায় পুঁজিপতিদের স্বার্থের সাযুজ্যকে তা সূচিত করে, কেননা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণের মাত্রা যত বেশি, সারা সমাজ জুড়ে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ তত বেশি হয়, এবং তাই প্রতিটি বিশেষ পুঁজির ভাগে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য জোটে। তাই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকরা শোষিত হয় শুধু তাদের বিশেষ উদ্যোগটির মালিকের দ্বারাই নয়, বরং, বস্তুতপক্ষে পুঁজিপতিদের সমগ্র শ্রেণীটির দ্বারা।

পুঁজিপতিরা কেন পণ্যসামগ্রীকে সেগুলির যথামূল্য নয় এমন মূল্যে বিক্রয় করতে শুরু করে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গড় মুনাফার হার গঠনের প্রণালী

থেকে। পণ্যসামগ্রীর জন্য ধার্য দামের ভিত্তি হল উৎপাদন-ব্যয় এবং গড় মুনাফা যার ভিত্তি হল আগাম দেওয়া পুঁজি। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যয় আর গড় মুনাফা মিলিয়ে হয় পণ্যটির **উৎপাদনের দাম**। পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রীত হয় সেগুলির উৎপাদনের দামে। উৎপাদনের দামের মধ্য দিয়েই প্রত্যেক পুঁজিপতি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমে উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিজ অংশটা পেয়ে থাকে।

উৎপাদনের দাম কি মূল্যের নিয়মের ক্রিয়াকে কোনোভাবে ব্যাহত করে? অবশ্যই না। পুঁজিবাদে, উৎপাদনের দাম হল পণ্য-মূল্যেরই আরেকটি, পরিবর্তিত, রূপ মাত্র। শেষ অবধি, উৎপাদনের দাম গঠনকারী সমস্ত উপাদানই নির্ধারিত হয় মূল্য দিয়ে। সমাজের পরিসরে উৎপাদনের দামের মোট সমষ্টি পণ্যসামগ্রীর সমস্ত মূল্যের মোট সমষ্টির সমান। তদনুযায়ী, মুনাফাগুলির মোট সমষ্টি হল উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের সমান।

বাণিজ্যিক মুনাফা

কারখানা ও খনিগুলির মালিকরা তাদের উদ্যোগগুলির উৎপাদ টেবিলে সাজিয়ে বিক্রি করে না, ভোক্তাদের কাছে পুনর্বিক্রয়ের জন্য পাইকারি দরে বিক্রি করে বণিক দালালের কাছে।

পাইকারি ও খুচরো লেনদেনের জন্য বণিক

পুঁজিপতিরা পুঁজি আগাম দেয় (যা সুনির্দিষ্ট, **বাণিজ্যিক পুঁজি** হিসেবে বিশিষ্ট), তা ব্যয়িত হয় দোকান নির্মাণ ও সজ্জিত করার কাজে এবং পুনর্বিক্রয়ের জন্য পাইকারি সামগ্রী ক্রয়ের কাজে। বণিকরা বিশেষ বিশেষ পণ্যসামগ্রীর চাহিদা সমীক্ষা করে ও সেগুলির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। খুচরো ও পাইকারি কার্যসংস্থাগুলিতে কাজের জন্য তারা বিক্রয়কর্মী ও হিসাবরক্ষকদের ভাড়া করে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে বড় বড় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে লাভজনকভাবে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যার গড়ে ১৬·৪ শতাংশ বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অংকটা ছিল প্রায় ২০ শতাংশ, জাপানের ক্ষেত্রে ২২ শতাংশ, এবং ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ।

বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার পর বণিককে অবশ্যই তার খরচ তুলে নিতে হবে এবং একটা গড় মুনাফা পেতে হবে। তা না-করতে পারলে সে বাণিজ্যে তার পুঁজি বিনিয়োগ করবে না, কেননা বাণিজ্য ব্যবসায়টা তার পক্ষে মুনাফাদায়ক হবে না।

বণিকের মুনাফা আসে কোথা থেকে? বাণিজ্য এমনিতে একটি অনুৎপাদনশীল আর্থনীতিক ক্রিয়া: তা মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য কোনোটাই সৃষ্টি করে না।

বণিকরা মুনাফা আদায় করে নেয় বৈষয়িক উৎপাদনে মজুরি শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। পুঁজিবাদী ম্যানুফ্যাকচারাররা এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভাগ পেতে দেয়, অবশ্য ইচ্ছুকভাবে নয়।

ঘটনাটা এই যে বণিকরা যদি না থাকত তা হলে ম্যানুফ্যাকচারারদের নিজ নিজ উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে বিক্রি করতে হত। সেটা করতে হলে তাদের পুরো সাজসরঞ্জাম সমেত দোকান চালাতে হত, বিক্রয় প্রসারের ব্যবস্থা করতে হত, নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হত, ইত্যাদি। সংক্ষেপে, তাদের ব্যাপৃত থাকতে হত নিজেদের উৎপাদ বিক্রয়ের জন্য সীমাবদ্ধ খুচরো ব্যবসার মধ্যে, আর অল্প পরিমাণে বিক্রয়ের সঙ্গে প্রচুর ব্যয় জড়িত থাকে বলে তাদের লাভের পরিবর্তে বরং লোকসানই হত। উল্টো দিকে, বণিকরা কারবার চালায় বৃহৎ পরিসরে, কেননা বহু ম্যানুফ্যাকচারারের সরবরাহকৃত সামগ্রী তারা কেনাবেচা করে। বাণিজ্যে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে; তারা উপযুক্ত, বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়োগ করে। তাই তারা ম্যানুফ্যাকচারারদের চেয়ে অনেক কম ব্যয়ে বাণিজ্য চালাতে পারে। এই অবস্থায় ম্যানুফ্যাকচাররা তাদের পণ্যসামগ্রী ক্রেতাদের কাছে পৌঁছনোর ভারটা বাণিজ্য চালাতে পারে। এই অবস্থায় ম্যানুফ্যাকচাররা মনে করে। বণিকরা অবশ্য সেটা বিণাপয়সায় করবে না, তাদের অবশ্যই নিজেদের প্রাপ্যটা পাওয়া চাই — তাই ম্যানুফ্যাকচারারদের অবশ্যই তাদের উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ বণিকদের দিতে হবে।

একটি সরল উদাহরণ এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলবে। ধরুন একজন নির্দিষ্ট কল্পিত

ম্যানুফ্যাকচারার দৈনিক ৮০০ ডলার পুঁজি আগাম দেয়। এই পুঁজি বাবদ দৈনিক প্রত্যাগম হল ২০০ ডলার। তা হলে সমগ্র দৈনিক উৎপাদের দাম ১,০০০ ডলার। ১,০০০ এককের উৎপাদ হলে, উৎপাদের একটি এককের দাম ১ ডলার। ম্যানুফ্যাকচারার বিশেষ একজন বণিককে পাইকারিভাবে তার উৎপাদ বিক্রয় করে। বাণিজ্যিক লেনদেনে বণিক ২০০ ডলারের সমান পুঁজি ব্যয় করে। একটা নির্দিষ্ট পুঁজি ব্যয় করে ও সামগ্রীগুলি উপভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে বণিক তার পুঁজির উপরে একটা মুনাফা প্রত্যাশা করে। সে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতে শুধু রাজী হবে এই শর্তে যে ম্যানুফ্যাকচারার যেমন মুনাফা করে ঠিক সেই রকমই মুনাফা যাতে সে করতে পারে। এই অবস্থায় মুনাফার গড় হার হিসাব করতে হবে শুধু শিল্প পুঁজি বাবদই নয়, বাণিজ্যিক পুঁজি বাবদও প্রত্যাশা হিসেবে: $মু=\frac{উ}{আ}\times১০০=\frac{২০০}{৮০০+২০০}\times১০০=২০\%$। ম্যানুফ্যাকচারারের মুনাফা হল ১৬০ ডলার (৮০০ ডলার×২০%=১৬০ ডলার); বণিকের মুনাফা হল ৪০ ডলার (২০০ ডলার×২০%=৪০ ডলার)।

বণিক যাতে মুনাফা করতে পারে তার জন্য ম্যানুফ্যাকচারার তার উৎপাদ অবশ্যই তাকে বিক্রি করবে উৎপাদনের দামের চেয়ে কম দামে। আর বণিক ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে রাজী হয় একমাত্র এই শর্তে যে ম্যানুফ্যাকচারারকে পুরো থোক পণ্যটা ৯৬ সেণ্ট দামে বিক্রি করতে হবে, একক-

পিছু ১ ডলার দামে নয় (অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের দামের চেয়ে ৪ সেণ্ট কম দামে)। ফলে, ম্যানুফ্যাকচারার পাবে ৯৬০ ডলার। ইতিমধ্যে, বণিক সামগ্রীগুলি বিক্রি করবে উৎপাদনের দামে, অর্থাৎ একক-পিছু ১ ডলার দামে, ফলে পুরো থোকটার জন্য সে পাবে ১,০০০ ডলার। তার মোট আয় আর তার মোট ব্যয়ের মধ্যে তফাৎটা হল ৪০ ডলার, এটাই পুঁজিপতি বণিকের **বাণিজ্যিক মুনাফা**। আমরা দেখেছি, এর উৎস হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, ম্যানুফ্যাকচারার যা বণিককে দিয়েছে ক্রয় ও বিক্রয়ের দামের পার্থক্যের মধ্যে।

এইভাবে, পুঁজিপতি বণিকও ম্যানুফ্যাকচারারের সঙ্গে সমহারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা ভাগ পায় বাণিজ্যিক মুনাফার রূপে, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচারার তার পণ্যগুলিকে উশুল করার জন্য বণিককে যা দেয় সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ। ম্যানুফ্যাকচারারদের সঙ্গে একত্রে বণিকরা ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বিনিময়ে ধনবান হয়। ভাড়াটে শ্রমের উপরে তাদের সম্মিলিত শোষণই বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দুটি গোষ্ঠীর শ্রেণী-সংহতির বনিয়াদ স্থাপন করে।

বণিক পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে দুই ধরনের সঞ্চলন-ব্যয় মেটায়: নীট ব্যয়, অর্থাৎ বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও হিসাব রাখা সংক্রান্ত খরচ। সব মিলিয়ে এই ব্যয়টা দাঁড়ায় মোট সঞ্চলন-ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি। মূল্যের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত ক্রিয়াগুলি

উৎপাদনশীল ক্রিয়া নয়, কেননা সেগুলি নতুন মূল্য উৎপন্ন করে না। সুতরাং নীট সঞ্চলন-ব্যয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গে কিছু যোগ করে না এবং তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে একমাত্র উৎপাদনে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করার জন্য বণিক যে দামে ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে পণ্যগুলি কেনে সেই ক্রয় দামকে আরও কমায়। দাম বাড়ানোটা অর্থাৎ, ক্রয়ের দাম ও পণ্যগুলি যে দামে উপভোক্তার কাছে বিক্রি করা হয় সেই খুচরো দামের মধ্যে পার্থক্যটা তদনুযায়ী বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় ধরনের সঞ্চলন-ব্যয় হল সামগ্রীগুলির সঞ্চলন-ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যয়: পরিবহণ, গুদামে রাখা, প্যাক করা, প্রভৃতি। প্রকৃতিতে এগুলি উৎপাদন-ব্যয়ের অনুরূপ, তাই এগুলি সামগ্রীগুলির মূল্য বাড়ায়।

উৎপাদনে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিজ ভাগটা বণিক পায় দাম-বাড়ানো থেকে। এটা সামগ্রীগুলির খুচরো দামের একটা বড় অংশ: দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ৪০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়।

উপভোক্তা হিসেবে শ্রমিক, কৃষক ও কারিগরদের শোষণ করা থেকেও পুঁজিপতি বণিকরা মোটা মুনাফা করে। শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে তাদের আবশ্যকীয় উৎপাদের একাংশ ছিনিয়ে নেওয়ার একটা পন্থা হল ভোগ্যপণ্যকে সেগুলির মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা। আরেকটা পন্থা হল অর্থ পরিমাপ ও গণনা করার ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের ঠকানো এবং নিম্ন-

মানের মাল বিক্রি করা। কৃষক ও কারিগরদের কাছ থেকে কম দামে মাল কিনে পরে চড়া দামে সেগুলি বিক্রি করেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

অস্ত্রের বাণিজ্য করে — সবচেয়ে পরগাছাসুলভ বাণিজ্যগুলির অন্যতম — পুঁজিপতিরা নিয়ত বেড়ে-চলা মুনাফা আদায় করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাগুলির সামরিকীকরণ এবং একটা নতুন বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিবিড় করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাসনা এই নোংরা ব্যবসায়ের পরিসর নিয়ত বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা যোগায়। ১৯৫২ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলির অস্ত্র বিক্রয় বাবদ মোট আয় হয়েছিল ৩০ কোটি ডলার। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে, অস্ত্র বিক্রয় বাবদ বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছিল ২৫ শতকোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্র যোগানদার।

বৈদেশিক বাণিজ্য হল বণিকী ক্রিয়াকলাপের অত্যন্ত মুনাফাদায়ক ক্ষেত্র। উন্নত দেশগুলির পুঁজিপতিরা সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি ফয়দা ওঠায়, তাদের কাছে তৈরি মাল বিক্রি করে চড়া দামে এবং তাদের কাঁচামাল ও অন্যান্য চিরাচরিত উৎপাদ কেনে কম দামে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির জাতীয় সম্পদ লুঠ করার জন্য পুঁজিপতিরা এই 'দামের কাঁচিটি' ব্যবহার করে।

'দামের কাঁচিটা' কালক্রমে চওড়া হয়। ১৯৬০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেখানে এক টন কলা বিক্রি করে পাওয়া অর্থের পরিমাণ দিয়ে ১৩ টন

তেল কিনতে পারত, সেখানে ১৯৮২ সালে এক টন কলার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কেনা যেতে পারত মাত্র ১·৬ টন তেল। অনুরূপভাবে, ১৯৫৯ সালে ৬০ অশ্বশক্তির একটি ট্র্যাক্টর কেনা যেত ২৪ টন চিনির দামে, সেখানে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে তার দাম পড়ত ১১৫ টন চিনি। এই কালপর্বেই ৭-৮ টন মাল বহনক্ষম একটি লরির কেনার দাম ৬ টন পাট তন্তু থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৬ টন পাট তন্তু — ৪·৩ গুণ বৃদ্ধি। ১৯৬০ সালে একটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের কাছে এক টন কফি বিক্রি করে সেখান থেকে ৩৭·৩ টন খনিজ সার কেনা যেত, আর ১৯৮২ সালে, এক টন কফির বিনিময়ে কেনা যেত মাত্র ১৫·৮ টন সার, অর্থাৎ ২·৪ গুণ কম।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারগুলি তাদের পুঁজিপতিদের উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে আরও বেশি মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য প্রকাশ্য সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় নেয়। সংরক্ষণ নীতির হাতিয়ারগুলির মধ্যে থাকে পুঁজিপতিদের জন্য সরকারি ভরতুকি, উন্নয়নশীল দেশগুলির মালমসলার আমদানি শুল্কহার ও কোটা, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আমদানির উপরে প্রতিবন্ধক চাপিয়ে নানা ধরনের খুঁটিনাটি শর্ত ও অনাময় বিধি, তথা অন্যান্য বৈষম্যমূলক কলকৌশল। সাধারণভাবে, সংরক্ষণ নীতির এই সমস্ত রূপই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথম, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির বাজারে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে আমদানি-সামগ্রীর জন্য বিশেষ সুবিধা

নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে উন্নত দেশগুলিতে পণ্য আমদানির উপরে প্রতিকূলতম বাণিজ্যের শর্ত চাপিয়ে সেই আমদানিকে সীমিত করে। সংরক্ষণ নীতির ফলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বণিকের পুঁজির অধিকতর মুনাফা হয় এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে তার অবস্থান শক্তিশালী হয়।

ঋণের সুদ

সময়ে সময়ে প্রত্যেক পুঁজিপতিরই অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়, তাকে সেই অর্থ ধার করতে হয়। সে যখন কাঁচামালের একটা বৃহৎ সরবরাহ, কিংবা নতুন নতুন যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম কেনে, বিদ্যমান কারখানাগুলি সম্প্রসারিত বা আধুনিক করে, অথবা নতুন কারখানা নির্মাণ করে, ইত্যাদি, তখন সে অন্যান্য পুঁজিপতির কাছ থেকে অর্থ ঋণ নেয়। এ কথা বলাই যথেষ্ট যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত কাঁচামাল ও সরঞ্জাম বিক্রয়ের প্রায় ৯৫ শতাংশ ও সমস্ত খুচরো বাণিজ্যের ৬০ শতাংশই ঘটে ক্রেডিট বা ধারে লেনদেন মারফৎ।

যেসব পুঁজিপতির ব্যবসা হল অন্য পুঁজিপতিদের ঋণ দেওয়া, তাদের বলা হয় ঋণদাতা পুঁজিপতি। তাদের হাতে থাকে বেশ বড় অর্থ তহবিল, বা **ঋণ-পুঁজি**, যার

আয়তন নিয়তই বাড়ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রত্যর্থ পত্রের রূপে অর্থ-পুঁজির মোট পরিমাণ ১৯৬০ সালে ছিল ২ ট্রিলিয়ন (২০০০০০০০০০০০) ডলার এবং ১৯৭৮ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৮·৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ঋণ-পুঁজির উৎস হল পুঁজিপতিদের সমগ্র শ্রেণীটির দ্বারা সাময়িকভাবে মুক্ত-করা অর্থ তহবিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে অর্থ তহবিল আলাদা করে রাখা হয় পুরনো যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য, কাঁচামালের সংভার আবার সঞ্চিত করার জন্য এবং যে সমস্ত লেনদেনে তৎক্ষণাৎ নগদ মূল্য-পরিশোধ দরকার হয় না, সেগুলির জন্য। কৃষক, কারিগর, পেনশনভোগী ও জনসমষ্টির অন্যান্য গোষ্ঠীরও অর্থ আয় ও সাশ্রয়কে ঋণ তহবিলের মধ্যে টেনে আনা হয়।

ঋণদাতা পুঁজিপতিরা ঋণ দেয় বণিক ও শিল্প পুঁজিপতিদের, সেই ঋণ ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ্য। একজন বণিক বা একজন ম্যানুফ্যাকচারার (বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি) সেই ঋণটা তার নিজের পুঁজির সঙ্গে যোগ করে এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য তা ব্যবহার করে। ফলে, নতুন পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়। সেগুলি বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি তার খরচ তুলে নেয় এবং একটা গড় মুনাফা পায়। এখন তার ঋণ পরিশোধ করার অর্থ রয়েছে। কিন্তু ঋণদাতা পুঁজিপতিকে সে যে অঙ্কটা পরিশোধ করবে সেটা ঋণের অঙ্কের চেয়ে বড় হবে। তার মধ্যে থাকবে একটা পুরস্কার, যে-পুরস্কার বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি

ঋণদাতা পুঁজিপতিকে দেয় ঋণ মঞ্জুর করার জন্য। সেই পুরস্কারটা যদি না পেত তা হলে ঋণদাতা পুঁজিপতি অর্থ ধার দিত না। পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, ঋণের উপরে সুদ না পেলে কেউই তার পুঁজি ধার দিতে রাজী হত না; সেটা হত পুঁজির চরিত্রেরই বিরোধী, তার উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের বল্‌গাহীন তাড়নারই বিরোধী।

ঋণ পরিশোধ করার জন্য বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিকে তার গড় মুনাফা থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক বাদ দিতে হয়। মুনাফার যে অংশটা তার কাছে থাকে তা হল তার **বিনিয়োগের আয়**। ঋণদাতা পুঁজিপতিকে সে যে পুরস্কারটা দেয় তা হল **ঋণের সুদ**। তাই ঋণের সুদের সংজ্ঞানির্ণয় করা যেতে পারে ঋণ দেওয়ার জন্য ঋণদাতা পুঁজিপতিকে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতির দেওয়া গড় মুনাফার একটা অংশ বলে। মুনাফা যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি রূপ, তাই ঋণের সুদও উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ, যথা, উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ যেটি ঋণদাতা পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত হয়। ঋণদাতা পুঁজিপতি ঋণের সুদ অর্জন করে বলে সেও বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সমহারে ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণে লিপ্ত।

ঋণ-পুঁজির আয়তনের সঙ্গে ঋণের সুদের অনুপাত হল **সুদের হার**। এইভাবে, ১,০০,০০০ ডলারের একটা পুঁজি যদি ঋণ দেওয়া হয় এবং তার উপরে দেওয়া ঋণের সুদ যদি হয় ১৫,০০০ ডলার, তা হলে সুদের

হার হল ১৫ শতাংক ($\frac{১৫,০০০}{১,০০,০০০} \times ১০০ = ১৫\%$)।

ঋণের সুদের আয়তন বিনিয়োগকারী পুঁজিপতির গড় মুনাফার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তার সমগ্র মুনাফা যদি ঋণের সুদই খেয়ে নেয় এবং যদি বিনিয়োগের আয় সে না পায় তবে সে অর্থ ধার করবে না। অন্য দিকে, ঋণের সুদও শূন্যের কোঠায় নেমে যেতে পারে না, কেননা তা হলে ঋণদাতা পুঁজিপতির পক্ষে নিজের অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়ার কোনো মানেই থাকবে না।

উচ্চতর ও নিম্নতর এই সীমানাগুলির ভিতরেই ঋণের সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের মধ্যেকার অনুপাত দিয়ে। চাহিদা যত বেশি হবে, ঋণের উপরে দেওয়া সুদের হার তত উঁচু হবে, চাহিদা যত কম হবে, ঋণের সুদের হারও তত নিচু হবে। ঋণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগান ওঠাপড়া করে বলে, ঋণের সুদের হারও ওঠাপড়া করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫১-১৯৫৫ সালে সুদের হার ছিল ৩ শতাংশ, ১৯৭১-১৯৭৫ সালে ৭·৯ শতাংশ, এবং ১৯৭৬-১৯৮০ সালে ৯·৪ শতাংশ। ১৯৮০-১৯৮২ সালে আর্থনীতিক সংকটের চূড়ান্ত অবস্থায় সুদের হার গিয়ে পৌঁছেছিল এক রেকর্ড স্তরে — বছরে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। ১৯৮৩ সালে, সংকট যখন কিছুটা প্রশমিত হয় এবং ঋণের চাহিদা কমে যেতে থাকে, তখন ঋণের সুদের হার নেমে এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

১০-১২ শতাংশে এবং পশ্চিম জার্মানিতে ৭·৫ শতাংশে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজির চাহিদা বিরাট, সেখানে সুদের হার অবধারিতভাবেই উঁচু। তাই, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য প্রদত্ত ঋণের উপরে সুদের হার ১৯৭০-এর দশকে ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে ওঠাপড়া করেছিল।

ঋণের সুদের হার হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের এক চিরবর্ধমান অংশ। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ভিক্তর পেলের করা হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদ প্রদানের ভাগটা ছিল সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের ৩৬·৭ শতাংশ (তুলনীয় — ১৯২৯ সালে ১৩·৮ শতাংশ)। ঋণের সুদ হল ধনকুবেরদের উপযোজিত শত শত কোটি ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কারবারও অত্যন্ত মুনাফাদায়ক, বিশেষত উন্নত দেশগুলির ঋণদাতা পুঁজিপতিদের পক্ষে, যারা ক্রেডিট লেনদেনের মারফৎ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে।

ব্যাংকারের মুনাফা

ব্যাংকগুলি হল ঋণ-পুঁজির বড় বড় কেন্দ্র, সেগুলি কারবার চালায় সব দেশেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে প্রায় ১৩,০০০ ব্যাংক। বড় ব্যাংকগুলি বিপুল অর্থ তহবিল নিয়ে কারবার করে এবং তাদের

বহুসংখ্যক শাখা আছে। পৃথিবীর ৫০০ বৃহত্তম ব্যাংক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের সর্বমোট পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৮২ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ ব্যাংকগুলির অন্যতম — 'সিটিকর্প'-এর পরিসম্পদের মোট পরিমাণ ছিল ১২০ শতকোটি ডলারের বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলির বৃহত্তম ব্যাংক, 'বাংকো দো ব্রাজিল'-এর মোট পরিসম্পদ ২৩ শতকোটি ডলারের বেশি।

বণিক ও শিল্প পুঁজিপতিদের মুক্ত অর্থ তহবিলকে ও জনসমষ্টির অর্থ-সঞ্চয়কে ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীভূত করে। ব্যাংক আমানতকারীদের একটা নির্দিষ্ট সুদ দেয় নিজের সুবিধার্থে এই তহবিল ব্যবহার করার অধিকারের জন্য।

ব্যাংকগুলি শুধু ভল্টে অর্থ রেখে দেয় না। আমানতগুলিকে তারা সুবিধামতো কাজে লাগায় প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে এবং অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কাজ-কারবার চালিয়ে। তারা ঋণ-পরিশোধে মধ্যগ হিসেবে কাজ করে, বন্ড ও অন্যান্য জামানত ছাড়ে ও বিক্রয় করে, ঋণ দেয়, সামরিক ঠিকাগুলির ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার অর্থ-যোগান দেয়, ইত্যাদি। তাদের তহবিলকে কাজে লাগিয়ে তারা মুনাফার তিক্ত সংগ্রামে প্রতিযোগীদের ধ্বংস করে।

ব্যাংক তার আমানতকারীদের যে সুদ দেয়, তার চেয়ে বেশি ঋণের সুদ পায় ঋণদানের জন্য ও অন্য সমস্ত লেনদেনের জন্য। প্রাপ্ত সুদ ও প্রদত্ত সুদের মধ্যেকার পার্থক্যটা হল **ব্যাংকারের মুনাফা**। ১৯৮২ সালে

'সিটিকর্প'-এর ব্যাংকারের মুনাফা গিয়ে পৌঁছেছিল ১·৩ শতকোটি ডলারে। ব্যাংকারের মুনাফা প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি রূপ। ব্যাংক মালিকরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ উপযোজন করে ব্যাংকারের মুনাফার রূপে, এবং তাই তারাও শ্রমিক শ্রেণীর শোষণে অংশ নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের ব্যাংকগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক লেনদেন চালানোর সময়ে বিশেষভাবেই চড়া মুনাফা লাভ করে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে, জাইরে, নাইজেরিয়া, কোট দ্য ওয়ার (আইভরি কোস্ট), ও গাবনে বিদেশী ব্যাংকগুলির লব্ধ মুনাফা প্রায়শই ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় দুই বা তিন গুণ বেশি।

ডিভিডেন্ড

একজন শিল্পপতির মালিকানাধীন ব্যবসায়ের মোট বিনিয়োগের আয় একজন পুঁজিপতির কাছে যায়। একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি (কর্পোরেশন) হল আলাদা ব্যাপার: তার পুঁজির মালিক হল একদল পুঁজিপতি। সেই পুঁজি তোলা হয় শেয়ার (শেয়ারহোল্ডাররা একটি কোম্পানির সম্মিলিত মালিক) ও বণ্ড (বণ্ডহোল্ডাররা হল তার উত্তমর্ণ) বিক্রি করে। অনেকগুলি একক পুঁজি ও ছোট স্টকহোল্ডারদের অর্থ-সঞ্চয় অঙ্গীভূত করে একটি কোম্পানির পুঁজি সংভার আনুষ্ঠানিকভাবে একটিমাত্র সংস্থা হিসেবে সমগ্র জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিটির

সম্মিলিত মালিকানাধীন হয়। প্রতিটি শেয়ার বা স্টক এই ঘটনাটির সাক্ষ্য দেয় যে তার মালিক জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিটির পুঁজির মধ্যে নির্দিষ্ট একটা পুঁজি দিয়েছে। ধরা যাক যে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির পুঁজি হল ১০,০০০ শেয়ারে ভাগ করা দশ লক্ষ ডলার। প্রতিটি শেয়ার পুঁজি সংভারে প্রদত্ত ১০০ ডলারের সাক্ষ্য বহন করে। এইভাবে ১,০০,০০০ ডলার বিনিয়োগকারীকে দেওয়া হয় ১,০০০ শেয়ার, ৫,০০০ ডলার বিনিয়োগকারীকে ৫০ শেয়ার, ইত্যাদি।

কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভাগুলিতে। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার তার মালিকানাধীন সংভারের প্রতিটি শেয়ারের জন্য একটি ভোটের অধিকারী বলে বড় বড় শেয়ারহোল্ডাররাই সমস্ত বিষয়ে নিজেদের স্বার্থ-সাধক সিদ্ধান্ত নেয়। বড় প্রশ্নগুলি মুনাফা বণ্টনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোম্পানির বিনিয়োগের আয় একাধিক অংশে ভাগাভাগি হয়: একটি অংশ বণ্টিত হয় শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে, একটি অংশ বরাদ্দ হয় মজুরি ও বোনাস দেওয়ার জন্য, এবং একটি অংশ বণ্ড বাবদ দেনাপাওনা মেটানোর জন্য। উৎপাদন সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নতুন বিনিয়োগের জন্য, সংরক্ষিত পুঁজি বাড়ানোর জন্য, বিজ্ঞাপন, কর প্রদান, প্রভৃতির জন্যও তহবিল বরাদ্দ হয়।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বরাদ্দ করা মুনাফা তাদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাদের শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী। শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনের জন্য যদি ১,০০,০০০

ডলার বরাদ্দ হয়, তা হলে প্রতিটি ১০০ ডলারের শেয়ারের জন্য তার মালিকের প্রাপ্য হয় মুনাফার ১০ ডলার। ১০ ডলার হল একজন শেয়ারহোল্ডারের প্রতিটি শেয়ার বাবদ তার প্রত্যাগম; একে বলা হয় লভ্যাংশ বা **ডিভিডেণ্ড**। সংভারের ১,০০০ শেয়ারের একজন মালিক ডিভিডেণ্ড পাবে ১০,০০০ ডলার, ৫০ শেয়ারের মালিক পাবে ৫০০ ডলার, ইত্যাদি। এইভাবে ডিভিডেণ্ডকে আমরা শেয়ার বাবদ আয় বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। সারগতভাবে, ডিভিডেণ্ড হল পুঁজিপতি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিবর্তিত রূপ।

শেয়ার ছাড়াও, জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলি বাজারে ছাড়ে বণ্ড — একটি কোম্পানির ঋণের অভিজ্ঞা-পত্র। বণ্ডগুলির একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ থাকে, বণ্ডগুলির অধিকারীরা কোম্পানির উদ্বৃত্ত-মূল্যে ভাগ পাওয়ার অধিকার অর্জন করে। একটা নির্দিষ্ট কালপর্ব শেষ হয়ে গেলে কোম্পানি সেই বণ্ডগুলি আবার কিনে নিতে বাধ্য থাকে।

কোম্পানির ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত উচ্চ বেতন ও বিশেষ বোনাস (tantièmes) হল উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজনের আরেকটি রূপ। বৃহত্তম পুঁজিপতি শেয়ারহোল্ডাররা নিজেদের শীর্ষস্থানীয় অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তথা তাদের পরিবারের সদস্যরা, তাদের ব্যবসায়িক শরিকরা এবং তাদের স্বার্থসেবক মুষ্টিমেয় কয়েকজন উঁচু-তলার কর্মকর্তারা কোম্পানির ভিতরে উচ্চ-বেতনপ্রাপ্ত পদগুলি অধিকার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিকায় কর্পোরেশনগুলির (বিশেষত সমর শিল্পে) প্রেসিডেণ্টদের বা ডিরেক্টরদের বেতন প্রায়শই বছরে ১,০০,০০০ ডলার বা তারও বেশি হয়। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য যে কোনো যুক্তিসহ পারিশ্রমিকের চেয়ে এটা অনেক উঁচু। বড় বড় ব্যবসায়ীরা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানির পুঁজির উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ বাবদ একটা প্রত্যাগম লাভ করে উচ্চ বেতন, বোনাস ও পেনশনের রূপে।

জমির খাজনা

বড় ভূস্বামীরাও উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ দাবি করে। তারাও বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে একটা শোষক শ্রেণী এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ফল তারাও ভোগ করে।

তাদের দাবির ভিত্তিটা কী? ঘটনাক্রমে, জমির বৃহদংশের উপরে একাধিকার রয়েছে বড় ভূস্বামীদের। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটেনে তারা সমস্ত জমির ৭০ শতাংশের পর্যন্ত মালিক। লাতিন আমেরিকায় লাতিফুন্দিয়ার অধিকারে রয়েছে জমির ৮০ শতাংশের বেশি, একেকটি তালুকের আয়তন গড়ে প্রায় ১,২৭০ একর (৫১৪ হেক্টর); এল সালভাদোরে জনসমষ্টির মাত্র ২ শতাংশ হল জমির ৬০ শতাংশের মালিক।

কৃষিতে জমি হল উৎপাদনের প্রধান বৈষয়িক শর্ত ও শ্রমের এক সর্বজনীন উপায়। চাষ-আবাদ ও গবাদি পশুপালন উভয়ের জন্যই তা অপরিহার্য। সুতরাং

একটি কৃষি উদ্যোগ সংগঠিত করতে সক্ষম হতে হলে, পুঁজিপতিকে অবশ্যই এক টুকরো জমি নিতে হবে। সে তা খাজনায় ভাড়া নেয় ভূস্বামীর কাছ থেকে, ভূস্বামী তা খাজনায় ভাড়া দেয় এই শর্তে যে এই কৃষি উদ্যোগটির শ্রমিকদের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হবে তার একটা অংশ সে যেন পায়।

পুঁজিপতি এই শর্ত মেনে নেয়; বস্তুতপক্ষে, তার উপায়ান্তরও নেই। সে যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ ছেড়ে দিতে অসম্মত হয়, তবে ভূস্বামী জমির টুকরোটা তাকে ইজারা দেবে না। আর জমি ছাড়া পুঁজিপতি কৃষি শ্রমিকদের শোষণ করতে পারবে না, তার মানে সে কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য পাবে না।

জমিটা নেওয়ার পর পুঁজিপতি শ্রমিকদের ভাড়া করে এবং উৎপাদন সংগঠিত করে। সে তার কৃষি উৎপাদ উপভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে উৎপাদগুলির মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দামে। দামটা সাধারণত এই স্তরের নিচে নেমে যায় না, কারণ কৃষিতে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিদের সংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা আছে। জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন এবং জমির লভ্যতার উপরে প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা থাকার দরুন, কৃষিতে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিদের সংখ্যা সীমিত থাকে তাদের মধ্যেই, যারা ভূস্বামীদের কাছ থেকে খাজনায় জমির টুকরো ভাড়া নিয়েছে। অন্য আর কোনো জমির টুকরো পাওয়ার উপায় নেই, তাই ঠাঁই নেই অন্য পুঁজিপতিদেরও, যারা বাজারে কৃষিজাত উৎপাদের যোগান বাড়াতে পারত এবং পরস্পরের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করতে পারত। সুতরাং কৃষি-পুঁজিপতিরা তাদের উৎপাদ যথামূল্যে বিক্রি করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু যথামূল্যে উৎপাদ বিক্রি করার অর্থ এই যে সেগুলিতে অঙ্গীভূত সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্য উশুল হয়ে যায়। কৃষিতে নিয়োজিত অস্থির পুঁজির অনুপাতটা বেশি থাকে বলে সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্য গড় মুনাফাকে ছাড়িয়ে যায়। কৃষি-পুঁজিপতি তার উৎপাদ বিক্রি করে শুধু গড় মুনাফাই নয়, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যও অর্জন করে। সে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে তার একটা অংশের উপরে দাবি বসায় ভূস্বামী।

পুঁজিপতি ও ভূস্বামী তিক্ত প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রত্যেকেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃহত্তর অংশটা পেতে চেষ্টা করে। পুঁজিপতি গড় মুনাফার উপরে যেটা উদ্বৃত্ত তার চেয়ে বেশি কিছু ছেড়ে দেবে না। গড় মুনাফার চেয়ে কমে সে রাজী হতে পারে না ও হবে না; সে বরং কৃষিতে বিনিয়োগ না-করে তার পুঁজিকে কৃষি থেকে সরিয়ে নিয়ে অর্থনীতির আরেকটি শাখায়, আরও বেশি মুনাফাদায়ক শাখায় বিনিয়োগ করবে। গড় মুনাফার উপর উদ্বৃত্ত-মূল্যের অতিরিক্তটা সে দিয়ে দিতে পারে কেননা তাতে তার প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে না। তাই, এই উদ্বৃত্ত ভূস্বামীর কাছে চলে যায় **খাজনা**, বা ভাড়ার রূপে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটা ভূস্বামী খাজনা হিসেবে পায় এবং যা সে নিজের ইচ্ছামতো খরচ করে, সেটাই **পুঁজিবাদী জমির খাজনা**; তা হল কৃষি উৎপাদনে

ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন ও পুঁজিপতি উদ্যোগীদের কাছে ইজারায় দেওয়া জমির মালিকদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রায় ১২ শতাংশই যায় জমির খাজনা বাবদ। ১৯২৯ সালে অঙ্কটা ছিল আরও বেশি — ১৬·৬ শতাংশ।

পুঁজিবাদী খাজনা পার্থক্যমূলক ও অনাপেক্ষিক জমির খাজনায় বিভক্ত।

পার্থক্যমূলক খাজনা দেখা দেয় কৃষিতে একক ও গড় মুনাফার মধ্যে পার্থক্যের দরুন। এই পার্থক্য দেখা দেয়, কারণ কৃষি উৎপাদনের দাম অর্থনীতির অন্য সমস্ত শাখার মতো উৎপাদনের গড় অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, খারাপ জমিতে উৎপাদনের অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু শুধু খারাপ জমিই কৃষিজাত উৎপাদের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে না।

সুতরাং একজন পুঁজিপতি যখন গড়পড়তা ও ভালো জমিতে (অর্থাৎ, বেশি উর্বর এবং ভালোভাবে অবস্থিত জমির টুকরোয়) কৃষি উৎপাদন সংগঠিত করে, তখন ভাড়াটে শ্রমিকদের শ্রম বেশি উৎপাদনশীল বলে প্রতিপন্ন হয়। একক ও গড় মুনাফার মধ্যে পার্থক্যটা এইভাবেই ঘটে। তদনুযায়ী, অধিকতর উৎপাদনশীল শ্রমের ফলে উৎপাদনের একক ব্যয় গড়ের চেয়ে কম হয়। এই পার্থক্যটা গড় মুনাফার উপরে একক মুনাফার বৃদ্ধি ঘটায়, অতিরিক্তটা ভূস্বামীর কাছে চলে যায় পার্থক্যমূলক জমির খাজনার রূপে।

অনাপেক্ষিক জমির খাজনা উদ্ভূত হয় কৃষি উৎপাদনের ব্যয় ও দামের মধ্যে পার্থক্যের দরুন। সমস্ত জমিতেই — খারাপ, গড়পড়তা বা ভালো যাই হোক না কেন — উৎপাদনের দাম মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি। অনাপেক্ষিক খাজনা সমস্ত ভূস্বামীরই প্রাপ্য হয়, আর পার্থক্যমূলক খাজনা প্রাপ্য হয় শুধু ভালো ও গড়পড়তা জমির টুকরোগুলির মালিকদের: খারাপ জমিতে তা আদৌ সৃষ্টিই হয় না।

নোংরা ব্যবসায়

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা অহরহই আইন লংঘন করে এবং নৈতিক মান ভঙ্গ করে। ঘুষ, উৎকোচ, জুয়াচুরি আর ফাটকাবাজি কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দুর্বৃত্তদলের লোকজন, ব্ল্যাকমেলকারী ও জবরদস্তি অর্থ আদায়কারীদের সঙ্গে কারবার চালানোর ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা কোনো বিবেকদংশন বোধ করে না। বেশ্যালয় ও জুয়ার আড্ডা থেকে তারা প্রচুর মুনাফা পায়।

পুঁজির পক্ষে মাদকদ্রব্যের চোরা-ব্যবসায় রীতিমতো একটা তেজী কারবার হয়েছে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই লক্ষ লক্ষ মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ও সুখের বিনিময়ে বাড়বাড়ন্ত এই নোংরা ব্যবসায়ের পরিমাণ এক বছরে ৪৫ শতকোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে। গত দুই দশকে কিশোর-কিশোরী মাদকাসক্তদের সংখ্যা বেড়েছে

১৬ গুণ। মাদকদ্রব্য বিক্রেতাদের মুনাফার হার হল ৭০০ শতাংশ।

নোংরা ব্যবসায়গুলিতে বিনিয়োজিত পুঁজি বাবদ মুনাফা বিরাট অঙ্কে গিয়ে পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা হিসাব অনুযায়ী, বেআইনী কার্যকলাপ থেকে প্রতি বছর প্রাপ্ত ১২৫ শতকোটি ডলারের একটা বড় অংশ, তৎসহ আধা-আইনী আর্থনীতিক কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত আরও ১৭৫ শতকোটি ডলার পুঁজিপতিরা ভোগদখল করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও কিছু ব্যবসায়ী এই কাজে যোগ দিয়েছে। ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে আঙ্কারায় তিনজন বড় বড় ব্যবসায়ীর, তুরস্কের ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টদের নামে একটা মামলা হয়েছিল, তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল কালোবাজারে বেআইনী সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন চালানোর জন্য। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তারা মোট ৯০ টন চোরাই সোনা নিয়ে কারবার করেছিল।

শোষকদের স্বার্থের ঐক্য

আমরা দেখেছি, বুর্জোয়া সমাজে উদ্বৃত্ত-মূল্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে: ম্যানুফ্যাকচারারের বিনিয়োগের আয়, বাণিজ্যিক বা বণিকের মুনাফা, ঋণের সুদ, ডিভিডেন্ড, খাজনা, ইত্যাদি। পুঁজিপতিদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করে উপরোক্ত রূপগুলির মধ্যে একটি রূপে। তার রূপ যাই হোক না কেন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের

শেষ গন্তব্যস্থল হল সেই সমস্ত লোকের ভল্ট, যাদের জীবিকার্জনের জন্য কাজ করতে হয় না, যারা শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের বিনিময়ে বাঁচে এবং সেই হেতু শ্রমিকদের এক বৈরি শক্তি।

যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস একটিই — শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম, সেই হেতু এটা স্বপ্রকাশ যে উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রাপক পুঁজিপতিদের সকল গোষ্ঠীই শ্রমিকদের শোষণে অংশভাগী। শোষণ নিবিড় করার জন্য, তাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় তোলার জন্য তাদের প্রয়াসে তারা একটিমাত্র মোর্চা হিসেবে কাজ করে। শ্রমিকদের মৌল অধিকারগুলির উপরে হস্তক্ষেপ করা, উন্নয়নশীল জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করা, বুর্জোয়া ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য লড়াই করায় তাদের সকলের সমান স্বার্থ রয়েছে।

পুঁজিপতিরা একটিমাত্র জোট হিসেবে, শোষকদের শ্রেণী হিসেবেই প্রলেতারিয়েতের প্রতিপক্ষে দাঁড়ায় বলে, প্রলেতারিয়েতকে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্য অবশ্যই তার পংক্তিতে ঐক্য ও সংসক্তি রক্ষা করতে হবে। একমাত্র তা হলেই প্রলেতারিয়েত সক্ষম হবে তার অবস্থানগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য উচ্ছেদ করতে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব

কার্ল মার্কস উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বুনিয়াদী মতশিক্ষাগুলি

ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর এই সমস্ত বিশিষ্ট রচনায়: 'পুঁজি'; 'উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব'; 'মজুরি শ্রম ও পুঁজি'; 'মজুরি, দাম, মুনাফা', এবং অন্য আরও কতকগুলি রচনায়।

প্রাক-মার্কসীয় চিরায়ত অর্থশাস্ত্রে যেখানে বেশির ভাগই মুনাফার বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল, সেখানে মার্কস আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন। পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের অর্জিত আয়ের অসংখ্য বাহ্যিক রূপের পিছনে তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন অভিন্ন অন্তর্বস্তুটিকে — উদ্বৃত্ত-মূল্য। অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কসই সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত-মূল্যের সারমর্ম উন্মোচন করেন।

মার্কসের মহত্তম অবদান হল শ্রম ও শ্রমশক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদন। এর ফলেই মার্কস উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে ও পুঁজিবাদী শোষণের প্রকৃতি উন্মোচন করতে পেরেছিলেন। মার্কস উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎসটি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার উদ্ভব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মার্কসের রচনাগুলিতে, বিশেষত 'পুঁজি'-তে, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পরীক্ষা করা হয়েছে এক গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নিয়ত বাড়ানোর প্রয়াস করে। তিনি পুঁজিবাদী শোষণ নিবিড় করার উপায়-পদ্ধতির রূপরেখা উপস্থিত করেছিলেন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনসম্পদ ও আর্থনীতিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তার ব্যবহার বর্ণনা করেছিলেন।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের বিশ্লেষণ থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে মার্কস ইতিহাসে সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়মটি সূত্রবদ্ধ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এটিই হল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বুনিয়াদী আর্থনীতিক নিয়ম। তিনি লিখেছেন: 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের চালিকাশক্তি, অভীষ্ট ও লক্ষ্য হল সম্ভাব্য বৃহত্তম পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়া, এবং ফলত, সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় শ্রমশক্তি শোষণ করা।'*

উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব মানবজাতির উপকারে এক বিপুল অবদান। সমাজের বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের মততন্ত্রে তার স্থান অতি উচ্চে। লেনিনের ভাষায়, 'উদ্বৃত্ত-মূল্যের মতবাদ হল মার্কসের আর্থনীতিক তত্ত্বের মূলভিত্তি।'** মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব পুঁজিবাদী উৎপাদনের বুনিয়াদী নীতিগুলিকে প্রকাশ করে, বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বৈরমূলক দ্বন্দ্বগুলির কারণ দেখায় এবং প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার ভাবাদর্শবিদরা মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পায় বুর্জোয়া

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 311.

** V. I. Lenin, 'The Three Sources and Three Component Parts of Marxism', *Collected Works*, Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 26.

শাসনের পক্ষে এক বিপদকে। তাঁর তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বুর্জোয়া সাফাই-গাইয়েরা তার বিরোধিতা করেছিল, নিজেদের অবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলিকে তারা মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের বিপ্রতীপে স্থাপন করেছিল। আমরা লক্ষ করেছি, এই সমস্ত বুর্জোয়া মতবাদকে সেগুলির রচয়িতারা ব্যবহার করে থাকেন মুনাফার প্রকৃতি ও উৎসগুলিকে গোপন করে রাখার জন্য, তার শোষণমূলক সারমর্ম ঢেকে রাখার জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য, এবং এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী স্বার্থগুলির একটা সমন্বয় রয়েছে। জীবন এই মর্মে নতুন নতুন প্রমাণ উপস্থিত করে যে মুনাফা সম্বন্ধে বুর্জোয়া মতবাদগুলি অসংগতিপূর্ণ এবং মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব; শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তা একটা শক্তিশালী অস্ত্র।

অধ্যায় ৭

একচেটিয়া আধিপত্য: উৎপাদনের উপরে তার ফল-প্রভাব ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপযোজন

১৯শ শতাব্দীর শেষে এবং ২০শ শতাব্দীর গোড়ায় পুঁজিবাদ প্রবেশ করেছিল তার সর্বশেষ, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান অনুগামী লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।

উৎপাদন প্রণালী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। ইতিমধ্যে, কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্যও গড়ে ওঠে। সেই নতুন মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ: (১) উৎপাদনের উচ্চ কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়া সংস্থাগুলির গঠন; (২) ফিনান্স পুঁজি ও ধনকুবেরতন্ত্র সৃষ্টির জন্য একচেটিয়া ব্যাংকিং পুঁজি ও শিল্প পুঁজির মিলন; (৩) পুঁজি রপ্তানি; (৪) পুঁজিপতিদের একচেটিয়াধর্মী

জোটগুলির মধ্যে পৃথিবীর আর্থনীতিক বিভাজন; এবং (৫) পৃথিবীর অঞ্চলগত বিভাজন সম্পূর্ণ করা।

আগেকার মতোই, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য হল সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়া। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশলাভ করে সেগুলি উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন ও বণ্টনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ঘটায়। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পরিসরে ও প্রলেতারিয়েতের উপরে পুঁজিবাদী শোষণের মাত্রায় বিরাট বৃদ্ধি ঘটে।

একচেটিয়া আধিপত্য

সাম্রাজ্যবাদে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ও উপযোজনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয় একচেটিয়া আধিপত্যের দ্বারা; বস্তুতপক্ষে, একচেটিয়া সংস্থাগুলিই পুঁজিবাদী দেশগুলির আর্থনীতিক জীবনকে আকৃতি দেয় এবং প্রচণ্ড আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়।

একটি একচেটিয়া সংস্থা যথার্থই এক অতিকায় পুঁজিপতি। তা বিপুল পুঁজির বিলি-বন্দোবস্ত করে এবং বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে শোষণ করে। মার্কিন তেল কর্পোরেশন 'এক্সন' হল পৃথিবীর বৃহত্তম একচেটিয়া সংস্থাগুলির অন্যতম। তার বার্ষিক কারবার ১০০ শতকোটি ডলারের বেশি। অন্যান্য অতিকায় একচেটিয়া সংস্থার মধ্যে আছে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'মোবিল অয়েল' ও 'জেনারেল মোটরস' (বার্ষিক কারবার ৫০

শতকোটি ডলারের বেশি), ব্রিটেনে 'ব্রিটিশ পেট্রলিয়ম', জাপানে 'টয়োটা জিদেশে কোগিও', পশ্চিম জার্মানিতে 'ফোলকসভাগেনভেৰ্ক', ইতালিতে 'ই এন আই'। একচেটিয়া সংস্থাগুলি কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতেও ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করতে শুরু করছে। ১৯৮১ সালেই, ৫০০টি প্রধান শিল্প একচেটিয়া সংস্থার মধ্যে ১৮টি ছিল লাতিন আমেরিকার ছয়টি উন্নয়নশীল দেশ থেকে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির আর্থনীতিক ক্ষমতা সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয় এই ঘটনার দরুন যে তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এক বা একাধিক শিল্পে উৎপাদনের একটা বড় অংশ। উদ্ভাবন ও নবোদ্ভাবনাগুলি রূপায়ণে এবং দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যই চূড়ান্ত। বাজারের উপরে তারা আধিপত্য করে এবং পুরো-তৈরি সামগ্রীগুলি বিপণনের শর্ত তারাই নির্দিষ্ট করে দেয়। যেখানে ১৬,৬৫,০০০-এরও বেশি ব্যবসায় আছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত তৈরি সামগ্রীর ৪৩ শতাংশ যোগায় মাত্র ২০০টি একচেটিয়া সংস্থা। মেক্সিকোয় ৫০টি অর্থ-শিল্প কর্পোরেশন বৃহত্তম উদ্যোগগুলির ৩০০টিকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের মোট জাতীয় উৎপাদের ৪৫ শতাংশ আসে এই উদ্যোগগুলি থেকে।

গোড়ার দিকে, একটি একচেটিয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হত একটি শিল্পের অভ্যন্তরে কয়েকজন একক পুঁজিপতির একটি জোটের দ্বারা। আজ, পরাক্রমশালী একচেটিয়া পরিমেলগুলি গঠিত হয় একাধিক শিল্পকে বেষ্টন করে। ২০শ শতাব্দীর শুরুতে একটিমাত্র

একচেটিয়া সংস্থা ছিল যার পুঁজি ছিল এক শতকোটি ডলার; শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রকম একচেটিয়া সংস্থা ছিল চারটি; আর ১৯৮২ সালে, 'শতকোটি-ডলার ক্লাবে' ছিল ৭৩০টি পরিমেল।

একচেটিয়া দাম

জাতীয় অর্থনীতির উপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণহেতু, একচেটিয়া সংস্থাগুলি দাম নিয়ে এমনভাবে কারচুপি করতে পারে, যাতে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করা যায়।

একচেটিয়া দাম দুই ধরনের। প্রথমটি হল, একটি একচেটিয়া সংস্থা যে দামে তার উৎপাদ বিক্রি করে; উৎপাদন-ব্যয় ও উৎপাদটির মূল্যের চেয়ে তা সব সময়েই বেশি হয়। দ্বিতীয়টি হল, একটি একচেটিয়া সংস্থা যে দামে কাঁচামাল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় পণ্য কেনে — এই দামটা পণ্যগুলির সামাজিক মূল্যের চেয়ে সব সময়েই কম হয়।

একটি সংস্থা একটি বিশেষ শিল্পে একচেটিয়া অবস্থান লাভ করলে, এই শিল্পে সে-ই ইচ্ছামতো দাম নির্দিষ্ট করে। তার প্রথম পদক্ষেপটি হল তার নিজের উৎপাদের বাজার দাম বাড়ানো। সেই সঙ্গে, সে যেসব পণ্য কেনে সেগুলির ক্রয়-দাম সে কমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। আর্থনীতিকভাবে দুর্বল জাতিগুলি ও ক্ষুদ্র উৎপাদকরা যেসব সামগ্রী রপ্তানি করে সেগুলির জন্য তাদের উপরে দামের নিচু স্তর চাপিয়ে দেয় একচেটিয়া সংস্থাগুলি। দামের যন্ত্রপ্রণালীটিকে একচেটিয়া

সংস্থাগুলি কাজে লাগায় দ্বিগুণ মুনাফা আদায় করে নেওয়ার জন্য — ক্রয় বাবদ ও বিক্রয় বাবদ: নিচু একচেটিয়া দামে ক্রয়কারী এক উপভোক্তা হিসেবে এবং উঁচু একচেটিয়া দাম-হাঁকা এক বিক্রেতা হিসেবে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি নিজেদের জন্য সবচেয়ে মুনাফাদায়ক স্তরে বাজার দাম স্থির করে, তাদের শরিকদের উপরে তা চাপিয়ে দেয়।

কিন্তু এ কাজে তারা সফল হয় কেন?

প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদে, প্রত্যেক ক্রেতা বহু বিক্রেতার সম্মুখীন হত। যে ক্রেতা একটি বিশেষ সামগ্রী চাইত সে সেটি কিনতে পারত একজন নির্দিষ্ট বিক্রেতার কাছ থেকে, কিংবা দামটা অত্যন্ত বেশি হলে, এই বিক্রেতার একজন প্রতিযোগীর কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত, সে যা চাইত সেটা কিনতে পারত। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দামের ওঠাপড়া ঘটাত; সুতরাং বাজারের অবস্থার সঙ্গে দাম মানিয়ে নেওয়াটাকেই পুঁজিপতিরা লাভজনক মনে করত।

সাম্রাজ্যবাদে সব কিছু একেবারে আলাদা। অধিকাংশ পণ্যোৎপাদন সম্পূর্ণরূপে একচেটিয়া সংস্থাগুলির করায়ত্ত বলে তারাই উপভোক্তাদের শর্ত নির্দেশ করে দেয়। প্রতিটি ক্রয়ের সময়ে একজন ক্রেতা একটি একচেটিয়া সংস্থার দ্বারা বিক্রীত পণ্যগুলির সম্মুখীন হয়। একচেটিয়া সংস্থাটি তার উৎপাদের দাম কমাবে না, কেননা সেটা হবে সর্বাধিক মুনাফা লোটার লক্ষ্যের বিরোধী। তাই ক্রেতাকে হয় সেই সামগ্রীগুলি একচেটিয়া সংস্থাটির কাছ থেকে কিনতেই হবে, না হয়

সেগুলি বাদ দিয়েই কাজ চালাতে হবে। অর্থাৎ, একচেটিয়া সংস্থাটির ধার্য দামটি দিয়ে তাকে পণ্যটি কিনতে হবে চড়া একচেটিয়া দামে।

একটি একচেটিয়া সংস্থার কাছে বিক্রেতাও একই রূপ পরিস্থিতিতে পড়ে। তাকে হয় তার উৎপাদ বিক্রি করতে হবে নিচু একচেটিয়া দামে, না হয় বিক্রয়টি ঘটবেই না, এবং নিজের উৎপাদটি উশুল করতে না পেরে বিক্রেতা সর্বস্বান্ত হবে। সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কাই তাকে একচেটিয়া সংস্থার চাপের কাছে নতিস্বীকার করায় এবং তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া নিচু একচেটিয়া দাম মেনে নিতে বাধ্য করে।

বাজার দাম একচেটিয়া স্তরে রাখার জন্য একচেটিয়া পরিমেলগুলি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে, এক দিকে, বাজারে মালের প্রবেশ সীমিত করে, ও অন্য দিকে, এই সমস্ত মালের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তারা বিদেশী পণ্যের আমদানির উপরে প্রতিবন্ধক চাপায়। ক্রেডিটে ক্রয়কে বিরাটভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। সরকারি ঠিকা (বিশেষত সমর শিল্প ক্ষেত্রে) আরও বৃহত্তর মাত্রা অর্জন করে। এই সমস্ত বিষয়ের দরুন, একচেটিয়া সংস্থাগুলি সবচেয়ে মুনাফাদায়ক স্তরে দাম বজায় রাখতে পারে এবং অতিরিক্ত চড়া মুনাফা অর্জন করে।

একচেটিয়া মুনাফা

চড়া একচেটিয়া দামে পণ্য বিক্রি করে একটি একচেটিয়া সংস্থা প্রভূত আর্থিক সামর্থ্য লাভ করে।

সর্বপ্রথম তার একাংশটা যায় উৎপাদন-ব্যয় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য। অবশিষ্টাংশ হল এই একচেটিয়া সংস্থাটির মুনাফা, বা **একচেটিয়া মুনাফা।**

একচেটিয়া মুনাফা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দিয়ে গঠিত। প্রথমটি হল গড় মুনাফা। সমস্ত একচেটিয়া সংস্থারই তা প্রাপ্য হয় সেগুলির পুঁজিবাদী প্রকৃতির কল্যাণে। সমস্ত পুঁজিপতির জন্যই তা হিসাব করা হয় আগাম দেওয়া পুঁজির পরিমাণের উপরে। দ্বিতীয় উপাদানটি হল তার বাড়তি বা অতিরিক্ত মুনাফা। একটি একচেটিয়া সংস্থার এটা প্রাপ্য হয় উৎপাদনের সামাজিক ও একক দামের মধ্যে পার্থক্যের দরুন, এই পার্থক্যটা আবার শিল্পোদ্যোগগুলিতে অর্জিত গড় শ্রম-উৎপাদনশীলতা থেকে উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতার ফল। তৃতীয় উপাদানটি হল একচেটিয়া অতি-মুনাফা। তা উদ্ভূত হয় একচেটিয়া দাম ও উৎপাদনের দামের মধ্যেকার পার্থক্য হিসেবে। তার নিম্নতর সীমা হল উৎপাদনের দাম; তার উচ্চতর পরিমাণটা সাধারণত উৎপাদের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়।

একচেটিয়া অতি-মুনাফায় অঙ্গীভূত হয় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহের দ্বারা সৃষ্ট ও উপযোজিত অতিরিক্ত মুনাফা। সারগতভাবে তা হল আর্থনীতিকভাবে রূপায়িত একচেটিয়া আধিপত্য ও একচেটিয়া পুঁজির বাধাবন্ধহীন ক্ষমতা। লেনিনের ভাষায়, 'একচেটিয়া জন্ম দেয় **অতি-মুনাফার,** অর্থাৎ,

যেসব পুঁজিবাদী মুনাফা সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাভাবিক ও প্রথাগত তার উপরে মুনাফার একটা উদ্বৃত্তের।'*

তাই একচেটিয়া মুনাফা গড় মুনাফার অনেক উঁচুতে, একটি অ-একচেটিয়াকৃত সংস্থার মুনাফার কথা তো বলাই বাহুল্য। পুঁজিপতিদের একচেটিয়া পরিমেলগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদনের সমস্ত মুনাফার সিংহভাগটি লাভ করতে সক্ষম। তাই ১৯৭৮ সালে, প্রত্যেকটির ১ শতকোটি ডলারের বেশি পুঁজিসংভার আছে এমন ৬২৯টি অতিকায় একচেটিয়া সংস্থা মোট কর্পোরেশন মুনাফার ৫৯ শতাংশ পেয়েছিল। তাদের মুনাফার হার ছিল ১ কোটি ডলারের কম পুঁজিসংভার বিশিষ্ট কর্পোরেশনগুলির মুনাফার হারের চেয়ে ২ থেকে ৩ গুণ বেশি। সমর শিল্পে একচেটিয়া সংস্থাগুলির মুনাফার হার বিশেষভাবেই উঁচু।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি প্রলেতারিয়েতের উপরে শোষণ তীব্র করে

একটি একচেটিয়া সংস্থার অতি-মুনাফার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল শ্রমিক শ্রেণীর উপরে অভূতপূর্ব শোষণ।

একটি একচেটিয়া সংস্থা তার আর্থনীতিক ক্ষমতার

* V. I. Lenin, 'Imperialism and the Split in Socialism', *Collected Works*, Vol. 23, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 114.

দরুন তার উদ্যোগগুলিতে শোষণ নিবিড় করে তুলতে পারে সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায়। একচেটিয়া পুঁজি অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করার সবচেয়ে পরিশীলিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে। শ্রমিক শ্রেণীর উপরে আর্থনীতিক চাপ বেড়ে চলে। একটি একচেটিয়া সংস্থা যে কোনো অ-একচেটিয়াকৃত, প্রতিযোগী পুঁজিবাদী সংস্থার চেয়ে বেশি ওভারটাইম কাজের পরিকল্প ব্যবহার করে। তাদের উদ্যোগগুলির শ্রম-নিবিড়তা সর্বাধিক এবং সেগুলি প্রয়োগ করে নির্মমতম শ্রম নিংড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। শোষণ নিবিড় করার জন্য একটি একচেটিয়া সংস্থা আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সাংগঠনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নির্মম শোষণ চালিয়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি অ-একচেটিয়াকৃত প্রতিযোগী সংস্থাগুলির চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে। একজন একচেটিয়াপতিকে অন্যান্য পুঁজিপতির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য ভাগ করে নিতে হয় না। একচেটিয়া আধিপত্য সমস্ত শিল্পের মধ্যে মুনাফা সমানীকরণের প্রক্রিয়ার ভিতরে এই উদ্বৃত্ত-মূলকে আকৃষ্ট করার পথরোধ করে। একচেটিয়া দাম-স্থিরীকরণের সাহায্যে একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যকে উশুল ও উপযোজন করতে পারে, এবং এইভাবে নিজেদের আর্থনীতিক পরাক্রম ও অন্যান্য অ-একচেটিয়াকৃত সংস্থার উপরে শক্তিপ্রাবল্য বাড়িয়ে তুলতে পারে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ায়

একচেটিয়া সংস্থাগুলি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন অনেকখানি বাড়ায়। নিজেদের হাতে প্রভূত আর্থিক সংস্থান কেন্দ্রীভূত করে তারা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাবদ ব্যয়ে ক্ষুদ্র ও গড়পড়তা ব্যবসায়ীদের তাৎপর্যপূর্ণভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়; গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণে তারা থাকে পুরোভাগে।

বর্তমানে, বিস্তৃত গবেষণা প্রকল্পগুলির অর্থ-যোগানের মতো আর্থিক ক্ষমতা আছে একমাত্র একচেটিয়া সংস্থাগুলিরই। লক্ষণীয় যে প্রথম প্রজন্মের রঙিন টিভি সেটের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ধারাবাহিক উৎপাদনের জন্য খরচ হয়েছিল ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। আজ, এক নতুন প্রজন্মের কম্পিউটরের বিকাশসাধনের জন্য দরকার হয় এক অবিশ্বাস্য অঙ্ক — ৭৫ কোটি ডলার। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ বাবদ বেশি ব্যয় করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি সক্ষম হয় ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কাজে লাগাতে এবং বেশি আধুনিক পদ্ধতি ও সাংগঠনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করতে।

প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ফলে শ্রম-উৎপাদনশীলতায় সুবিধা দেখা দেয়। তাই বড় বড় মার্কিন প্রসেসিং শিল্পোদ্যোগে শ্রম-উৎপাদনশীলতা ছোট শিল্পোদ্যোগগুলির তুলনায় ১·৫ গুণ বেশি। সুতরাং একটি অ-একচেটিয়াকৃত সংস্থার তুলনায় একটি

একচেটিয়া সংস্থা অনেক বেশি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি নিয়ত তাদের ধনসম্পদ বাড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদের আগে পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করত সাময়িক ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ত সর্বাধিক মাত্রায় পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে; তাই তারা কৃৎকৌশলগত প্রগতির ফলগুলিকে জবরদখল করার চেষ্টা করে। তাদের আধিপত্যমূলক অবস্থানের কল্যাণে, তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রধান কৃতিত্বগুলিকে একাধিকারে রাখে। তাদের প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে জানার যে কোনো চেষ্টার পথরোধ করে তারা। এটা করে তারা দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে এবং ফলত, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের সুবিধাটা নিশ্চিত করে।

একচেটিয়া অতি-মুনাফা ও তার উৎস

প্রত্যেক একচেটিয়া সংস্থারই লক্ষ্য হল অতি-মুনাফা লাভ করা। এই লক্ষ্য মনে রেখে একচেটিয়া সংস্থাগুলি অর্থনীতিতে তাদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের একটা অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে ও রক্ষা করে। অতি-মুনাফাই তাদের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও অ-একচেটিয়াকৃত সংস্থার উপরে শ্রেষ্ঠত্বের উৎস।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি স্বদেশে ও বিদেশে যে

মাত্রাতিরিক্ত শোষণ চালায় তার ফলগুলিকে প্রকট করে তোলে একচেটিয়া অতি-মুনাফা। একচেটিয়া অতি-মুনাফা হল লুণ্ঠন, বলপ্রয়োগ ও হিংসার পরিপূর্ণ রূপ। একচেটিয়া অতি-মুনাফা হল একচেটিয়াবাদী পরিমেলগুলির সর্বমোট মুনাফার একটা বড় অঙ্গীয় অংশ। তার গঠনবিন্যাস ও উৎসগুলি পরীক্ষা করলে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন সর্বমোট একচেটিয়া মুনাফা এত বেশি হয় যে তা গড় মুনাফা ও আলাদা আলাদা একচেটিয়াকৃত উদ্যোগে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়।

একচেটিয়া অতি-মুনাফা অনেকগুলি বড় বড় অঙ্গ-উপাদান দিয়ে গঠিত।

একটি হল একচেটিয়া উদ্যোগগুলিতে ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য। এই বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা শ্রমিকদের উপরে বিরাটভাবে নিবিড়কৃত শোষণের ফল। অ-একচেটিয়াকৃত অন্যান্য সংস্থার চেয়ে এ শোষণ আরও অনেক বেশি নির্মম ও কঠোর। ফলত, আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে বার করা হয়। এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটাই যায় একচেটিয়া সংস্থাগুলির কাছে: অন্যান্য পুঁজিপতির সঙ্গে তা তাদের ভাগ করতে হয় না।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি নিছক উদ্বৃত্ত-মূল্যের চেয়েও বেশি কিছু চায়। তাদের ভাড়াটে শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের একটা অংশ তারা কেড়ে নেয়। এটা অর্জিত হয় শ্রমশক্তির মূল্য আর শ্রমশক্তির মালিক মজুরি শ্রমিকদের প্রদত্ত মজুরির মধ্যেকার

ব্যবধান নিয়ত বাড়িয়ে। একচেটিয়া সংস্থাগুলি খোলাখুলিভাবেই শ্রমিকদের মৌল স্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ করে। মজুরি স্থির করার সময়ে একচেটিয়াপতিরা শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারগুলির জীবনধারণের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কথাও গণ্য করে না, নিয়ত নিবিড়কৃত শ্রমের ফলে শ্রমিকদের যে ক্রমবর্ধমান কায়িক ও মানসিক শক্তিব্যয় হয় তাও গণ্য করে না। মুদ্রাস্ফীতির জন্য কোনো রেয়াত দেওয়া হয় না, যদিও মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াগুলি শ্রমিকদের অবস্থানের উপরে সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতপক্ষে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি শ্রমিকদের বাধ্য করে আর্থনীতিক সংকটের আসল বোঝাটা বহন করতে।

উপভোক্তা হিসেবে শ্রমিকদের উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি। চড়া একচেটিয়া দামের মধ্য দিয়ে তারা শ্রমিকদের মজুরির বৃহত্তর অংশ কেটে নেয়। খাদ্য, জামা-কাপড়, জুতো ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর দাম নিত্যই বেড়ে যায়। আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসাগত সাহায্যের খরচ বছরের পর বছর বেড়ে চলে একচেটিয়াকৃত ও প্রতিযোগী সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। সব শ্রমিকই সমানভাবে বাধ্য হয় একচেটিয়া লুঠেরাদের সুবিধার্থে নিজেদের মজুরির একাংশ দিয়ে দিতে, এবং এইভাবে একচেটিয়া অতি-মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে।

একচেটিয়া দাম-নির্ধারণের ফলে অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগে মজুরি শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ একচেটিয়া সংস্থাগুলি উপযোজন করে। উদ্বৃত্ত-

মূল্যের এই পুনর্বণ্টনের সঙ্গে বোধগম্যভাবেই চলে এক তিক্ত প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম, যে সংগ্রামে একচেটিয়া সংস্থাগুলিই অবধারিতভাবে বিজয়ী হয়। একচেটিয়া দাম-নির্ধারণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি বণিক ও ঋণদাতা পুঁজিপতিদের তথা ভূস্বামীদের দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশও নিজেদের দিকে টেনে নিতে সমর্থ হয়। এখানে যেটা ঘটে তা এই যে প্রবলতর শোষক দুর্বলতর শোষকের কাছ থেকে তারই একটা অংশ ডাকাতি করে কেড়ে নেয় যা শেষোক্তজন শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে, অথবা 'শঠ চুরি করছে শঠের কাছ থেকে'।

একচেটিয়া অতি-মুনাফার একটা অংশ আসে শহরের ও গ্রামের ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের শ্রম-ফলের একাংশ উপযোজন থেকে। তাদের মৌলস্বার্থের উপরেও একচেটিয়া সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করে। একচেটিয়া দাম-নির্ধারণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি কৃষক ও কারিগরদের ঠকায় দুদিক দিয়েই — তাদের উৎপাদ ক্রয়ে এবং নিজেদের উৎপাদ বিক্রয়ে। কালক্রমে, দামের ব্যবধান বেড়ে চলে। ফলে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদের মূল্য এবং আবশ্যকীয় উৎপাদের মূল্যের এক ক্রমবর্ধমান অংশও পায় একচেটিয়া সংস্থাগুলি।

একচেটিয়া অতি-মুনাফার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল আর্থনীতিকভাবে দুর্বল, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির উপরে শোষণ। এখানে তাদের কার্যকলাপ বিশেষভাবেই অন্যায্য ও নির্মম। সেই সব দেশের প্রলেতারিয়েতকে শোষণ করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি

প্রচুর উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেয়। তারা মুনাফা করে সস্তা শ্রম-বাহিনী থেকে এবং মজুরির বিদ্যমান নিম্ন স্তর থেকে। ন্যায়বিচারহীন বিনিময়, পুঁজি রপ্তানি, অন্যায্য ক্রেডিট ও আর্থনীতিক চুক্তি এবং অন্য বহু পদ্ধতির (পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) মধ্য দিয়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিপুল মুনাফা লোটে।

তাই, একচেটিয়া বুর্জোয়াদের প্রাপ্ত সব ধরনের মুনাফাই একচেটিয়া মুনাফার অন্তর্গত। তার শিকড় রয়েছে অর্থনীতিতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির বাধাবন্ধহীন আধিপত্য আর সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ও আর্থনীতিকভাবে পরাধীন দেশগুলির জনসমষ্টির বৃহদংশের উপরে নির্মম শোষণের মধ্যে। সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজে আর্থনীতিক সম্পর্কের জটিল ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে একচেটিয়া মুনাফার মধ্যে। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত হল, প্রথমত, একচেটিয়া বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার সম্পর্ক, অর্থাৎ এক দিকে, একচেটিয়া বুর্জোয়া ও অন্য দিকে, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদক, পরাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ ও অ-একচেটিয়াকৃত পুঁজিপতিদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং অতি-মুনাফার জন্য সংগ্রামরত একচেটিয়া সংস্থাগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও তাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কও এর অন্তর্ভুক্ত।

একচেটিয়া মুনাফার চরিত্র ও উৎসগুলি বিশ্লেষণ করলে একচেটিয়া সংস্থাগুলির সত্যিকার শোষণমূলক, জনবিরোধী সারমর্ম প্রকাশ পায়। আজ তারাই হল

শ্রমিক শ্রেণীর ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পয়লা নম্বর শত্রু।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি ও গড় মুনাফা

সাম্রাজ্যবাদে প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া আধিপত্য এটা বোঝায় না যে সমস্ত ব্যবসায়ই একচেটিয়া সংস্থাগুলির অন্তর্গত হয়। একচেটিয়া সংস্থাগুলি ছাড়াও আছে হাজার হাজার অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সেগুলির সংখ্যা বিশেষভাবেই বেশি। সেগুলির মালিক হল ক্ষুদ্র বা গড়পড়তা পুঁজিপতিরা। সাম্রাজ্যবাদের আগেকার দিনগুলির মতোই তাদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন ঘটে গড় মুনাফার নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ আগাম দেওয়া পুঁজির প্রত্যক্ষ অনুপাতে: আগাম দেওয়া পুঁজি যত বেশি, মুনাফাও তত বেশি।

কিন্তু, একচেটিয়া আধিপত্য উদ্বৃত্ত-মূল্য বণ্টনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন এনে দেয়। একচেটিয়া সংস্থাগুলি মোট পুঁজিবাদী মুনাফার সিংহভাগ উপযোজন করে। মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়গুলি এটা প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই, একচেটিয়া সংস্থাগুলির কাছে তাদের উৎপাদ বিক্রয় থেকে এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয় উৎপাদ ক্রয় থেকে তাদের আয়ের একটা বড় অংশ একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে পেতে দেয়। একচেটিয়া সংস্থাগুলি অন্যান্য ব্যবসায়কে মুনাফাদায়ক

শিল্পগুলিতে ও পুঁজি বিনিয়োগের মুনাফাদায়ক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না, তাদের সীমাবদ্ধ করে রাখে মুনাফার নিম্ন হারবিশিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে।

তা হলে এটাই দাঁড়ায় যে একচেটিয়া আধিপত্যের ফলে অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগগুলির দ্বিবিধ লোকসান হয়। প্রথম, অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্য এখানে একচেটিয়া সংস্থাগুলির তুলনায় কম, খরচ একই। দ্বিতীয়, এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা বড় অংশ একচেটিয়া পরিমেলগুলির দ্বারা উপযোজিত হয়। ফলে, সর্বমোট মুনাফায় অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগগুলির ভাগটা তাদের সর্বমোট আগাম দেওয়া পুঁজির ভাগের চেয়ে অনেক কম। তার মানে এই যে ক্ষুদ্র বা মাঝারি পুঁজির একটি একক একচেটিয়া পুঁজির একটি এককের তুলনায় অনেক কম মুনাফার প্রত্যাগম ঘটায়। জাতীয় অর্থনীতির একচেটিয়াকৃত ও অ-একচেটিয়াকৃত ক্ষেত্রগুলির পরিমাণগতভাবে পৃথক মুনাফার গড় হারের কারণ এটাই; মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে মুনাফার গড় হার একচেটিয়া সংস্থাগুলির তুলনায় অনেকখানি নিচে।

এর মানে কি এই যে মূল্যের নিয়মটি সাম্রাজ্যবাদে ক্রিয়া করে না? নিশ্চয়ই নয়।

বস্তুতপক্ষে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি মুনাফা অর্জন করে মূল্যের নিয়মের বিরুদ্ধে নয়, বরং মূল্যের নিয়মের ভিত্তিতেই। পুঁজিপতিদের সমগ্র শ্রেণীটির দ্বারা উপযোজিত সর্বমোট মুনাফা বিবেচ্য সমগ্র অর্থনীতির

দ্বারা উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান। পুঁজিবাদী অর্থনীতি জুড়ে মূল্যের নিয়মই পণ্যের দামের মোট অঙ্ক নির্ধারণ করে চলে। একচেটিয়া দাম-নির্ধারণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি যেটা লাভ করে, অবশ্যম্ভাবীরূপে সেটাই হারায় শিল্প শ্রমিকরা, কৃষকরা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা।

অধ্যায় ৮

ফিনান্স পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক ক্রমবর্ধমান অংশ অর্জন করে

ফিনান্স পুঁজির বাধাবন্ধহীন ক্ষমতা

মুনাফার্জনের তাড়নায় একচেটিয়া শিল্পগুলি নিছক উৎপাদনী কাজকর্মের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না। তারা ব্যাংকিংয়ে বিরাট বিনিয়োগ করে, এবং এইভাবে শক্তিশালী ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থা স্থাপনে সাহায্য করে। শেষোক্তগুলি আবার তাদের দিক দিয়ে শিল্পোৎপাদনে অনেক বিনিয়োগ করে। এইভাবে শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া পুঁজি পরস্পরের মধ্যে আরও গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত জমাট বেঁধে জন্ম দেয় **ফিনান্স পুঁজির**। শেষোক্তটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। সেগুলিকে তা করে তোলে নিজের ক্ষমতার ও সীমাহীন মুনাফাসন্ধানের অধীন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও নতুন একটা

বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকে মদত দেওয়ার ব্যাপারে ফিনান্স পুঁজি বিশেষভাবে সক্রিয়।

ফিনান্স পুঁজি কাজ করে **আর্থিক একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির** রূপে, এই প্রতিটি গোষ্ঠীই এক-একটি বিরাট আর্থিক সাম্রাজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ থেকে ২৫টি ধনকুবেরতান্ত্রিক গোষ্ঠী আধিপত্যমূলক অবস্থানের অধিকারী। বৃহত্তমটি হল মর্গ্যান গোষ্ঠী; ১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগে এই গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করত ২৫৪·৪ শতকোটি ডলার পুঁজি। রকফেলার গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করত ১৬৩·২ শতকোটি ডলারের পরিসম্পদ, মেলন গোষ্ঠী ৫২·৪ শতকোটি ডলার, ইত্যাদি। ব্রিটেনে আর্থিক গোষ্ঠী আছে ১৫-২০টি, ফ্রান্সে ১০-১৫টি, ও জাপানে ৫-১০টি।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও কয়েকটি শক্তিশালী আর্থিক-শিল্প গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। ১৯৮৬ সালে ভারতে আর্থিক-একচেটিয়া সংস্থা 'বিড়লা' ৪,১০০ কোটি টাকার পরিসম্পদ এবং 'টাটা' গোষ্ঠী প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকার পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এল সালভাদোরের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চোদ্দটি পরিবার; তুরস্কে দাপট চালায় প্রায় দশটি একচেটিয়া গোষ্ঠী, যার মধ্যে আছে প্রত্যেকে একশতকোটি ডলারের পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে এমন দুটি পরিবার ও প্রত্যেকটির দশলক্ষ ডলার পুঁজি আছে এমন ৩০টি পরিবার; পাকিস্তানের অর্থনীতিতে আধিপত্যমূলক অবস্থান অধিকার করে আছে ২২টি আর্থিক-শিল্প গোষ্ঠী।

ধনকুবেরতন্ত্র তার বিপুল আর্থনীতিক ক্ষমতাকে

কাজে লাগায় মাথা-ঘোরানোর মতো মুনাফা আদায় করার জন্য, যে মুনাফার পরিমাণ হল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উৎপন্ন সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকের বেশি। এটা নিঃসন্দেহে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা বিরাট অংশ। তবুও, ধনকুবেরতন্ত্রকে তা তৃপ্ত করতে পারে না, তা ক্রমাগত আরও বেশি চায়। তাই ক্রমবর্ধমানরূপে বহুবিধ ও পরিশীলিত পদ্ধতির সাহায্যে শ্রমজীবী জনগণের উপরে তার শোষণেরও কোনো সীমা নেই।

মুনাফায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা

ধনকুবেরতন্ত্রের ক্ষমতা বজায় রাখা ও তার বিপুল মুনাফা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই ব্যবস্থাটি উদ্যোগের জয়েণ্ট-স্টক রূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ একটি উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত স্টক হাতে না রাখলেও চলে। ১০ থেকে ২০ শতাংশ শেয়ারের অধিকারী স্টকহোল্ডাররা তাদের কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণভার লাভ করে। এইভাবে, যার পুঁজিসংভার এক কোটি ডলার এমন একটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে ২০ লক্ষ ডলারের শেয়ারই যথেষ্ট হয়।

ফিনান্স পুঁজি একাধিক কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে, প্রতিটি কোম্পানি তার তহবিল ব্যবহার করে অন্যান্য, অধীনস্থ কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার লাভ করতে। আবার, শেষোক্তগুলির প্রত্যেকটি

কেনে অন্যান্য কোনো উদ্যোগের শেয়ারের নিয়ন্ত্রণকারী অংশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইভাবে নির্মিত হয় জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির এক অতিকায় পিরামিড, যার চূড়ায় থাকে অন্য কয়েক ডজন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী এক শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি। এই গঠনকাঠামোটা ধনপতিদের হাতে বিপুল উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে দেয়।

অংশগ্রহণের ব্যবস্থাটি 'ব্যক্তিগত সম্মিলনের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার দ্বারা বড় একচেটিয়াপতিরা যুগপৎ একাধিক পরিমেলে কর্তৃত্বমূলক পদের অধিকারী হয়। বৃহত্তম ব্যাংকগুলির ডিরেক্টররা একচেটিয়া শিল্প পরিমেলগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হন, আর এই পরিমেলগুলির ম্যানেজাররা ব্যাংকগুলিতে ডিরেক্টরের পদ পান। ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ানো হয় পারিবারিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের সাহায্যে এবং সরকারি সংস্থাগুলিতে সম্মিলিত অংশগ্রহণের সাহায্যে।

বিপুলসংখ্যক ব্যাংক এবং শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কোম্পানি ধনকুবেরতন্ত্রের আর্থনীতিক ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করায়, তাদের আয়ের বৃহদংশের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এই ধনকুবেরতন্ত্র। শিল্প কর্পোরেশন ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির অতি-মুনাফা এবং অন্যান্য একচেটিয়া মুনাফা ধনকুবেরতন্ত্রই উপযোজন করে। ছোট ও গড়পড়তা শেয়ারহোল্ডাররা পায় ধনপতিদের খাবার টেবিলের শুধু উচ্ছিষ্টাংশ, ধনপতিরা অগ্রাধিকারমূলক আয় ভোগ করে তাদের শেয়ার ও অন্যান্য জামানত থেকে।

ডিরেক্টর হিসেবে এবং পরিচালকমণ্ডলী ও পরামর্শ পরিষদগুলির সদস্য হিসেবে তাদের অস্বাভাবিক উঁচু বেতন দেওয়া হয়। এই সব বেতনকে নিয়মিতভাবে বাড়ানো হয় বোনাস দিয়ে, যা কোম্পানির কাজকর্মের ফলাফলের জন্য কোম্পানির কার্যনির্বাহীদের প্রাপ্য হয়; এই সব বোনাসের অঙ্ক প্রায়শই বেতনের চেয়েও মোটা। উদাহরণস্বরূপ: একটি অনুকূল বছরে, 'জেনারেল মোটরস'-এর প্রেসিডেণ্ট বেতন, অতিরিক্ত ভাতা ও বোনাস হিসেবে পেয়ে থাকেন প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। ধনপতিদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং স্বদেশে ও বিদেশে তাদের বিস্তৃত ভ্রমণের খরচও কর্পোরেশনগুলি দেয়, তাদের ভালো পেনশন দেয় এবং অনেক কম দামে, এমন কি বিনামূল্যে শেয়ার পেতে দেয়।

প্রবর্তনমূলক মুনাফা

ধনকুবেরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুনাফা বা **প্রবর্তনমূলক মুনাফার** রূপে বিরাট মুনাফা অর্জন করে। মুনাফায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থার মতো, মুনাফার এই রূপটিও পুঁজির জয়েণ্ট-স্টক (কর্পোরেট) রূপটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি গঠন করতে গিয়ে ধনপতিরা এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে। ধরে নেওয়া যাক যে একটি নির্দিষ্ট জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে ১ কোটি ডলার পুঁজি বিনিয়োজিত

হয়েছে, এবং বার্ষিক মুনাফা হল ১৬ লক্ষ ডলার। প্রবর্তনমূলক মুনাফা অর্জন করার জন্য, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা দশ লক্ষ শেয়ার ইস্যু করে, যার নির্দিষ্ট একটা ভগ্নাংশ তারা স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করে।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য হল ১০ ডলার। প্রতিটি শেয়ার যার পরিচায়ক এ হল সেই বাস্তব পুঁজি। কিন্তু বাজার দাম শেয়ার-পিছু ১০ ডলার হবে না; তা নির্ধারিত হবে শেয়ার-পিছু ডিভিডেণ্ড দিয়ে, নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী:

$$\frac{\text{ডিভিডেণ্ড}}{\text{ঋণের সুদের হার}} \times ১০০।$$

গড় বার্ষিক মুনাফা ১৬ লক্ষ ডলার বলে, ১০ লক্ষ শেয়ারের প্রতিটির ডিভিডেণ্ড হয় ১·৬ ডলার। ধরা যাক যে ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ, তা হলে বিনিময় হার হবে ২০ ডলার ($\frac{১·৬ \times ১০০}{৮} = ২০$), অর্থাৎ, শেয়ার বাজারে প্রতিটি শেয়ারের দাম হবে ২০ ডলার।

আলোচ্য কোম্পানিটির কাজকর্মের উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারার জন্য প্রতিষ্ঠাতারা সমস্ত স্টক বিক্রি করবেনা। শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভাগটা, ধরুন, সমগ্র স্টকের ১৫ শতাংশ তারা ধরে রাখবে। অর্থাৎ, তারা বাজারে ছাড়বে ও বিক্রি করবে ৮,৫০,০০০ শেয়ার।

এই শেয়ারগুলি বিদ্যমান বিনিময় হারে বিক্রি করে প্রতিষ্ঠাতারা উপার্জন করবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার (২০ ডলার×৮,৫০,০০০=১,৭০,০০,০০০ ডলার)।

বাস্তব পুঁজির পরিমাণ ছিল ৮৫ লক্ষ ডলার (১০ ডলার×৮,৫০,০০০=৮৫,০০,০০০ ডলার)। শেয়ার বিক্রি করে প্রতিষ্ঠাতারা উপার্জন করেছে ৮৫ লক্ষ ডলার (কেননা শেয়ারগুলি যার পরিচায়ক ছিল সেই ৮৫ লক্ষ ডলার বাস্তব পুঁজির বিনিময়ে তারা পেয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার)। এই ৮৫ লক্ষ ডলার হল **প্রতিষ্ঠার (প্রবর্তনমূলক) মুনাফা**। তাই আমরা প্রবর্তনমূলক মুনাফার সংজ্ঞানিরূপণ করতে পারি বিদ্যমান বিনিময় হারে বিক্রীত শেয়ারগুলির সর্বমোট দাম আর আলোচ্য জয়েণ্ট-স্টক উদ্যোগটিতে বিনিয়োজিত বাস্তব পুঁজির মধ্যে পার্থক্য বলে। এটি হল পুঁজিবাদী মুনাফার একটি রূপ, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি রূপ।

ধনকুবেরতন্ত্র নিজের সমৃদ্ধিসাধনের জন্য মুনাফার এই রূপটি ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। এইভাবে, মর্গ্যান এবং 'ইউনাইটেড স্টেটস স্টীল কর্পোরেশনের' অন্য প্রতিষ্ঠাতারা একেবারে শুরুতেই প্রতিষ্ঠাতাদের মুনাফা বাবদ ৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের বেশি মুনাফা লাভ করেছিলেন।

বাস্তব পুঁজি না বাড়িয়ে বাড়তি স্টক ইস্যু করার সাহায্যেও প্রবর্তনমূলক মুনাফা করা যায়। এটা সম্ভব হয় তখনই, যখন কোম্পানিটি উচ্চতর মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে, যার পরেই স্টকহোল্ডারদের প্রদেয় ডিভিডেণ্ড বাড়ানো উচিত। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ নতুন শেয়ার ইস্যু করার জন্য বাড়তি মুনাফাটা ব্যবহার করে ডিভিডেণ্ড আগেকার হারে রেখে দেওয়াই বেশি

লাভজনক মনে করে। এই ক্ষেত্রে, নতুন স্টক বিক্রয় বাবদ সমস্ত প্রবর্তনমূলক মুনাফা তাদের হাতেই চলে যায়।

বিনির্গম মুনাফা

শেয়ার চালু (ইস্যু) করা ছাড়াও, ধনকুবেরতন্ত্র জামানত সংক্রান্ত অন্যান্য লেনদেনেও সম্পদের এক সমৃদ্ধ উৎস খুঁজে পায়। মাঝারি ও ছোট কোম্পানিগুলির শেয়ার ক্রয় ও পুনঃবিক্রয় করে তারা প্রচুর অর্থোপার্জন করে। তারা বন্ড চালু করে, বণ্টন করে ও পুনঃবিক্রয় করে। সরকারি ঋণ বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা বিরাট। জামানত নিয়ে লেনদেন চালিয়ে ধনপতিরা জামানতগুলি কেনে পরবর্তীকালে সেগুলি তারা যে দরে পুনঃবিক্রয় করে তার চেয়ে অনেক কম বিনিময় দরে। শেয়ারগুলির দামের এই পার্থক্যই হল একচেটিয়া **বিনির্গম (ইস্যু) মুনাফা**। সরকারি ঋণ সংক্রান্ত মধ্যস্থতাকর লেনদেনে এই মুনাফা বিশেষভাবে চড়া। একটি দেশ যখন আরেকটি দেশকে ঋণ দেয়, তখন ঋণের অঙ্কের ১০ থেকে ২০ শতাংশ চলে যায় ব্যাংকগুলি ও অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থের কাছে।

ফাটকাবাজি থেকে মুনাফা

জামানতগুলিতে ফাটকাবাজি হল ধনকুবেরতন্ত্রের উচ্চ আয়ের আরেকটি উৎস। জল্‌দি মুনাফা করার আশায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়প্রকার পুঁজিপতিই ফাটকাবাজিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু ফাটকাবাজিতে মোটা মুনাফা করার সুযোগটা জোটে বৃহৎ ধনপতিদের ভাগ্যে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে বিশিষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন, 'উচ্চ বিত্ত-যোগানের' পদ্ধতিগুলি সবচেয়ে সন্দেহজনক, এবং সচরাচর যাকে ডাকাতি ও প্রতারণা বলে বিবেচনা করা হয় তা থেকে এর তফাৎটা শুধু সেগুলির কারবারের বৃহৎ পরিসরে'।*

বৃহৎ ধনপতিরা তাদের ফাটকাবাজিতে সফল হয় কারণ, জাতীয় অর্থনীতিতে কর্তৃত্বমূলক অবস্থানের অধিকারী লোকজন হিসেবে তারা আর্থনীতিক ঘটনাবিকাশ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি ওয়াকিবহাল। তাই যে সমস্ত কোম্পানির আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি অন্য সমস্ত কোম্পানির চেয়ে আগে হতে পারে, সেগুলির জামানত বিক্রি করে ফেলতে তারা সক্ষম হয়। এইভাবে সেই আমানতগুলির বিনিময় হার হ্রাসজনিত লোকসান তারা এড়িয়ে যায়। অনুরূপভাবে, শেয়ার বাজারের বড় বড় দালাল নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে আগে জানতে পারে, তাই তারা সেই কোম্পানিগুলির জামানতগুলি সস্তায় কিনে নেয় পরে বেশি দামে বিক্রি করার জন্য।

* Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*, Lindsey Drummond Limited, London, 1949, p. 905.

এটাই অবশ্য সব নয়। বস্তুতপক্ষে, ফাটকাবাজিতে লিপ্ত ধনপতিরা তাদের প্রতিযোগীদের ডাহা প্রতারণা পর্যন্ত করে। একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগকে তাদের ফাটকাবাজির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়ে তারা সেটির মন্দ আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটায়। সহজে-আতঙ্কিত স্টকহোল্ডাররা তাদের জামানতগুলি বিক্রি করতে শুরু করে। ফলে, এই জামানতগুলির বিনিময় হার প্রচণ্ডভাবে নেমে যায়। একটি কোম্পানির শেয়ারের দাম যখন নিম্নতম স্তরে নেমে আসে, তখন ফাটকাবাজরা বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনে নেয়। তার অব্যবহিত পরেই, তারা এটা জানানোর ব্যবস্থা করে যে কোম্পানিটির আর্থিক অসুবিধা সংক্রান্ত গুজব ভিত্তিহীন ছিল; বিদ্যমান বিনিময় হার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যেতে শুরু করে। সেই দর যখন সর্বোচ্চ স্তরে আসে, তখন ফাটকাবাজরা শেয়ারগুলি পুনঃবিক্রয় করে। এই ধরনের কার্যকলাপ, শেয়ার বাজারের দালালদের কথ্য ভাষায় যা 'শেয়ার বাজারের ভেড়ার লোম-ছাঁটা' বলে পরিচিত, তার মধ্য দিয়ে ফিনান্স পুঁজি মোটা মুনাফা অর্জন করে।

মার্কিন শতকোটিপতি রিচার্ড মেলনের বিখ্যাত ব্যবসায়িক কারবার ফাটকাবাজির মুনাফাদায়কতার একটি ভালো দৃষ্টান্ত। জুলাই, ১৯৬১তে মেলন তাঁর কোম্পানি 'গাল্‌ফ অয়েল'-এর ৪,০০,০০০ শেয়ার বিক্রি করে শেয়ার বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। কোম্পানির আসন্ন আর্থিক সর্বনাশের গুজবে শঙ্কিত হয়ে স্টকহোল্ডাররা 'গাল্‌ফ অয়েল'-এর শেয়ারগুলি

চটপট বিক্রি করে দেয়, এবং মেলন সেগুলি সস্তায় কিনে নেন। এই কারবারটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে এনে দিয়েছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের মুনাফা।

জমি নিয়ে ফাটকাবাজি

জমিতে ফাটকাবাজির মধ্য দিয়ে ধনপতিরা প্রচুর মুনাফা পায়। তারা দ্রুত প্রসারমাণ শহরগুলির সংলগ্ন জমি, তেল উৎপাদনের নিহিত সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলগুলি, অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকাগুলি প্রভৃতির জমি নিচু বা গড়পড়তা দামে কিনে নেয়। যথাসময়ে সেই এলাকাগুলিতে জমির দাম বাড়তে পারে দশগুণ, এমন কি শতগুণ। মোটা মুনাফা করার সুযোগটা গ্রহণ করে ধনপতিরা জমির টুকরোগুলি বিক্রি করে নতুন, উঁচু দামে, এবং এইভাবে বিরাট মুনাফা করে।

১৯৪৮ সালে, মার্কিন কোটিপতি রবার্ট স্মিথ তাঁর পশুপালন প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনেছিলেন একর-প্রতি ২০০ ডলার দামে। তার পর, দাম বেড়ে হয়েছে একর-প্রতি ৪,০০০ ডলার, সুতরাং আজ স্মিথের ভূসম্পত্তির মূল্য ৯০ কোটি ডলার। আরেকজন মার্কিন কোটিপতি চেন্ডলার এই শতাব্দীর শুরুতে লস এঞ্জেলেস নামক একটি ছোট শহরের আশপাশে খালি জমি কিনেছিলেন। কালক্রমে সেটি হয়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় নগর। তাই জমি ক্রয়ে বিনিয়োজিত প্রতিটি ডলার বাবদ তিনি প্রত্যাগম

পেয়েছেন এক হাজার ডলার, তাঁর মোট মুনাফার পরিমাণটা হয়েছিল ১০ কোটি ডলারের বেশি।

এমন কি চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের উপরকার জমির টুকরোও মার্কিন ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজির লক্ষ্যবস্তু, মুনাফার উৎস হয়ে উঠেছে। ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে তারা ধূমকেতু, গ্রহাণু ও নক্ষত্রগুলিকে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করে যে কেউ একটি গ্রহনক্ষত্রের নাম রাখতে পারত কোনো আত্মীয়, পরিচিতজন বা প্রেমিকের নামে। এই অস্বাভাবিক বাণিজ্য এমন বিপুল পরিসর লাভ করেছিল যে আমেরিকান অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। সোসাইটি সরকারিভাবে ঘোষণা করেছিল যে মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলির নামকরণের অধিকার একমাত্র ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়নের উপরেই ন্যস্ত, এবং এই অধিকার ক্রয়যোগ্য নয়। কিন্তু, বৃহৎ মুনাফা যখন জড়িত থাকে, তখন ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাখ্যাগুলির কোনো দাম থাকে না। মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র নিয়ে তেজি ব্যবসা এখনও চলছে।

অধ্যায় ৯

মুনাফা বাড়ানোর জন্য পুঁজি রপ্তানি

উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর জন্য পুঁজি রপ্তানি

একচেটিয়া মুনাফার জন্য ব্যাংকগুলির ও একচেটিয়া শিল্পগুলির বাসনা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যে কোনো বিশেষ দেশের অভ্যন্তরে ফিনান্স পুঁজির সম্প্রসারণের ক্ষমতার কিছু কিছু সীমা থাকে। সেগুলির কারণ হল, প্রথমত, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা, শ্রমিকদের মৌল স্বার্থের উপরে একচেটিয়া সংস্থাগুলির হস্তক্ষেপের দ্বারা, এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির নিজেদের মধ্যে ও এক দিকে, একচেটিয়া সংস্থা, আরেকদিকে, তথাকথিত বহিরাগতদের, অর্থাৎ অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগগুলির মধ্যেকার তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের দ্বারা সৃষ্ট জাতীয় বাজারের উপরে চাপানো সীমা। ফলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন পুঁজির গঠন ও

বৃদ্ধি ঘটে যা একচেটিয়া সংস্থাগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট মুনাফাদায়ক বিনিয়োগক্ষেত্র খুঁজে পায় না। পুঁজির মালিকরা চায় একচেটিয়া মুনাফা, কিন্তু তারা নিজেদের দেশে সে রকম মুনাফা পেতে পারে না।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় কি আছে? ব্যাংকিং ও শিল্প একচেটিয়াগুলি উপায়টা দেখতে পায় দেশের বাইরে তাদের পুঁজির মুনাফাদায়ক বিনিয়োগের মধ্যে। তারা আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে এবং অক্টোপাসের মতো বাহুবিস্তার করে অন্যান্য জাতির সম্পদের দিকে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার এক ব্যাপক জালবিস্তার। একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের 'অতিরিক্ত' পুঁজি স্থানান্তরিত করে অন্যান্য দেশে, যেখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সর্বাধিক মাত্রায় প্রসারিত করার অবস্থা আছে। এই ধরনের স্থানান্তরণ ঘটে হাজার-হাজার বার; ফলত, পুঁজি রপ্তানি একটা বিশাল, নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদে তার পরিসর সামগ্রী রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যায়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য বিদেশে উশুল করার জন্য সামগ্রী রপ্তানি করে। পুঁজি রপ্তানিতে অন্য একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ, মূল্য রপ্তানি, যা বিদেশে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সংস্থান করে। প্রাপক দেশটির শ্রমিকদের উপর শোষণ হল এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস।

এইভাবে, পুঁজি রপ্তানি হল পুঁজি-রপ্তানিকারক দেশটির অনেক বাইরে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের

সীমানার সম্প্রসারণ। তা দেখায় যে ফিনান্স পুঁজি একাধিক দেশের দ্বারা, বস্তুতপক্ষে বহু দেশের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে। পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের বৃহত্তম একচেটিয়া সংস্থা আমাদের গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলে কোটি কোটি শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করে। এই লুণ্ঠনমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়ে তারা রাষ্ট্রিক সীমান্তগুলির চাপানো কোনো গণ্ডী বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে স্বীকার করে না। যেখানেই একচেটিয়া মুনাফার সম্ভাবনা থাকে, যেখানেই তারা শ্রমজীবী জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করে আরও ধনী হতে পারে, সেখানেই তারা বিনিয়োগ করে।

পুঁজি রপ্তানি একচেটিয়া সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থানসমূহকে শক্তিশালী করে। পুঁজি রপ্তানি করা হয় সদ্যমুক্ত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে বাঁধার উদ্দেশ্যে, যাতে প্রথমোক্তরা বিকাশের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নিতে না পারে। পুঁজি রপ্তানি এই সমস্ত দেশে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বাড়ানোর অনুকূলতম অবস্থা সৃষ্টি করে।

পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলির জন্য সংগ্রাম

পুঁজি রপ্তানি অবিশ্বাস্য মুনাফার প্রতিশ্রুতিবাহী বলে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তা স্বভাবতই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের বস্তু। সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলি আর বড় বড় একচেটিয়া সংস্থা পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে মুনাফাদায়ক ক্ষেত্রগুলির জন্য লড়াই করছে। তারা বিদেশে বিনিয়োগের পরিসরে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায় এবং অত্যন্ত লাভজনক এই ব্যবসায় নেতৃত্ব দখল করতে চায়। দরকার হলে তারা সামরিক সংঘর্ষের হুমকি দেয়, অথবা প্রকৃতই সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাতে একটা বিশ্বযুদ্ধের বিপদ বেড়ে যায়।

প্রারম্ভিকভাবে, ব্রিটেন ছিল পুঁজি রপ্তানিতে সকলের পুরোভাগে। ১৯১৪ সালের মধ্যে তার বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ গিয়ে পৌঁছেছিল ১৮ শতকোটি ডলারে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মোট বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের প্রায় ৪০ শতাংশ। ফলে, পুঁজি রপ্তানি মারফৎ সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃহত্তম অংশটি অর্জন করত ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পুঁজি রপ্তানিতে নেতৃপদে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক ধরে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের অর্ধেকের বেশি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে, পুঁজি রপ্তানি মারফৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে তার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়ায় ৫৬·৬ শতকোটি ডলার থেকে ২২৭·৩ শতকোটি ডলার, কিংবা চার গুণ। কিন্তু, মোট বৈদেশিক বিনিয়োগে মার্কিন পুঁজির ভাগটা ১৯৮১ সাল নাগাদ কমে গিয়ে ৪৫

শতাংশে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে, ১৯৬৭-১৯৭৮ সালে, পশ্চিম জার্মানির ভাগটা ২·৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮·৫ শতাংশ হয়; সুইজারল্যান্ডের ভাগটা ৩·৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭·৫ শতাংশ হয়; এবং জাপানের ভাগটা ১·৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭·৬ শতাংশ হয়।

কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশও ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ও ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে পুঁজি রপ্তানি করতে শুরু করেছিল। ভারতীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলি ছিল এ কাজে অন্যতম প্রথম: ১৯৮১ সালের শেষ নাগাদ ভারতীয় একচেটিয় সংস্থাগুলি পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল ১২৫টি বিদেশী উদ্যোগে, আর আরও ৯৭টি উদ্যোগ নির্মীয়মাণ ছিল। ইতিমধ্যে ব্রাজিল ও ফিলিপাইনের একচেটিয়া সংস্থাগুলিও পুঁজি রপ্তানি করেছিল। তেল-উৎপাদক দেশগুলি, বিশেষত সৌদি আরব ও কুয়াইত ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে পুঁজি রপ্তানি করতে শুরু করেছিল। ফলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেসব সংস্থার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল সেগুলির সংখ্যা সেই সময়ের মধ্যে এক হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। বর্তমান কালে প্রতি বছর এই সংস্থাগুলি বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করে ৫০ কোটি ডলার পর্যন্ত।

উন্নয়নশীল দেশগুলি পুঁজি রপ্তানিতে যোগ দিলেও, তাতে তাদের ভূমিকা খুব বড় নয়। কর্তৃত্বমূলক অবস্থানগুলি এখনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দখলে। বিদেশে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য নিযুক্ত তাদের মোট পুঁজির পরিমাণ একটা মাথা-ঘোরানো অঙ্কে

গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯১৪ সালে অংকটা যেখানে ছিল ৪৬ শতকোটি ডলার, সেখানে ১৯৮১ সালে শুধু প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অংকটাই ছিল ৫০০ শতকোটি ডলার।

পুঁজি রপ্তানি ক্রমেই আরও বৃহৎ আয়তন ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, একচেটিয়া বিনিয়োগগুলির প্রধান প্রধান গতিমুখও পরিবর্তিত হয়েছিল। এই শতাব্দীর শুরুর দিকে, একচেটিয়া সংস্থাগুলির রপ্তানি করা পুঁজির বৃহদংশ বিনিয়োজিত ছিল ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতিসমূহ যখন স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের পথে চলতে শুরু করেছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছিল বৈকি। ক্রমবর্ধমান জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের দরুন তারা তাদের পুঁজি হারানোয় ভয়ে ভীত হয়েছিল। তাই তারা পুঁজি রপ্তানি অনেকখানি বাড়িয়েছিল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে; এইভাবে শেষোক্তরাই ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

বৈদেশিক বিনিয়োগের বৃহদংশ যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে চালান গেছে, তার মানে এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি বন্ধ করেছে। ফিনান্স পুঁজি এখনও বিরাট পরিসরে ও অত্যন্ত লাভজনকভাবে তরুণ উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়ার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। গোটা ১৯৭০-এর দশক জুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বেড়েছিল প্রতি বছর ১৫ শতাংশ করে, মোট নতুন বিনিয়োগের মধ্যে মার্কিন ও কানাডীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলির বিনিয়োগের ভাগ ছিল ৫০ শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলির ভাগ ছিল ৩৮ শতাংশ এবং জাপানী একচেটিয়া সংস্থাগুলির — ১০ শতাংশ।

পুঁজি রপ্তানি ও বিনিয়োগের আয়

পুঁজি রপ্তানি কার্যকর করা হয় বিভিন্ন উপায়ে। তাই তার সাহায্যে নিষ্কাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

অধিকাংশ একচেটিয়া সংস্থা বিদেশে তাদের তহবিল বিনিয়োগ করে উৎপাদনশীল (ক্রিয়াশীল) পুঁজি হিসেবে। রপ্তানি করা তহবিল দিয়ে কখনও কখনও নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, শাখা, অধীনস্থ সংস্থা বা ব্যাংক স্থাপিত হয়। আর্থিক সম্পদের একাংশ ব্যবহৃত হয় চালু উদ্যোগগুলি ক্রয়ের জন্য এবং সেগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য। সব শেষে বিদেশী পুঁজির সাহায্য নিয়ে স্থাপিত হয় মিশ্র উদ্যোগ, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে স্থানীয় পুঁজিপতিরা সম্মিলিতভাবে সেগুলির মালিক হয়।

বিদেশে বিনিয়োগ করার সময়ে একচেটিয়া সংস্থাগুলি বেশির ভাগ সময়েই বিদেশী উদ্যোগগুলির উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। একে বলা হয় প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ। এতে বিনিয়োগকারী প্রাপক উদ্যোগটির শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভাগটা অধিগ্রহণ

করে। এই সঙ্গে, বিনিয়োগকারী সেই উদ্যোগটির ব্যবস্থাপনা চালানোর সম্পূর্ণ অধিকার অর্জন করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্য রূপটি হল পোর্টফোলিও পুঁজি বিনিয়োগ, তাতে বিনিয়োগকারী বিদেশী উদ্যোগটির উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে না, শুধু আংশিক মালিকানা লাভ করে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিরাট মুনাফা আদায় করে তাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিনিয়োজিত পুঁজি থেকে, সেখানে তারা পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূলতম অবস্থা পায়, প্রথমত, সস্তা কাঁচামাল আর সস্তা শ্রমশক্তির দরুন।

কাঁচামাল সস্তা, কারণ তার বৃহদংশ নিষ্কাশিত হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যার মানে এই যে সেগুলি সরবরাহ করার জন্য চড়া দাম দেওয়া দরকার হয় না। শ্রমশক্তিও সস্তা স্থানীয় অবস্থার দরুন: মুখ্যত সেই পুরনো ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত মেহনতিদের চাহিদার নিচু স্তর, এবং শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার সহায়ক; সাধারণত একটি শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা ন্যূনতম জীবনধারণোপযোগী এক অর্থনীতিতে নিযুক্ত হয়ে পরিবারের জীবিকার একটা অংশ যোগায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমশক্তির দাম যদিও কম, তবুও উদ্যোগপতিরা তাদের শ্রমিকদের এমন কি এই শোচনীয় স্তরের চেয়েও কম মজুরি দিয়ে কাজ চালায়। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রথমত ব্যাপক বেকারির চাপ দিয়ে। বর্তমানে, এই দেশগুলিতে কর্মহীন বা

আংশিকভাবে কর্মে নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা হল সেগুলির মোট সক্ষমদেহী জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমজীবী জনগণের অধিকার কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারে না, কারণ বহু উন্নয়নশীল দেশে সেগুলি এখনও পর্যন্ত দুর্বল।

বিদেশী পুঁজিপতিরা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিকদের অতি সামান্য মজুরি দেয় এবং তাদের নির্মমভাবে শোষণ করে। বিদেশী পুঁজির উদ্যোগগুলিতে কর্ম-দিবস উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির উদ্যোগগুলির তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘতর এবং ওভারটাইম কাজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির তুলনায় এই উদ্যোগগুলির শ্রম-নিবিড়তার স্তর অনেক উঁচু। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে নিয়ে-আসা প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের সঙ্গে, বিদেশী পুঁজিপতিরা এমন সব উৎপাদন লাইন ও দ্রুত কাজের গতিহার চালু করে, যা সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে আগে অজানা ছিল। এই সমস্ত বিষয়ই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণের মাত্রা সর্বাধিক মাত্রায় বাড়িয়ে তোলে।

বিদেশী পুঁজি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিপুল অতিরিক্ত মুনাফা লোটে। বিদেশী পুঁজিপতিদের উদ্যোগগুলি স্থানীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির চেয়ে শ্রম-উৎপাদনশীলতার অনেক উঁচু স্তর অর্জন করে। ফলে, স্থানীয় বাজারে বিক্রয় থেকে প্রচুর অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে বিদেশী পুঁজিপতিরা।

একচেটিয়া দাম-নির্ধারণ বিদেশী পুঁজি সম্প্রসারিত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। নিচু একচেটিয়া দামে স্থানীয় সামগ্রী কিনে, এবং নিজেদের উৎপাদ উঁচু একচেটিয়া দামে বিক্রি করে, বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন মূল্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ উপযোজন করে। এর অন্তর্ভুক্ত হল কৃষকদের উৎপন্ন মূল্য এবং স্থানীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য।

এইভাবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিভিন্ন উদ্যোগে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজনের এক শাখায়িত ব্যবস্থা ব্যবহার করে। তার কল্যাণে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের আয় লুটতে পারে।

যে সমস্ত উদ্যোগে একজন বিদেশী পুঁজিপতিই একমাত্র মালিক, সেখানে সে সমগ্র বিনিয়োগের আয় লাভ করে। একজন বিদেশী পুঁজিপতি যদি স্থানীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে শরিকানায় থাকে, তা হলেও উদ্যোগের মুনাফার বৃহদংশ সে উপযোজন করে, কারণ তার দিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ধনকুবেরতন্ত্রের শক্তি, আর্থনীতিক ক্ষমতা, সর্বশক্তিমত্তা, ও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র।

পুঁজি রপ্তানি ও ঋণের সুদ

পুঁজি রপ্তানি হয় ঋণের রূপেও, মুখ্যত সরকারি ও ব্যক্তিগত বেসরকারি ঋণের রূপে। পুঁজি রপ্তানির আরেকটি রূপ হল ক্রয়ের জন্য ক্রেডিট মঞ্জুর করা,

অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ক্রেডিটের সুবিধা দেওয়া। বিদেশী ব্যাংকগুলির চলতি অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া তহবিলের রূপেও ঋণ পুঁজি রপ্তানি করা হয়। এইভাবে, এই ব্যাংকগুলির পুঁজি সম্প্রসারিত হয়, তারা আরও বড় ও আরও লাভজনক বৈদেশিক লেনদেন চালাতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঋণ পুঁজির রপ্তানি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলছে। ১৯৭৯ সালে, এই দেশগুলিকে দেওয়া মোট ঋণ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপ্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। উৎপাদনে বিনিয়োগ করার চেয়ে ঋণ দেওয়া এখন বেশি মুনাফাদায়ক হয়ে উঠেছে। প্রাপক দেশগুলিতে শ্রমিকদের উপরে শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে ঋণ থেকে আজকাল চড়া সুদ পাওয়া যায়। ১৯৮১ সালে, তেল রপ্তানিতে নিযুক্ত নয় এমন সব উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী পুঁজির অর্জিত মোট মুনাফার ৯০ শতাংশই ছিল মোট সুদ।

পুঁজি রপ্তানির ক্রমবর্ধমান মুনাফাদায়কতা

সব ধরনের পুঁজি রপ্তানিই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ধনকুবেরতন্ত্রের জন্য নিয়ে আসে প্রচুর আয়, তার দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও রয়েছে সেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত দেশগুলিতে উৎপন্ন বিরাট পরিমাপের উদ্বৃত্ত-মূল্য। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করা হয় সদ্যস্বাধীন

রাষ্ট্রগুলির, কেননা তারা শোষিত হয় সবচেয়ে কঠোর ও নির্মমভাবে।

পুঁজি রপ্তানিজনিত আয় বৃদ্ধি ঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পুঁজি রপ্তানির মুনাফাদায়কতার সূচকগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০, এই পনের বছরে বিদেশে প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগই শুধু ৩·৫ শতকোটি থেকে বেড়ে হয়েছিল ২০·১ শতকোটি ডলার, তাতে মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলি মোট মুনাফা করেছিল ১৪০ শতকোটি ডলার; এই অঙ্কের প্রায় অর্ধেক এসেছিল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি থেকে।

মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলির পক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানির চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি মুনাফাদায়ক। তাই, ১৯৭৯ সালে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে মুনাফার হার ছিল ২৯·৫ শতাংশ, আর উন্নত দেশগুলিতে ছিল ১৭·৭ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকেও মুনাফার একটা উঁচু হার এনে দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রতি বছরে সর্বমোট বিনিয়োজিত তহবিলের ২০-২৫ শতাংশের সমান মুনাফা দেয়।

মুনাফার স্থানান্তরণ ও পুনর্বিনিয়োগ

পুঁজি রপ্তানি বাবদ লব্ধ মুনাফা দুটি অঙ্গীয় অংশে বিভক্ত। একটিকে পুঁজির মালিকরা স্বদেশে স্থানান্তরিত

করে, অন্যটা উৎপাদক দেশে রেখে দেয় ব্যবসায়ে পুনর্বিনিয়োগ করার জন্য। পুঁজি রপ্তানি থেকে মুনাফার বিনিয়োগকে বলা হয় **মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ।**

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্জিত মুনাফার বৃহদংশকে একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ দেশে স্থানান্তরিত করতে চায়, ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সম্পদ বেড়ে যায় আর উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির ক্ষতি হয়। ১৯৭১-১৯৭৮ সালে ৬২টি উন্নয়নশীল দেশ থেকে মোট পুঁজি স্থানান্তরণের পরিমাণ ছিল ৮৫·৪ শতকোটি ডলার, বা এই দেশগুলিতে মোট নতুন প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে ২·৫ গুণ বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি স্থানান্তরণ বিশেষভাবেই বিরাট, কেননা এই দেশটিই হল সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রধান শোষক। তাই ১৯৭৩-১৯৮১ সালে, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত পুঁজির পরিমাণ ছিল ৬০ শতকোটি ডলারের বেশি।

মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ক্রমবর্ধমান পরিসরে ঘটে। ১৯৬৬-১৯৮১ সালে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলির মোট পুনর্বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯ শতকোটি ডলারের বেশি। ১৯৮০ সালে, এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধির ৫৪ শতাংশ এসেছিল তহবিলের পুনর্বিনিয়োগ থেকে। এর মধ্যে লাতিন আমেরিকান দেশগুলি থেকে এসেছিল ব্যক্তিগত পুঁজি

বিনিয়োগ বার্ষিক বৃদ্ধির ৯০ শতাংশ, আর এশীয় দেশগুলি থেকে — ১০০ শতাংশ। এইভাবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য এই দেশগুলিকেই শোষণ করার জন্য ব্যবহৃত বিদেশী পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপরে তাদের নির্ভরশীলতা বাড়ায়।

পুঁজি রপ্তানি ও সামগ্রী রপ্তানি

সাম্রাজ্যবাদের ব্যবস্থায়, পুঁজি রপ্তানি হল সামগ্রী রপ্তানি সম্প্রসারিত করার একটি উপায়। তাই পুঁজি যখন প্রবর্তনমূলক রূপে রপ্তানি হয়, তখন নতুন উদ্যোগগুলির জন্য সাজসরঞ্জাম সাধারণত কেনা হয় রপ্তানিকারক দেশে। ঋণও দেওয়া হয় এই শর্তে যে ক্রেডিটে সামগ্রী ক্রয় করতে হবে ঋণদাতা দেশটি থেকেই। সামগ্রী রপ্তানি সম্প্রসারিত করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য উশুল করতে পারে বৃহত্তর মাত্রায়। সেই সঙ্গে, অ-তুল্যমূল্য বিনিময়ের সুযোগ এ থেকে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ফিনান্স পুঁজি সেই সব সুযোগ ব্যবহার করে অন্যান্য জাতির উপরে তার লুণ্ঠন বাড়ানোর জন্য। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে। তাদের অনেকেরই বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রচুর লোকসান হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তে বিরাট ঘাটতি পড়ে। ১৯৮১ সালে এই ঘাটতি রেকর্ড স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেই বছর

উন্নয়নশীল তেল-আমদানিকারী দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৩২ শতকোটি ডলার।

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা

পুঁজি রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য লুণ্ঠনমূলক কার্যকলাপ উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণ নিয়তই বাড়িয়ে তোলে। গোড়ার দিকে, এই ঋণের পরিমাপ করা হত কোটি কোটি ডলারে, তার পরে শতকোটি ডলারে, এবং আজ শত শতকোটি ডলারে। ১৯৮০-র দশকের মধ্যকালে উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ১,০০০ শতকোটি ডলারের চেয়ে বেশি।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল হল সর্ববৃহৎ ঋণগ্রস্ত দেশ, ১৯৮২ সালের শেষ দিকে তার মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ৮৭ শতকোটি ডলার। সেই সময়ে মেক্সিকোর ঋণ ছিল ৮২ শতকোটি ডলার; আর্জেন্টিনার ৪২ শতকোটি ডলার; দক্ষিণ কোরিয়ার ৩৭ শতকোটি ডলার; ভেনেজুয়েলার ৩৬ শতকোটি ডলার, ইত্যাদি।

ঋণ বাবদ পরিশোধ উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির উপরে একটা গুরুভার বোঝা। ১৯৭৭-১৯৮৬ সালে এই সব দেশ ঋণের পরিশোধের আকারে তাদের ঋণদাতাদের প্রায় ৯০০ শতকোটি ডলার দিয়েছে। এই অঙ্কের মধ্যে ৪৫০ শতকোটি ডলার লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ভাগ, এশিয়ার (মধ্য প্রাচ্য

ছাড়া) — ২০০ শতকোটি ডলারের বেশি এবং আফ্রিকার ভাগ ছিল ১৫০ শতকোটি ডলারের বেশি।

সুদ ও আসলের অংশ পরিশোধ বাবদ উন্নয়নশীল দেশগুলি যা হারায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ধনকুবেরতন্ত্র সেটাই লাভ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলি ঋণের উপরে যে সুদ মেটায় তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মুনাফাকে সম্প্রসারিত করে, তাদের সম্পদ ও আর্থনীতিক ক্ষমতা বাড়ায়।

পুঁজি রপ্তানি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের উপরে শোষণ

পুঁজি রপ্তানি এই পুঁজির প্রাপক দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের উপরে শুধু যে শোষণ ও লুণ্ঠনকে বাড়িয়ে তোলে তাই নয়। পুঁজি যেখান থেকে রপ্তানি হয় সেই দেশগুলিতেও উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়ার সুযোগকে তা বিস্তৃত করে। পুঁজি রপ্তানির দরুন পুঁজি-রপ্তানিকারী দেশগুলিতে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে যাচ্ছে এবং বেকারি বাড়ছে। এ সবই শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে একচেটিয়া সংস্থাগুলির আক্রমণাভিযান চালানোর কাজটাকে সহজতর করে তোলে; শ্রমজীবী জনগণ শোষণের আরও কঠোর শর্ত মেনে নিতে এবং অপেক্ষাকৃত কম মজুরি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

পুঁজি রপ্তানি উৎপাদন বৃদ্ধিকে সীমিত করে উপভোক্তা হিসেবেও শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণকে নিবিড় করে। একচেটিয়া সংস্থাগুলিতে তা

সক্ষম করে দাম চড়া করে রাখতে। পুঁজি যদি রপ্তানি না হত, তা হলে উৎপাদনের সম্প্রসারণের ফলে সামগ্রীর সরবরাহ অধিকতর হত, দাম পড়ে যেত, এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের অতি-মুনাফার কিছুটা হারাত। পুঁজি রপ্তানি ধনকুবেরতন্ত্রকে এই ধরনের লোকসান এড়াতে সক্ষম করে। স্বদেশের বাজারে তা এক ধরনের বাঁধ খাড়া করে, পণ্য প্রবাহ যাতে একচেটিয়া দামের ব্যবস্থাকে ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

পুঁজি রপ্তানি মুনাফার গড় হার কমে যাওয়াকেও ঠেকায়। শাখাগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং সেগুলির অভ্যন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাঘব করতে এবং উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্য বণ্টনে যে পুঁজিগুলি অংশগ্রহণ করবে সেগুলির মোট পরিমাণ হ্রাস করতে তা সাহায্য করে। আর এ থেকে লাভবান হয় একচেটিয়া পুঁজি এবং সর্বোপরি ধনকুবেরতন্ত্র।

অধ্যায় ১০

আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলি শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণ বাড়িয়ে তুলছে

পৃথিবীর আর্থনীতিক বিভাজন

প্রথমে একচেটিয়া পরিমেলগুলি তাদের নিজেদের দেশে মূল গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক অবস্থানগুলি দখল করে আভ্যন্তরিক বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। তাতে তারা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য পাচ্ছিল সেটা অনেকখানি বেড়েছিল, এবং তাই বেড়েছিল তাদের ক্ষুধাও। কিন্তু পুঁজিবাদে আভ্যন্তরিক বাজারগুলি বিদেশী বাজারের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই বাঁধা থাকে। পুঁজিবাদ বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করেছিল বহুকাল আগে। পুঁজি রপ্তানি যত বাড়ছিল এবং বৃহত্তম একচেটিয়া জোটগুলির বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক আর 'প্রভাবাধীন ক্ষেত্র' যত প্রসারিত হচ্ছিল, সেই জোটগুলি ততই একটি অপরটির সঙ্গে চুক্তি করছিল এবং বিদেশে তাদের অধীনস্থ

শাখা স্থাপন করছিল। তাই জাতীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলি পরিণত হচ্ছিল আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থায়, বহু দেশে শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করছিল।

বৃহত্তম আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি সেগুলির গঠনকাঠামো অনুযায়ী দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে উপবিভক্ত, একটির অন্তর্ভুক্ত হল সেগুলি যাদের দুই বা ততোধিক দেশের বৃহৎ পুঁজি আছে এবং অপরটির অন্তর্ভুক্ত হল জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি, বা জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি। শেষোক্তটির পুঁজি থাকে একটি দেশে, কিন্তু বিপুলাকার আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ চালায় পৃথিবীর বহু প্রান্তে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাই এখন প্রাধান্যশালী: পুঁজিবাদী দুনিয়ায় আজ ১১,০০০-এর বেশি জাতি-অতিগ সংস্থা আছে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের বিপুল আর্থনীতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পৃথিবীকে আর্থনীতিক প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে বিভক্ত করছে। ক্ষেত্রটি যত বড় ও একটি একচেটিয়া সংস্থার আর্থনীতিক পরাক্রম যত বেশি, সে তত বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়, ফলে সে আরও সমৃদ্ধ হয়।

প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনই নিজের প্রভাবাধীন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থানগুলি দুর্বল করার জন্য ও প্রভাবাধীন ক্ষেত্র পুনর্বণ্টন করার জন্য লড়াই করছে. এই লড়াই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তোলার

সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজকে বাড়িয়ে তোলে, এবং প্রকাশ্য সামরিক সংঘর্ষে প্ররোচনা যোগায়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃহত্তর অংশটি দখল করছে।

শ্রমজীবী জনগণকে লুণ্ঠন করার কাজে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলিই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং পুঁজিবাদী বৈদেশিক বাণিজ্যের ৬০ শতাংশই তাদের ভাগে পড়ে। জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি তাদের শোষণমূলক কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের প্রাথমিক রীতিনীতিও লঙ্ঘন করে, ক্ষুণ্ণ করে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

উন্নয়নশীল দেশগুলি, মুখ্যত যাদের আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, অত্যধিক সস্তা শ্রমশক্তি ও বিশাল এক আভ্যন্তরিক বাজার, তারাই হল জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে, উন্নয়নশীল দুনিয়ায় জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের অর্ধেকের বেশি ছিল এশীয় ও মধ্য আমেরিকান দেশগুলিতে; বিনিয়োগের এক-চতুর্থাংশ ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির আর্থনীতিক সম্প্রসারণকে বহু উন্নয়নশীল দেশই প্রতিরোধ করে; তারা বিদেশী সম্পত্তি জাতীয়করণ করে, রাষ্ট্র-পরিচালিত কোম্পানি

স্থাপন করে এবং তাদের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির অংশগ্রহণকে সীমিত করে। জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি তাই কখনও কখনও বাধ্য হয় ছলচাতুরী করতে এবং ঘুরপথে কাজ করতে।

কিন্তু জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারের উপরে প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করে, নিজেদের জন্য নানান সুযোগসুবিধা ও সেখানে তাদের ক্রিয়াকলাপকে সহজতর করে আইন গ্রহণ দাবি করে।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ

অন্যান্য দেশে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য যথাসম্ভব বেশি উপযোজন করার জন্য জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি বিদেশে তাদের সামগ্রীর উৎপাদন সম্প্রসারিত করে চলে। বৈদেশিক উৎপাদ এখন তাদের লেনদেনের প্রায় ৩০ শতাংশ।

বিদেশে নিজেদের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্য জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি প্রধান যে উপায়টি ব্যবহার করে, তা হল বিদেশে অধীনস্থ ও শাখা কোম্পানি স্থাপন করা। শুধু গত দশকেই এই সমস্ত অধীনস্থ কোম্পানির সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে বেড়ে ৮২,০০০ হয়েছে। অধীনস্থ কোম্পানিগুলির নিযুক্ত শ্রমিকরা নির্মমভাবে শোষিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়ানোর লালসায় আচ্ছন্ন জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির কর্তাদের হাতে।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির কর্তাদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য

উৎপন্ন করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে হাজার হাজার শ্রমিক। ৭,৪০,০০০ লোক নিযুক্ত রয়েছে আমেরিকান 'জেনারেল মোটরস' কর্পোরেশনের অসংখ্য কারখানায়, আর 'জেনারেল ইলেকট্রিক' কোম্পানির জন্য কাজ করছে ৪,০৪,০০০ লোক। অন্যান্য দেশের বড় বড় জাতি-অতিগ সংস্থাও মার্কিন বৃহৎ ব্যবসায়ের রাঘব-বোয়ালদের চেয়ে খুব একটা ঊন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওলন্দাজ একচেটিয়া সংস্থা 'ফিলিপস' ৩,৪৮,০০০ শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে, এবং পশ্চিম জার্মান 'সীমেন্স' ও ইতালীয় 'ফিয়াটের' উদ্যোগগুলিতে কর্মে নিযুক্ত আছে যথাক্রমে ৩,৩৮,০০০ ও ৩,১৫,০০০ লোক।

আবশ্যকীয় শ্রম ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে এনে উদ্বৃত্ত-মূল্য সর্বাধিক মাত্রায় বাড়ানোর জন্য জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি দেয় শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের তুলনায়। বিদেশস্থিত অধীনস্থ শাখাগুলির শ্রমিকদের তারা নিজেদের দেশের শ্রমিকদের তুলনায় গড়ে ৫ থেকে ৮ গুণ কম মজুরি দেয়।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহে কর্ম-দিবস শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক দীর্ঘ, ওভারটাইম কাজ অহরহই ব্যবহৃত হয় এবং অবসরের দিনগুলির সংখ্যা

চরমমাত্রায় সীমিত। কাজ নিবিড় করে তুলতে, শ্রম সুরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাবদ ব্যয়-সাশ্রয় করতে কর্পোরেশনের কর্তারা যারপরনাই চেষ্টা করে এবং স্থানীয় শ্রম বিধান লংঘন করে। এ সবের ফলে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি স্বদেশে যত মুনাফা করে তার চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা করতে সক্ষম হয় উন্নয়নশীল দেশস্থিত তাদের উদ্যোগগুলিতে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে, এই দেশগুলিতে বিনিয়োগের অনুপাতে মুনাফার হার ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সেই হারটা ছিল ১২ শতাংশ।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি তাদের শোষণমূলক চরিত্র লুকিয়ে রাখতে খুবই যত্ন নেয়। বিদেশে যখন অধীনস্থ সংস্থাগুলি স্থাপিত হয়, তখন তারা স্থানীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলায়। বেশির ভাগ সময়েই অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে প্রচার করা হয় মিশ্র উদ্যোগ বলে এবং সেগুলি কারবার চালায় জাতীয় সাইনবোর্ডের আড়ালে। কিন্তু এতে খুব একটা তফাৎ হয় না: জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি জাতীয় সাইনবোর্ডটাকে ব্যবহার করে স্থানীয় শ্রমিকদের নিংড়ে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়ার আবরণ হিসেবে।

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির মুনাফা যখনই বিপন্ন হয় তখনই তাদের আসল লক্ষ্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিলিতে আলেন্দে সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে মার্কিন 'ইণ্টারন্যাশনাল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ'

সংস্থাটির সর্বজনবিদিত দুষ্কর্মের ভূমিকা এর একটি উদাহরণ।

জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি ও অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য

কর্ম-দিবস প্রসারিত করা, কিংবা, ধরুন, কাজের নিবিড়তা বাড়ানোর ব্যাপারে স্থানীয় পুঁজিপতিরা জাতি-অতিগ অধীনস্থ সংস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির সুবিধা একটি ক্ষেত্রে বিতর্কাতীত: অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিরাট উৎস — নবতম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় প্রায় সমস্ত গবেষণা ও উন্নয়নকর্মই (৯৭ শতাংশ) শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীভূত এবং তা একচেটিয়াভাবে অধিকারে রেখেছে জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি, প্রযুক্তিগত ডিজাইনের প্রায় ৮০ শতাংশই তাদের হাতে। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নতুন সামগ্রী উৎপন্ন করা ও শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে। এর ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলি থেকে তারা অনেক এগিয়ে থাকে, স্থানীয় সংস্থাগুলির এই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আদপেই জানা নেই।

উৎপাদনের বৃহদায়তন বিশেষীকরণ ও বিপুল পরিমাণে উৎপাদন জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির সুবিধা আরও বাড়িয়ে তোলে; আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনেরও ফয়দা ওঠায় তারা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানীয়

উৎপাদন সাধারণত খণ্ড-বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রায়তন, কৃৎকৌশলগত উন্নতির পথে তা বাধাস্বরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, থাইল্যান্ডে ভারী শিল্পে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ ছোট ছোট উদ্যোগ আছে। তানজানিয়ায় আছে প্রায় ১০০টি উদ্যোগ, যার প্রত্যেকটিতে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৭০ জনের বেশি নয়।

প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর বলে, জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির অধীনস্থ সংস্থাগুলি উৎপাদের পিছনে খরচ করে স্থানীয় সংস্থাগুলির চেয়ে কম, যার ফলে তারা নিয়মিত অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে সক্ষম হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে, তরুণ রাষ্ট্রগুলিতে কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি রুদ্ধ করে রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরিত করতে অস্বীকার করে, না হয় অচল সেকেলে তথ্যাদি জানায়। তাই, চলতি দশকের গোড়ায় লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে যে প্রযুক্তি আমদানি করেছিল তার ৭০ শতাংশই ছিল সেকেলে। কিন্তু সেকেলে হওয়া সত্ত্বেও, সেই প্রযুক্তি কিনতে হয় চড়া দামে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি পেটেণ্ট, লাইসেন্স ও প্রযুক্তিগত তথ্য বিক্রয়কে ব্যবহার করে সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে আরও বেশি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়ার জন্য। প্রযুক্তিবিদ্যা লাভ করার জন্য বা তা ব্যবহার করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি যে অর্থ-প্রদান করে তার অঙ্ক ৩৫ শতকোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে।

জাতি-অতিগ সংস্থা ও দাম

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি মূল গুরুত্বপূর্ণ সব অবস্থান অধিকার করে শুধু গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদগুলির উৎপাদনেই নয়, সেগুলির বাণিজ্যেও। ১৯৭৬ সালে তাদের বিদেশস্থিত অধীনস্থ শাখাগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৩০ শতকোটি ডলার, তা ছিল সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের রপ্তানির ৯০ শতাংশের বেশি। এই সবই জাতি-অতিগ সংস্থাগুলিকে এমন একটা অবস্থানে দাঁড় করায় যেখান থেকে তারা তাদের সুবিধামতো দাম স্থির করে দিতে পারে: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রপ্তানি করা সামগ্রীর জন্য উঁচু একচেটিয়া দাম এবং সেখান থেকে আমদানি করা কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রীর জন্য নিচু একচেটিয়া দাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলম্বিয়ায় মার্কিন জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির অধীনস্থ শাখাগুলি সেমিকন্ডাক্টর বিক্রি করে পৃথিবীর গড় দামের চেয়ে ১১ গুণ বেশি দামে। তারা টেট্রাসাইক্লিন ওষুধ বিক্রি করে পৃথিবীর দামের চেয়ে ১০ গুণ বেশি দামে, এবং টিভি অডিও সাজসরঞ্জাম বিক্রি করে ২·৬ গুণ বেশি দামে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে কাঁচামাল রপ্তানির বৃহদংশের উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে (জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি আকরিক লোহা ও বক্সাইট বিক্রির ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ এবং কাঠ বিক্রির ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে; গম, কফি, পাট, তুলো ও তামা বিক্রির ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ এবং চা ও কোকো বীজ

বিক্রির ৮৫ শতাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে), জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কেনা কাঁচামালের জন্য সম্ভাব্য নিম্নতম দাম স্থির করে। ফলে মালপত্রের চূড়ান্ত দামে কাঁচামাল উৎপাদকদের ভাগটা হয় খুবই কম। তাই একটি তুলো-উৎপাদক দেশ সুতিবস্ত্রে তৈরি একটি সামগ্রীর খুচরো দামের ৬·৪ শতাংশ পায়। স্বাকরিক লোহা ও বক্সাইটের বেলায়, চূড়ান্ত দামে উৎপাদক দেশটির অংশ একটু বেশি, তবে তা ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় না। কফি, কোকো বীজ, চা, পাট, কলা ও লেবুজাতীয় ফল বিক্রির ব্যাপারে, সেই দামের সূচকটা থাকে ২০ ও ৪০ শতাংশের মধ্যে, আর চিনির বেলায় তা প্রায় ৫০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়।

নিচু একচেটিয়া দামে কাঁচামাল কেনার ফলে জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি প্রচুর মুনাফা করে, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ৫০-১০০ শতকোটি ডলার। অঙ্কগুলো সত্যিই বিরাট, যদি এ কথা মনে করা যায় যে ১৯৮০ সালে ৬৮টি উন্নয়নশীল দেশের মোট জাতীয় উৎপাদ ১০ শতকোটি ডলারের বেশি ছিল না, এবং ৩৭টি উন্নয়নশীল দেশে তা ছিল ১ শতকোটি ডলারেরও নিচে।

•

জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির লোটা মুনাফা বৃদ্ধি

এই অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য ও ঘটনাগুলি খুব ভালোভাবেই দেখায় যে জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি

যেখানেই হাত বাড়াতে পারে সেখানেই বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন করে।

- জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি তাদের অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সাধারণত দুই অংশে ভাগ করে। একটি অংশ তারা সেই দেশের বাইরে নিয়ে যায়, অন্য অংশটি ব্যবহার করে উৎপাদনকর্মের প্রয়োজনে। এই ক্ষেত্রে বাইরে নিয়ে যাওয়া মুনাফার অংশটা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খুবই বেশি, অথচ এই অংশটা এই দেশগুলির খুবই প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে মুনাফা করেছিল তার ৭১ শতাংশ সেখান থেকে বার করে নিয়ে গেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া মুনাফার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এটা স্মরণ করাই যথেষ্ট যে ১৯৭০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে বিনিয়োজিত প্রতিটি ডলার-পিছু মার্কিন জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি ৭ ডলার করে মুনাফা করেছিল।

অধ্যায় ১১

মুনাফা বাড়ানোর উপনিবেশবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী পদ্ধতি

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের সহগামী ছিল যুদ্ধ আর হত্যার সাহায্যে বিপুল পরিসরে উপনিবেশ দখল। ১৮৭৬ ও ১৯১৪ সালের মধ্যে বৃহৎ শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক রাজত্বের এলাকা ৪ কোটি বর্গ কিলোমিটার থেকে বেড়ে হয়েছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। আধা-উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির সংখ্যাও বাড়ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কক্ষপথে টেনে আনা হয়েছিল প্রায় ৯৩ কোটি মানুষকে। সমস্ত উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল হিংসা ও বলপ্রয়োগ, বর্বর নিপীড়ন আর শোষণের পরিস্থিতি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা

হয়ে উঠেছিল পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির অংশ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভুত্ব ও সমৃদ্ধির একটা বড় উপাদান।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি উপনিবেশগুলিতে ও পরাধীন দেশগুলিতে পেয়েছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুনাফাদায়ক বাজার ও অত্যন্ত লাভজনক বিনিয়োগ-ক্ষেত্র। তাদের কাছে সেই দেশগুলি হয়ে উঠেছিল সস্তা কাঁচামাল ও শক্তির, এবং সস্তা শ্রমশক্তির উৎস। প্রভুত্বমূলক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করেছিল এবং তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জনসমষ্টির উৎপন্ন জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ উপযোজন করেছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মোট ঔপনিবেশিক নজরানা ছিল জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ। উপনিবেশবাদীরা বেলজীয় কঙ্গো (এখন জাইর) থেকে নিয়ে গিয়েছিল জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি।

ঔপনিবেশিক মুনাফা

এই ধরনের নজরানা পাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশগুলিতে জাতিসমূহের উপরে চাপ দেওয়ার সমস্ত উপায় ও পুঁজিবাদী শোষণের জঘন্যতম সব পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের সঙ্গে মিলেছিল সামন্ততান্ত্রিক ও ভূমিদাস শোষণ এবং শ্রমজীবী জনগণের উপরে ব্যবহার করা হয়েছিল

বলপ্রয়োগের অ-আর্থনীতিক উপায়। উপনিবেশবাদীদের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত চিলীয় কবি পাবলো নেরুদা তাঁর 'সকলের জন্য গান' বইতে লিখেছিলেন:

জনগণের জন্য একটাই মাত্র আইন:
অত্যাচার আর অনাহার আর প্রচুর চাবুক...

স্থানীয় জনসমষ্টির স্বার্থকে উপনিবেশবাদীরা উপেক্ষা করত — তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক মুনাফা।

উপনিবেশবাদীরা কর্ম-দিবস বাড়িয়ে করেছিল ১২-১৪ ঘণ্টা ও তারও বেশি। কাজের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। শ্রম সুরক্ষার কার্যত কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মেয়েদের, এমন কি শিশুদের কাজও ব্যবহৃত হত ব্যাপকভাবে। ফোরম্যান আর ওভারসিয়াররা নজর রাখত যাতে কাজের একটিও মিনিট নষ্ট না হয়। দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

উপনিবেশগুলিতে মজুরি ছিল বৈষম্যমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেনিয়ায় ইউরোপীয় শ্রমিকদের মজুরির চেয়ে স্থানীয় শ্রমিকদের গড় মজুরি ছিল ১৫ গুণ কম এবং উত্তর রোডেশিয়ায় (এখন জাম্বিয়া) ছিল ৩০ গুণ কম। অন্যান্য ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশেও স্থানীয় ও ইউরোপীয় শ্রমিকদের কৃত সমান কাজের জন্য পারিশ্রমিকের পার্থক্য ছিল এই রকমই বিরাট।

উপনিবেশগুলিতে জনগণকে বর্বরভাবে শোষণ করে উপনিবেশবাদীরা লাভবান হত। তাদের স্বেদ ও রক্তকে

স্বর্ণ ও নগদ মুদ্রায় পরিণত করে তারা এমন মুনাফা করত, যেটা তারা তাদের নিজেদের দেশে ষতটা করতে পারত তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতে কয়লা খনিগুলি তাদের ব্রিটিশ মালিকদের হাতে ১৬০ শতাংশ মুনাফা তুলে দিত। বেলজীয় কঙ্গোতে রবার কর্পোরেশনগুলির বার্ষিক ডিভিডেন্ড শেয়ারের মূল দামের চেয়ে দশগুণেরও বেশি ছিল।

উপনিবেশবাদীরা বাগিচাগুলি থেকে প্রচুর মুনাফা লুটত: ১৯৫০-এর দশকে ২৫টি ঔপনিবেশিক দেশে বাগিচায় কাজ করত সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ৫০লক্ষ লোক। অর্থলোলুপ উপনিবেশবাদীরা কৃষকদের কাজ থেকেও মুনাফা করত, কৃষকরা সামান্য যেটুকু উপার্জন করতে পারত তা থেকেও বঞ্চিত করত তাদের। কৃষকরা হাতে-পায়ে বাঁধা থাকত অন্যায় খাজনা-বিলি আর নির্মম ঋণের বন্ধনে। কাজ, ভাগচাষ ও খেতমজুরির সাহায্যে ঋণ শোধ করানোর প্রথা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত।

অ-তুল্যমূল্য বিনিময়ও ছিল স্থানীয় জনসমষ্টিকে লুণ্ঠন করার আরেকটি উপায়। যে সমস্ত একচেটিয়া পরিমেল উপনিবেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করত, তারা নিজেদের জন্য কয়েকশো শতাংশ মুনাফা আদায় করে নিত।

উপনিবেশবাদীদের অর্জিত মুনাফা অনেকখানি বাড়ানো হত গুরুভার করাধান আর ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়িত নানান ধরনের

অর্থ-আদায়ের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩০-এর দশকে রাজনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মুনাফাই ছিল ব্রিটেন কর্তৃক তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে সংগৃহীত সমগ্র ঔপনিবেশিক নজরানার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

অধিকাংশ ঔপনিবেশিক মুনাফা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলি ও ধনকুবেরতন্ত্র আরও বেশি ধনী হয়ে উঠছিল, উপনিবেশগুলিতে বিপুল পরিমাণে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে ঢালছিল নিজেদের ধনভাণ্ডারে। ফলে, বৃহত্তম শক্তিগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলির উপযোজিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য বেড়ে চলছিল, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছিল, আর গরিবরা হচ্ছিল আরও গরিব।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির ভাঙন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই সংকট বেড়ে পরিণত হয়েছিল ভাঙনে এবং তার পরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতনে। মহাদেশের পর মহাদেশ জুড়ে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির প্লাবন একদা শক্তিশালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলিকে চূর্ণ করেছিল।

সেগুলির জায়গায় আত্মপ্রকাশ করেছিল শতাধিক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। দীর্ঘকাল আগেই যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সেই লাতিন আমেরিকান

রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একত্রে তারা হয়ে উঠেছিল উন্নয়নশীল দেশ নামে অভিহিত দেশগুলির একটা বিরাট গোষ্ঠী, যেখানে বাস করে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক।

সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের ভূখণ্ডস্থিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ও ঔপনিবেশিক প্রসাশনের সম্পত্তির একাংশ নিজেদের হাতে নেয়। অনেকগুলি ব্যক্তি-মালিকানাধীন বিদেশী কোম্পানির কাজকর্ম সীমিত করা হয়। ৭০টির বেশি সদ্যমুক্ত দেশে এই ধরনের কোম্পানিগুলির সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়। তার পর সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি থেকে আগেকার পদ্ধতিতে আর উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণ করতে অপারগ হয়। তাই মুনাফার এই বড় উৎসটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় তার জন্য তাদের নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছিল। উপনিবেশগুলির প্রত্যক্ষ মালিকানার উপরে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশবাদের স্থান গ্রহণ করেছিল নয়া-উপনিবেশবাদ।

নয়া-উপনিবেশবাদের সারমর্ম

নয়া-উপনিবেশবাদ হল উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন ব্যবস্থা, ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপরে নিপীড়নের এক নতুন রূপ: সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ হিংসা ও বলপ্রয়োগ আর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে রূপ পালটিয়ে শোষণের আরও পরিশীলিত

আর্থনীতিক পদ্ধতির দিকে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায়, আর্থনীতিক সম্প্রসারণ প্রায়শই যুক্ত হয় রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের সঙ্গে। উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা ও পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের পরাধীন অবস্থানকে নয়া-উপনিবেশবাদ কাজে লাগিয়ে চলেছে। নয়া-উপনিবেশবাদীরা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে লড়াই করার বাগাড়ম্বরপূর্ণ আশ্বাস দিয়ে নিজেদের লুণ্ঠনের নীতিটাকে আড়াল করে রাখে, কিন্তু তাদের দুটি অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য হল: ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিকে বিশ্ব পুঁজিবাদের ব্যবস্থার ভিতরে ধরে রাখা এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য একটা স্থিতিশীল সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের সম্ভাবনা যোগানো।

গত তিন দশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলি থেকে যে প্রকৃত মূল্য নিংড়ে আদায় করে নিয়েছে সেটা এর আগে ঔপনিবেশিক শাসনের তিন শতাব্দীতে ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক শক্তি যত আদায় করেছিল তার চেয়ে বেশি।

নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ

একচেটিয়া পুঁজি তার নিজের দেশের বাইরে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করে, নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণও বলতে গেলে সেই সমস্ত উপায়কেই ব্যবহার করে।

নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণে পুঁজি রপ্তানি একটা বড় ভূমিকা পালন করে। নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতি সদ্যমুক্ত দেশে তার অধিগম্যতাকে সহজতর ও বিস্তৃত করে।

সদ্যমুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাণিজ্য আসলে লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছু নয়: সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে সরবরাহকৃত সামগ্রীর জন্য শুল্কের বিধিনিষেধ শিথিল করা হয় এবং সামগ্রী বিনিময়কে বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির অনুকূলে চরমভাবে অ-তুল্যমূল্য করে তোলা হয়।

শিল্পায়নে সহায়তাদানের ছদ্মবেশে, জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি সেই সমস্ত সদ্যমুক্ত দেশে অনুপ্রবেশ করে, যেখানে আগে তারা নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা পেয়েছিল, কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই দেশগুলির বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে তারা রীতিমত সুদক্ষভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং এইভাবে নিজেদের মুনাফা নিয়ত বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি তথাকথিত 'সাহায্যকে' ব্যবহার করা হয় নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য। বিনা মাসুলে মঞ্জুরিকৃত বলে কথিত এই 'সাহায্যের' সঙ্গে যেসব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, সেগুলি ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির উপরে লুণ্ঠনকে বাড়িয়ে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবি করা হয় যে অত্যন্ত মুনাফাদায়ক বিনিয়োগের নতুন নতুন পথ খুলে দিতে হবে এবং এই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় যাতে সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলির কাছ থেকে অধিকতর দামে সামগ্রীর রপ্তানি বাড়ানো হয়। 'সাহায্যের' শর্তগুলির আরও উদ্দেশ্য হল জাতি-অতিগ সংস্থাগুলিকে কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া। কিন্তু আসল জিনিসটা এই যে এই 'সাহায্যের' লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের অধীনে ধরে রাখা এবং পুঁজিবাদী পথে সেগুলির বিকাশে উৎসাহ যোগানো।

নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে, যারা বিদেশী পুঁজির আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করার প্রবণতার বিরোধী, তাদের দুর্বল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই নয়া-উপনিবেশবাদীরা স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ও তাদের ঘনিষ্ঠ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মেলায়, তাদের ব্যবসায়ে সাহায্য দেয় এবং তাদের নিযুক্ত করে নিজেদের উদ্যোগগুলির ম্যানেজার হিসেবে।

কিন্তু নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের বিরোধী সদ্যমুক্ত জাতিগুলি তাদের মৌল অধিকারের জন্য এগিয়ে আসছে। তারা ভালোভাবেই দেখতে পায় কারা তাদের শত্রু: জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি আর রঙ বেরঙের নয়া-উপনিবেশবাদীরা। এই শত্রুরাই তাদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্যটা কেড়ে নেয়, তাকে ব্যবহার করে নিজেদের ধনবৃদ্ধির জন্য। তারাই এদের ভাগ্যে নিয়ে আসে অসুবিধা আর দুর্দশা। বহু সদ্যমুক্ত দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের নিয়ত আর্থনীতিক সাহায্য ও

সমর্থন ভোগ করে — নয়া-উপনিবেশবাদীদের লুণ্ঠনমূলক কাজকর্মের এটা বিপরীত। সমাজতান্ত্রিক দেশ-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আসা নিঃস্বার্থ সাহায্য তরুণ সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের শর্তসাপেক্ষ নয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে তাদের সাহায্য করা।

অধ্যায় ১২

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভূমিকা

একচেটিয়া পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বগুলি বেড়ে চলায়, তা পরিণত হয় রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সম্প্রসারিত করার জন্য ও একচেটিয়া পুঁজি কর্তৃক তার বৃহত্তর অংশের উপযোজন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতাকে মেলানো হয়। এ সমস্তই অর্জিত হয় নানাভাবে।

রাষ্ট্র-পরিচালিত উদ্যোগসমূহ ও পুঁজিপতিদের অর্জিত মুনাফা

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় তার ব্যবসায়িক কার্যকলাপের যথেষ্ট সম্প্রসারণের মধ্যে। এই কার্যকলাপ চালানো হয় রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া মালিকানার

কাঠামোর মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সে ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের হাতে ছিল শিল্প ও পরিবহণে বিনিয়োজিত পুঁজির ৩৪ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রের হাতে স্থায়ী পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ২·৬ ট্রিলিয়ন ডলার। ব্রিটেন ও ইতালিতে কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের ২০ শতাংশের বেশি নিযুক্ত ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে, আর অস্ট্রিয়ায় এই ধরনের উদ্যোগগুলিই উৎপাদন করত শিল্পোৎপাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাজ করে একজন বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি হিসেবে এবং কথা বলে সমগ্র একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের সপক্ষে। এই অবস্থান থেকে রাষ্ট্র উৎপাদন সংগঠিত করে কড়াকড়ি পুঁজিবাদী ধারায়। শ্রমিকদের তা বাধ্য করে শুধু আবশ্যকীয় সময়েই নয়, একটা উদ্বৃত্ত সময়েও কাজ করতে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, তা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করার সেই একই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, যেগুলি ব্যবহৃত হয় ব্যক্তি-মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে, অধিকন্তু, এই পদ্ধতিগুলি এই ক্ষেত্রে আরও বেশি অমানুষিক, কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে যোগ করা হয় চাপ প্রয়োগের প্রচলিত উপায়গুলির সঙ্গে। তা ছাড়া, শ্রমিকদের শ্রম উদ্দীপিত করার জন্য জাতীয় স্বার্থ আর জাতির কল্যাণার্থে কাজ সংক্রান্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকদের উপরে নির্মম

শোষণ বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। তার বৃহত্তম অংশটি একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া হয় অথবা একান্তভাবে তাদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। এর ফলে স্বভাবতই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা উপযোজিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে।

রাষ্ট্র-পরিচালিত উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য অনেকগুলি খাত বয়ে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের হাতে গিয়ে পৌঁছয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যকগুলির বিক্রয়। অত্যন্ত নিচু হারে স্থিরীকৃত দাম ও শুল্কহারে রাষ্ট্র একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি, বিভিন্ন খনিজ কাঁচামাল ও পরিবহণ যোগায়: বেশির ভাগ সময়েই তাতে উৎপাদনের ব্যয় পর্যন্ত মেটে না। সেই সব একই সামগ্রী ও কৃত্যক জনসমষ্টির কাছে যে দামে বিক্রি করা হয়, উপরোক্ত দাম তার চেয়েও অনেক কম। এইভাবে, ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় ট্রাস্ট 'শারবোনাজ দ্য ফ্রাঁস' দীর্ঘদিন ধরে একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে কয়লা সরবরাহ করেছিল ব্যয়-দামের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশে। আরেকটি ফরাসী রাষ্ট্রীয় পরিমেল 'ইলেকট্রিসিতে দ্য ফ্রাঁস' বহু বছর ধরে রাসায়নিক ও ধাতুশিল্পের একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি বিক্রি করেছিল জনসমষ্টির কাছে যে দামে বিক্রি করা হয় তার চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ সস্তায়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির উৎপাদ হ্রাসকৃত দামে কিনে একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাই তাদের ব্যয়ের শুধু একটা

অংশের জন্য দাম দেয় আর অন্য অংশটা পায় বিনামূল্যে। এইভাবে, তারা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা বড় অংশ উপযোজন করে কোনো দাম না দিয়ে।

সেই সঙ্গে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির কাছে সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামাল বিক্রি করে বেশি দামে, যার মানে দাঁড়ায় এই যে রাষ্ট্র তাদের উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়েও বেশি দাম দেয়। ফলে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের বিক্রীত উৎপাদের উপরে খরচ শুধু যে তুলে নেয় তাই নয়, তার অতিরিক্ত বেশ বড় একটা অঙ্ক পায়। এই বাড়তি অঙ্কটা রাষ্ট্র দেয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিনিময়ে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি উপকৃত হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির স্বার্থের বিনিময়ে এবং বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য পায় হ্রাসকৃত দামে বিভিন্ন কাঁচামাল, জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি কিনে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির মুনাফার একটা বড় উৎস হল যৎসামান্য দামে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি কিনে নেওয়া। এই লেনদেনগুলি প্রায়শই অতি বিরাট পরিসরে চালানো হয়। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলি এমন সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও উপকরণ সেগুলির প্রকৃত দরের অনেক কম দামে কিনে নিয়েছিল, যেগুলির জন্য সরকারের ব্যয় হয়েছিল ৬০ শতকোটি ডলার। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মর্গ্যানরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কেনা কয়েকটি ধাতু কারখানার জন্য দাম

দিয়েছিল ১২ কোটি ডলার, যদিও এই কারখানার জন্য সরকারের খরচ হয়েছিল ৩৫ কোটি ডলার।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির পক্ষে 'শরিকানা' প্রথাও কম মুনাফাদায়ক নয়; এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে ব্যবহারের জন্য তুলে দেওয়া হল বলতে গেলে বিনামূল্যেই। এমনটা ঘটে যে একটি উদ্যোগ রাষ্ট্রের দ্বারা নির্মিত অথচ একচেটিয়া সংস্থাগুলি সেটিকে ব্যবহার করে মুনাফা পায়। এর ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদ ন্যূনতম ব্যয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে সক্ষম হয়। 'শরিকানা' প্রথা সবচেয়ে ব্যাপক হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে রাষ্ট্রের অর্থে নির্মিত পারমাণবিক শক্তি শিল্প ও মহাকাশ যোগাযোগ শিল্পের বহু উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে ব্যক্তি-মালিকানাধীন একচেটিয়া সংস্থাগুলি।

রাষ্ট্রের স্বার্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত পুঁজির জন্য ভরতুকি ও অন্যান্য সুবিধা

বুর্জোয়া রাষ্ট্র আজ নিজের হাতে বিপুল অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত করেছে। এ কথা বলাই যথেষ্ট যে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশটা জাতীয় আয়ের ২৫ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে থাকে। এই তহবিল রাষ্ট্র নিয়তই পুনর্বণ্টন করে একচেটিয়া সংস্থাগুলির অনুকূলে, যার ফলে শ্রমজীবী জনগণের আয় কমে যায় আর একচেটিয়া পুঁজির মুনাফা বাড়ে।

প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি করার জন্য রাষ্ট্রই অর্থ-যোগান দেয়। অন্যথায়, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হত একচেটিয়া সংস্থাগুলিকেই। বস্তুতই, দক্ষ শ্রমশক্তি শোষণ না-করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অবস্থায় সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা অসম্ভব।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি বড় বড় বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের দায় চাপিয়ে দেয় রাষ্ট্রের উপরে, সকলেই জানে, বিজ্ঞানের বিকাশ না ঘটিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা কার্যকরভাবে বিকশিত করা যায় না, এবং মূলগতভাবে নতুন নতুন সামগ্রী উৎপন্ন করা যায় না। রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করে; এই ব্যয়ই প্রযুক্তিগত প্রগতির একটা বড় উপাদান হয়ে ওঠে এবং বিশ্ব বাজারে একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতাক্ষমতা বাড়ায়। একচেটিয়া সংস্থাগুলির পক্ষে নিয়ত অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পেয়ে চলার বিস্তৃততর সুযোগও তা করে দেয়।

নিজের তহবিল ব্যবহার করে রাষ্ট্র মুক্তহস্তে ভরতুকি, ঋণ ও ক্রেডিট মঞ্জুর করে মুখ্যত বড় একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে। এই ভরতুকিগুলি সাধারণত খয়রাতি মঞ্জুর করা হয়, আর ক্রেডিট ও ঋণ দেওয়া হয় সহজ শর্তে; তার উপরে নির্ধারিত সুদের হার খোলা বাজারে সুদের হারের চেয়ে অনেক কম। এই অংকগুলি বৃহত্তর একচেটিয়া কোম্পানিগুলিকে উৎপাদন সম্প্রসারণ করতে ও নতুন সামগ্রী উৎপন্ন করতে সক্ষম করে তোলে, তাতে তারা নতুন মুনাফা পায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপরে নতুন সুবিধা পায়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য রাষ্ট্র যে কর হ্রাস করে, তা থেকেও তারা প্রচুর লাভবান হয়। জনসমষ্টির দরিদ্রতম অংশগুলির জন্য করের হার যত না কমানো হয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে কমানো হয় একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রেগন প্রশাসন যে কর-সংস্কার করেছিল তাতে ১৯৮২ সালে মার্কিন কর্পোরেশনগুলির ৫০ শতকোটি ডলার 'সাশ্রয়' হয়েছিল। যে মুনাফা বিনিয়োগ করা হবে তার উপরে ট্যাক্স বসানোর সময়ে সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়। অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে নতুন বিনিয়োগের একটা বড় অংশকে নীট মুনাফা বলে গণ্য করা হয় না এবং তাই তার উপরে কর বসানো হয় না। কোনো কোনো দেশে, নতুন শিল্পোদ্যোগগুলির উপরে ১০ বছর মেয়াদ পর্যন্ত কোনো কর ধার্য করা হয় না।

পুঁজিবাদী দেশগুলির কর ব্যবস্থায় প্রচুর ফাঁক থাকে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাতে মুনাফার উপরে কর ফাঁকি দিতে সমর্থ হয়। বিশেষত, তাদের পেনশন ও বীমা তহবিল, দান, রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে অর্থ-যোগান বাবদ ব্যয়িত মুনাফা, আগের বছরগুলির লোকসান পোষানো বাবদ ব্যয়িত মুনাফার উপরে কর ধার্য করা হয় না। একচেটিয়া সংস্থাগুলির কৌশলটা খুবই সরল। প্রথমে তারা তাদের মুনাফা থেকে বিরাট অংক স্থানান্তরিত করে উপরোক্ত তহবিলগুলিতে, এইভাবে করযোগ্য মুনাফার আয়তন অনেকখানি কমানো হয়। যখন তাদের অর্থ আবার দরকার হয়, তখন স্রেফ সেখান থেকে নিয়ে তাদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে।

ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে তোলার কর্মনীতি কর ফাঁকির বিরাট সুযোগ করে দেয়। সচরাচর সাজসরঞ্জাম ক্ষয়ে যায় দশ বা ততোধিক বছরে। তাই প্রতি বছর সাজসরঞ্জামের মূল্যের ১০ শতাংশ যোগ হয় তৈরি সামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ে। এই অঙ্কগুলি সঞ্চিত হয় নতুন সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য এবং তাকে বলা হয় অ্যামরটাইজেশন, বা প্রতিপূরক তহবিল। দ্রুত প্রতিপূরণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে সাজসরঞ্জামের ব্যয় ৪ থেকে ৫ বছরের জন্য হিসাবের খাতায় অবলোপন করে ফেলতে দেওয়া হয়। তার মানে এই যে মুনাফার একটা অংশ তারা প্রতিপূরক তহবিলে যোগ করে। সামগ্রিকভাবে প্রতিপূরক তহবিলের উপরে যেমন, তেমনি মুনাফার এই অংশটির উপরেও কর ধার্য হয় না; তাই একচেটিয়া সংস্থাগুলির মুনাফার মোট পরিমাণ বিবেচনা করলে, রাষ্ট্রকে তারা যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক কম কর দেয়। শুধু ১৯৮৩ সালেই, এই ধরনের কর-ছাড়ের দরুন মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলি ১৫০ শতকোটি ডলার মুনাফার উপরে কর ফাঁকি দিয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে একচেটিয়া কর্তারা প্রায়শই প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তারা মুনাফার পরিমাণটি গোপন করে এবং তাদের পুঁজি সংক্রান্ত তথ্যাদি অত্যন্ত কম করে দেখায়। কর ফাঁকি দিয়ে একচেটিয়াপতিরা বিপুল অঙ্কের মুনাফা সাশ্রয় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন শতকোটিপতি হেনরি ফোর্ডের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার সময়ে তার পরিবারকে

সম্পত্তি কর হিসেবে প্রায় ৫৪ কোটি ডলার দিতে হত। এই কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য, তাড়াহুড়ো করে 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন' স্থাপন করা হয়েছিল এবং সম্পত্তির বৃহদংশ তাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কর-মুক্ত হিসেবে। সম্পত্তির বাকি অংশের উপরে কর — ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার — জমা পড়েছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। এই কৌশলে ফোর্ড পরিবার প্রায় ৫২ কোটি ডলার সাশ্রয় করতে পেরেছিল।

রাষ্ট্র ও একচেটিয়া দাম

বুর্জোয়া রাষ্ট্র আজ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সর্ববৃহৎ ক্রেতা। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্র যা ক্রয় করে তার পরিমাণ হল মোট জাতীয় উৎপাদের ২৫ থেকে ৩৩ শতাংশ। এই দেশগুলি বস্তুতই একটা বিরাট রাষ্ট্রীয় বাজার।

পুঁজিপতিদের, সর্বোপরি একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্র তাদের সামগ্রীর অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বিপণনের নিশ্চিতি দেয়। একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাই আরও বেশি পরিমাণে তাদের উৎপাদ বিক্রি করতে পারে। পরিবর্তমান চাহিদা জনিত ক্ষতি তাদের কমছে, এবং মুনাফা বাড়ছে।

রাষ্ট্রীয় বাজারে বিক্রয়ের শর্তগুলি একচেটিয়া সংস্থাগুলির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সেখানে যে দামে লেনদেন করা হয় তা একচেটিয়া সংস্থাগুলির পক্ষে খুবই মুনাফাদায়ক। একচেটিয়া পুঁজির উপকার করার জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে এই একচেটিয়া দামের প্রথাকে

জীইয়ে রাখে। সেই উদ্দেশ্যে কখনও কখনও বিশেষ আইন পাস করা হয়, তাতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা বাজারের উপরে চাপিয়ে দেওয়া চড়া দাম অনুমোদন করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় কনট্র্যাক্টগুলিতে দাম কঠোরভাবে স্থির করা হয় এবং ঠিক এই স্থিরীকৃত দামেই সামগ্রী ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্র গ্রহণ করে, তার আয়তন ঠিক করা হয় একচেটিয়ার পরিচালকমণ্ডলী আর সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী। এই ক্ষেত্রে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি যে দাম প্রস্তাব করে, সেগুলিকেই ভবিষ্যতের স্থিরীকৃত দামের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা বিক্রীত সামগ্রীর দাম চড়া রাখার জন্য রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্যকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে, রপ্তানিতে সর্বপ্রকারে উৎসাহ যোগায়। রপ্তানিকারকদের বিশেষ রপ্তানি বোনাস ও ভরতুকি দেওয়া হয়। সামগ্রীর প্রসারমাণ রপ্তানি আভ্যন্তরিক বাজারে সেগুলির যোগানকে কমিয়ে আনে (তাতে দাম বাড়ানোর একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়)। একই সঙ্গে, অনুরূপ সামগ্রীর আমদানি সীমিত করার জন্য রাষ্ট্র বহিঃশুল্কের প্রতিবন্ধক খাড়া করে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র শুধু উঁচু একচেটিয়া দামকেই নয়, নিচু একচেটিয়া দামকেও (রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন ও একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে সরবরাহকৃত সামগ্রীর কম দাম স্থির করা) মদত যোগায়। এই ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলির লোকসান পোষানো হয় রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে।

রাষ্ট্রের সাহায্যে একচেটিয়া দামের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ফলে একচেটিয়া সংস্থাগুলির অর্জিত অতি-মুনাফা স্থিতিশীলতা লাভ করে।

সামরিকীকরণ ও মুনাফা

অর্থনীতির সামরিকীকরণ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা হল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরগাছাবৃত্তি ও অবক্ষয়ের লক্ষণ। সামরিকীকরণ হল মানবজাতির ও আমাদের গ্রহের প্রতি সবচেয়ে বড় বিপদ। কিন্তু তা মহামহিম একচেটিয়া পুঁজির জন্য অবিশ্বাস্য সুযোগ খুলে দেয়।

এই সুযোগগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করে লোলুপভাবে ও বৃহৎ পরিসরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাবদ রকফেলার পরিবার নীট মুনাফা করেছিল ৫০ কোটি ডলার; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের এনে দিয়েছিল আরও ২১২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মুনাফা। অন্যান্য একচেটিয়া গোষ্ঠীও যুদ্ধগুলির সময়ে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য পেয়েছিল। তাই যে যুদ্ধ শ্রমজীবী জনগণের জন্য নিয়ে আসে মৃত্যু, রক্তপাত আর কষ্টভোগ, সেই যুদ্ধই পুঁজিপতিদের জন্য নিয়ে আসে মুনাফা, প্রচুর মুনাফা।

শান্তির সময়েও একচেটিয়াপতিরা কেন পীড়াপীড়ি করে যে তাদের দেশগুলির সরকারকে সামরিক ব্যয় আর অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে হবে, কেন তারা যুদ্ধোন্মাদনায় উস্কানি দেয়, তার ব্যাখ্যা পাওয়া

যায় এই থেকে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক উদ্দেশ্যে মোট ৩,৪০০ শতকোটি ডলার খরচ করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মোট সামরিক খরচ ৮৫০-৮৭০ শতকোটি ডলার দাঁড়িয়েছে। অপচয়টা যে কী বিরাট, নিচের তথ্য থেকে তা বোঝা যাবে: স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, প্রকৃতি সংরক্ষণ, কৃৎকৌশলগত সাহায্য ও খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য জাতিসংঘের দরকার বছরে মাত্র প্রায় ২ শতকোটি ডলার। একবার তুলনা করে দেখুন: ৮৭০ শতকোটি আর ২ শতকোটি!

কিন্তু বর্তমান সামরিক ব্যয়, এমনিতেই বিপুল হলেও, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়াশীল কর্তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়: মার্কিন সামরিক বাজেট প্রতি বছর ১২-১৪ শতাংশ বাড়ানো হয়।

বিশাল সামরিক বাজেটের ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে অতি মুনাফাদায়ক কনট্র্যাক্ট দিতে সক্ষম হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেণ্টাগন প্রতি বছর একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের অর্ডার দেয়। সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মুনাফাদায়ক কনট্র্যাক্টগুলি সাধারণত পায় 'জেনারেল ডাইনামিক্স', 'রকওয়েল ইণ্টারন্যাশনাল', 'বোয়িং' ও অন্য বড় বড় সংস্থা।

অসামরিক শিল্পগুলির তুলনায় সামরিক শিল্প বৃহৎ ব্যবসায়ের রাঘব-বোয়ালদের অনেক বেশি মুনাফা যোগায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের

মুনাফা অসামরিক কারখানাগুলিতে লব্ধ মুনাফার চেয়ে গড়ে ৭০ শতাংশ বেশি। সামরিক শিল্প উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যই শুধু এই চড়া মুনাফার কারণ নয়: অসামরিক উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের পুনর্বণ্টনও মুনাফা-লোটার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এই পুনর্বণ্টন কার্যকর করা হয় রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া বাজেট আর করাধানের ব্যবস্থাপ্রণালীর মধ্য দিয়ে। ফলে, সামরিক শিল্প একচেটিয়া সংস্থাগুলির অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট অঙ্ক শত শতকোটি ডলারে গিয়ে পেঁছিয়। অস্ত্র ব্যবসায়কে নিজেদের সুবিধার্থে কাজে লাগায় এমন কিছু ছোট ছোট দেশের সামরিক সংস্থাগুলিও ক্রমেই বেশি করে এই সামরিক ব্যবসায়ে যোগ দিচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইজরায়েল ১৮টি দেশের সঙ্গে অস্ত্রের ব্যবসায় চালায় আর ব্রাজিল চালায় ১৬টি দেশের সঙ্গে; উভয়েই প্রতি বছর ১ শতকোটি ডলারের বেশি মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে।

যাদের অর্থনীতি এখনও অপরিণত, সেই তরুণ উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সামরিক ব্যয় এক ক্রমবর্ধমান বোঝা। এই দেশগুলিতে সামরিক ব্যয়ের মোট পরিমাণ ১৯৭০ সালে ছিল ২৭·৮ শতকোটি ডলার, তা বেড়ে ১৯৮২ সালে ৮১ শতকোটি ডলার হয়েছে। জায়মান রাষ্ট্রগুলি চিকিৎসা বাবদ যত ব্যয় করে তার চেয়ে ৬ গুণ বেশি, এবং শিক্ষা বাবদ যত ব্যয় করে তার চেয়ে ৩ গুণ বেশি ব্যয় করে অস্ত্রের পিছনে। নিজেদের অস্ত্রের চাহিদা মেটানোর জন্য ৩০টির বেশি

উন্নয়নশীল দেশ নিজস্ব অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছে, যদিও বেশির ভাগ অস্ত্রই তাদের আমদানি করতে হয়।

জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে মোট ৯০টি উন্নয়নশীল দেশ বিদেশ থেকে অস্ত্র কিনত। ১৯৭০ ও ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে তাদের খরচা প্রায় ৫ গুণ বেড়ে আন্দাজ ১,৪০০ কোটি ডলার পেঁছেছে।

শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

শ্রমিকদের কাছ থেকে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে বার করার জন্য পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র সাহায্য করে। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করে।

ব্যক্তিগত পুঁজির সুবিধার্থে বহু দেশে শ্রমিকবিরোধী বিধান গৃহীত হয়। রাষ্ট্র মজুরি বৃদ্ধি মন্থর করে দেয়, মজুরির উপরে সংস্তম্ভন দাবি করে। তা জোর দিয়ে এ কথাও বলে যে দাম বাড়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মজুরি বৃদ্ধি দাবি করা উচিত নয়। এ সবই পুঁজিপতিদের সক্ষম করে তোলে আরও সস্তায় শ্রমশক্তি ক্রয় করতে এবং অতিরিক্ত মুনাফা নিংড়ে বার করে নিতে।

শ্রমজীবী জনগণের স্বীয় অধিকারের জন্য সংগ্রামের উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে রাষ্ট্র তাদের বাধ্য করে একচেটিয়া পুঁজির চাপানো শ্রমের শর্ত মেনে নিতে।

এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এমন আইন জারী করে যার ফলে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা সম্ভব এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিগৃহীত করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটেনে 'কর্মনিষ্ক্রিয়তা আইন'-বলে সংহতিমূলক ধর্মঘট বেআইনি করা হয়েছে এবং অনুমতিপ্রদত্ত শ্রমিকদের পিকেটের সংখ্যা অনেক কমানো হয়েছে। 'অবৈধ ধর্মঘটের' বেলায় ব্রিটিশ আদালতগুলি ট্রেড ইউনিয়ন তহবিল থেকে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৈদেশিক আর্থনীতিক সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের সমর্থন

একচেটিয়া সংস্থাগুলির বিদেশে আর্থনীতিক সম্প্রসারণে মদত যুগিয়ে রাষ্ট্র তাদের পক্ষে বিদেশে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনকে সহজতর করে তোলে। সেটা করার সময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উচ্চ মুনাফাদায়কতা ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ-কারবারের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে চায় এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির যাতে সবচেয়ে বেশি উপকার হয় এমনভাবে ক্রয় ও বিক্রয় দাম স্থির করতে চায়। বাইরের দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ঠিক এই সব শর্তই দাবি করে। এই চুক্তিগুলি এমন হতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজি রপ্তানি করা যায় এবং ভরতুকি মঞ্জুর করা যায়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৈদেশিক আর্থনীতিক সম্প্রসারণ বাড়িয়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের আর্থিক উদ্দীপনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্য সরকারি নিশ্চিতির ব্যবস্থা করে।

বুর্জোয়া সরকারগুলি তাদের দেশের বৃহত্তর একচেটিয়া সংস্থাগুলির সঙ্গে একত্রে আন্তর্জাতিক মৈত্রীজোট গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করে। পুঁজিবাদী সংবদ্ধতাকে তা সহজতর করে, জাতি-অতিগ সংস্থাগুলিকে তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থান বর্ধিত করতে সাহায্য করে। বৈদেশিক আর্থনীতিক সম্প্রসারণের প্রতি রাষ্ট্রের সমর্থন একচেটিয়া পুঁজিকে সাহায্য করে অন্যান্য জাতিকে লুণ্ঠন করতে এবং তাদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের আরও বৃহত্তর অংশ উপযোজন করতে।

অধ্যায় ১৩

উদ্বৃত্ত-মূল্য — পুঁজিপতিদের ধনবৃদ্ধির উৎস

উদ্বৃত্ত-মূল্যের ব্যবহার

পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের দেশে এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে ভাড়াটে শ্রমিকদের ও জনসমষ্টির অন্যান্য বিভিন্ন অংশের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ফল কীভাবে ও কী পরিমাণে উপযোজন করে, এখন তা আমরা জানি। কিন্তু পুঁজিপতি যে উদ্বৃত্ত-মূল্য পায় সেটা কীভাবে ব্যবহার করে?

সাধারণত সে তাকে দুই অংশে ভাগ করে। যে অংশটি **মুনাফা** হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেটি **তার ব্যক্তিগত উপভোগ তহবিল** গঠন করে। অন্য অংশটি ব্যবহৃত হয় তার পুঁজি বাড়ানোর জন্য, সেটি গঠন করে **সঞ্চয়ন তহবিল**।

অমিতাচার ও বিলাস বাড়ছে

পুঁজিপতি তার ব্যক্তিগত উপভোগ তহবিলের

একাংশ ব্যবহার করে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য, জামা-কাপড়, জুতো, গার্হস্থ্য সামগ্রী, ওষুধ, প্রভৃতি কেনার জন্য এবং এই তহবিলের একটা বড় অংশ ব্যয় করে বিলাসসামগ্রী ও অন্যান্য ধরনের অনুৎপাদনশীল সঞ্চয়নের জন্য। সে কেনে ব্যয়বহুল গাড়ি ও নিজস্ব বিমান, বাড়ি, প্রাসাদ, শিকারক্ষেত্র, জহরত, শিল্পসংগ্রহ, প্রমোদতরণী, রেসের ঘোড়ার আস্তাবল। অসংখ্য ভৃত্য নিয়োগ, আড়ম্বরপূর্ণ পার্টি দেওয়া এবং অন্যান্য অত্যধিক চাহিদা পূরণ বাবদও পুঁজিপতি এই তহবিল খরচ করে।

হাজার হাজার শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য পরগাছার মতো আত্মসাৎ করার দরুন, সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলি অমিতাচারের সমস্ত নজির ম্লান করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রকফেলাররা ডজন ডজন বাড়ি আর ভিলার মালিক, যেগুলির দাম কোটি কোটি ডলার।

সবচেয়ে ধনী পুঁজিপতিরা তাদের গৃহের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য, ব্যক্তিগত শিল্পগ্যালারির আয়োজন করার জন্য ও দুর্লভ সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কালিফোর্নিয়ার শতকোটিপতি পল গেটির বাড়িতে আছে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী আসবাবপত্র ও গালিচার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের মর্মর-ভাস্কর্য, রেমব্রান্ডট্ ও অন্যান্য মহান শিল্পীর আঁকা ক্যানভাসও সেখানে প্রদর্শিত। গেটির লণ্ডনস্থিত বাড়িতে ছবির গ্যালারিটি তার কালিফোর্নিয়ার সংগ্রহ থেকে কোনো অংশে ন্যূন নয়। লরেন্স রকফেলারের ছবির সংগ্রহ অমূল্য।

ধনীরা জুয়াখানায় প্রচুর অর্থ খোয়ায়। জুয়াখেলার পিছনে তারা যে অর্থ ব্যয় করে তা হাজার হাজার মানুষকে দুর্দশামুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হত। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুয়াখানাগুলির মুনাফা ছিল মোট ২৮ শতকোটি ডলার।

ধনকুবেরতন্ত্র অভ্যর্থনা, ভোজসভা ও প্রীতি সম্মিলনে উদারহস্তে খরচ করে।

এ সবই করা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর স্বেদ ও রক্তের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিনিময়ে।

পুঁজির সঞ্চয়ন

অত্যধিক উপভোগের পিছনে দু-হাতে অর্থ ওড়ালেও, পুঁজিপতিরা কিন্তু নিয়ত চেষ্টা করে তাদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ তারা সঞ্চিত করে। ইতিমধ্যেই বিদ্যমান পুঁজির সঙ্গে সংযোজিত, সঞ্চিত অংশটিকে এইভাবে পুঁজিতে পরিণত করা হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে গঠিত এই পুঁজি তাই ভাড়াটে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রম উপযোজনের ফল।

উদ্বৃত্ত-মূল্যকে উৎপাদনশীল পুঁজির সঙ্গে যোগ করার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি তার সঞ্চয়ন তহবিলকে দুটি অংশে ভাগ করে। একটি অংশ ব্যয়িত হয় আরও বেশি যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, কাঁচা ও অন্যান্য মাল আর জ্বালানি ক্রয় বাবদ। এইভাবে তাকে পরিণত করা হয়

অতিরিক্ত স্থির পুঁজিতে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশটি ব্যবহৃত হয় চালু উদ্যোগগুলি বাড়ানোর জন্য এবং নতুন নতুন কারখানা ও খনি নির্মাণ, নতুন নতুন তেল-কূপ ড্রিলিং, প্রভৃতির জন্য।

কিন্তু কারখানাগুলি আপনা-আপনি চালু থাকতে পারে না। তাই সঞ্চয়ন তহবিলের অপর অংশটি ব্যয়িত হয় বাড়তি শ্রমশক্তি ভাড়া করার জন্য — শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মচারীদের ভাড়া করার জন্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশটিকে অতিরিক্ত অস্থির পুঁজিতে পরিণত করা হয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য ঠিক কীভাবে পুঁজিতে পরিণত হয় তা দেখা যাক। ধরুন, একজন পুঁজিপতির ১ কোটি ডলারের পুঁজি আছে, সে ৮০ লক্ষ ডলার আগাম দেয় স্থির পুঁজির জন্য এবং ২০ লক্ষ ডলার দেয় অস্থির পুঁজির জন্য। গড় উদ্বৃত্ত-মূল্য ৩০০ শতাংশ হওয়ায় ৬০ লক্ষ ডলারের উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হবে।

এখন ধরে দিন যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের ১০ লক্ষ ডলার পুঁজিপতি নিজে ভোগ করে। তা হলে বাকি ৫০ লক্ষ ডলার সঞ্চয়নের জন্য ব্যবহার করা যায়। তার পুঁজির সঙ্গে অর্থ যোগ করার জন্য সে সঞ্চয়ন তহবিলকে দু-ভাগে ভাগ করে, ৪০ লক্ষ ডলার যোগ করে স্থির পুঁজির সঙ্গে এবং ১০ লক্ষ ডলার অস্থির পুঁজির সঙ্গে। এইভাবে সমগ্র পুঁজি বাড়িয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার করা হয়। এখন, স্থির পুঁজির আয়তন হল ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার আর অস্থির পুঁজির আয়তন ৩০ লক্ষ ডলার। শোষণের একই হার থাকলে

পুঁজিপতি এখন ৯০ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারে।

তাই, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়াতে পারে। এইভাবে সে ইতিমধ্যেই উপযোজিত মজুরি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমকে ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে নিংড়ে আরও বেশি পারিশ্রমিকহীন শ্রম আদায় করার জন্য।

বুর্জোয়ারা আরও ধনী হয়

উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করে পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদ বাড়িয়ে তোলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে দর্শনীয় পুঁজি বৃদ্ধি দেখিয়েছিল রকফেলাররা, যারা সবকটি মহাদেশে শ্রমিকদের শোষণ করে ইতিহাসে অন্যতম সর্ববৃহৎ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৬২ সালে, আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড শহরে; সেখানে ডেভিড রকফেলার একটি কেরোসিন কারখানা নির্মাণ করেছিলেন। জনৈক ঘোড়া-চোর ও জালিয়াতের পুত্র ডেভিড রকফেলারের সেই সময়ে পুঁজি ছিল ৪,০০০ ডলার। শ্রমিকদের শোষণ করার নির্মমতম পদ্ধতি, উৎকোচবৃত্তি, জালিয়াতি আর ব্ল্যাকমেল ব্যবহার করে রকফেলার প্রথম দু-দশকে তাঁর পুঁজি ১০,০০০ গুণ বাড়িয়ে তোলেন। ১৮৮০ দশকের গোড়ার দিকেই তাঁর ছিল ৪ কোটি ডলার। পরবর্তী কুড়ি বছরে অংকটা

পাঁচগুণ বেড়ে যায়, এবং ১৯০১ সালে গিয়ে পেঁছিয় ২০ কোটি ডলারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রকফেলারের পুঁজি ছিল ৯০ কোটি ডলার। পরে রকফেলারদের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বেড়ে হয়েছে ৪-৫ শতকোটি ডলার। আর এই পরিবার যে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে তার অংকটা আরও বড়। ১৯৫৫ সালেই এই পরিবারের নেতৃত্বাধীন ধনকুবেরতান্ত্রিক গোষ্ঠীটি নিয়ন্ত্রণ করত ৬১·৪ শতকোটি ডলার; আজ অংকটা গিয়ে পেঁছেছে ১৬৩·২ শতকোটি ডলারে।

অন্য বৃহত্তম পুঁজিপতি রাথব-বোয়ালদের পুঁজিও এই রকমই দ্রুতগতিতে বাড়ছে। যেমন পল গেটি ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার; ১৯৬০-এর দশকে তাঁর ধনসম্পদের পরিমাণ একশতকোটি ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকান কোটিপতি হ্যারি ওপেনহাইমার ১৯৫৭ সালে তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন প্রায় একশোটি কোম্পানি। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকের মধ্যে সেগুলির সঙ্গে তিনি আরও ৫০টি কোম্পানি যোগ করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত জাপানী সংস্থা 'সোনি' ১৯৪৭ সালে আরম্ভ করেছিল মাত্র ৫৩৭ ডলার নিয়ে; এখন তার বিক্রয়লব্ধ অর্থের বার্ষিক পরিমাণই ৪০ কোটি ডলারের বেশি। সংস্থাটি তার উৎপাদ রপ্তানি করে ১৬০টি দেশে।

পুঁজি সঞ্চয়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্পদ আরও বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকটি

পুঁজিপতি পরিবারের হাতে। লক্ষপতিদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৪৮ সালে ১৩,০০০ আমেরিকানের প্রত্যেকের ছিল দশ লক্ষ ডলারের বেশি; ১৯৬২ সালে লক্ষপতিদের সংখ্যা ছিল ৬৭,০০০ এবং ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে, ২,০০,০০০। আজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮২টি পরিবার আছে যারা নিয়ন্ত্রণ করে ২·২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি পুঁজি, বা সমস্ত বিনিয়োগের ৪০ শতাংশ।

বহু উন্নয়নশীল দেশে বুর্জোয়ারাও বৃহৎ পুঁজি পুঞ্জীভূত করে। সেখানে ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত মুনাফার অংশটা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় আরও বেশি। ১৯৭০-র দশকের গোড়ার দিকে তা ছিল ব্রাজিলে ৫০·৬ শতাংশ, হণ্ডুরাসে ৫০ শতাংশ, আর পেরুতে ৪২·৯ শতাংশ। ব্রিটেনে তা ছিল ২৩·৫ শতাংশ এবং ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে ৩০·৩ শতাংশ।

পরশ্রমজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে

পুঁজিপতিরা যত বেশি ধনী হতে থাকে, ততই বেশি সংখ্যায়, নিজেদের উদ্যোগগুলির ব্যবস্থাপনার ভার পরিত্যাগ করে। বৈষয়িক উৎপাদনের সঙ্গে সমস্ত প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন করে তারা হয়ে ওঠে রঁতিয়ে (rentiers), অর্থাৎ তারা শেয়ার আর বণ্ড থেকে পাওয়া বাঁধা আয়ের উপরে বেঁচে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমস্ত পুঁজিপতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ

উৎপাদনের সঙ্গে এমন কি আনুষ্ঠানিকভাবেও জড়িত নয়; তারা যে উদ্যোগগুলির মালিক সেগুলি চালায় ভাড়া-করা ম্যানেজাররা আর ইঞ্জিনিয়াররা।

সুদ আর ডিভিডেণ্ড হিসেবে উদ্বৃত্ত-মূল্য পেয়ে 'রঁতিয়েরা' পরগাছাসুলভ জীবন যাপন করে। তারা কাজ করে না, অলস বিলাসে জীবন কাটায়। 'রঁতিয়ে' হওয়াটা বহু দেশে উদ্যোগপতিদের এক লালিত স্বপ্ন।

'রঁতিয়েদের' চাপল্য ও পরগাছাবৃত্তি বিশেষভাবে বাড়ে পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে। তারা প্রায়শই এমন কি জানেও না কোন দেশে কী উদ্দেশ্যে তাদের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে; তাদের কাছে একমাত্র জানার বিষয় হল মুনাফা। রঁতিয়েদের সংখ্যা যে বেড়ে চলেছে, এই ঘটনাটা দেখায় যে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সমাজদেহে ক্রমেই বেশি করে একটা অহেতুক বৃদ্ধিস্বরূপ হয়ে উঠেছে। তা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং জাতীয় আয়ের বিরাট একটা অংশ ভোগ করে শুধু।

অধ্যায় ১৪

উদ্বৃত্ত-মূল্যের লালসা ও শ্রমজীবী জনগণের মৌল স্বার্থের উপরে পুঁজির আক্রমণ

বুর্জোয়া সমাজে উদ্বৃত্ত-মূল্যের লালসার সঙ্গে থাকে শ্রমজীবী জনগণের মৌল স্বার্থের উপরে পুঁজিপতিদের আক্রমণ। পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের শ্রান্তিকর শ্রম আর দুঃখকষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করে।

বেকারির বেড়ে-চলা বোঝা

চাকরি খোয়া যাওয়াটা একজন শ্রমিকের কাছে বিরাট বিপর্যয়। বেকার হওয়া মানে হল জীবিকার্জনের উপায় থেকে, যথেষ্ট খাদ্য খাওয়া ও মোটামুটি ভালো আবাসন পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। তার মানে, আজকের প্রতি আস্থা আর আগামীকালের প্রতি আশা হারানো।

বেকারি লোকের জীবনের আশা কেড়ে নেয়, নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা তা নির্দয়ভাবে কেড়ে নেয় এবং আত্মহত্যায়

প্ররোচিত করে। শিকাগোতে আমেরিকান বেকারদের ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে নিম্নলিখিত ভয়াবহ তথ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল: 'উইসকনসিন স্টিল' কোম্পানি কর্তৃক ছাঁটাই হওয়া প্রায় একশো শ্রমিক আত্মহত্যা করেছিল; তাদের মধ্যে একজন নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে নিজেই অগ্নিসংযোগ করেছিল; আরেকজন পাঁচতলার একটি জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল; এবং এমন একটা ঘটনাও ঘটেছিল যেখানে একজন শ্রমিক নিজেকে ও নিজের পরিবারকে এক্‌জস্ট্‌ গ্যাসের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। এই রকম আরও বহু ঘটনাই ঘটেছিল।

বেকারি পুঁজিবাদে অপরিহার্য। উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়ার লালসায় পুঁজিপতিরা নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তন করে, শ্রম সংগঠনের নতুন নতুন রূপ ব্যবহার করে এবং কাজকে নিবিড় করে তোলে। তাদের মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা একই উৎপাদের জন্য কম কর্মবল ব্যবহার করে। পুঁজিবাদ যত বিকশিত হয়, অস্থির পুঁজির অনুপাতটি উৎপাদনের বেড়ে চলা প্রযুক্তিগত স্তরের সঙ্গে তত কমে। পুঁজিপতি যন্ত্রের পিছনে বেশি খরচ আর মজুরি শ্রমশক্তির পিছনে কম খরচ করতে শুরু করে। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা কাজ কমিয়ে দেয়, আর যাদের কাজ দরকার তাদের সকলকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কাজ যোগাতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ এইভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত, অর্থাৎ বেকার হয়ে যায়।

বেকারদের বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করে ছাঁটাই হওয়া লোকেরা, বেশির ভাগই বয়স্ক শ্রমিক, এবং সেই সঙ্গে তরুণেরা যারা সবেমাত্র স্বাধীন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে।

বেকারির পরিসর বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হচ্ছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে ক্যানসারযুক্ত টিউমারের মতো। সরকারি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সম্পূর্ণরূপে কর্মহীনদের সংখ্যা ১৯৬০-এর দশকে যেখানে ছিল ৬৫ লক্ষ, তা থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে হয়েছিল ২ কোটি ৪৭ লক্ষ। ১৯৮৩ সালে, তা গিয়ে পৌঁছেছিল ভয়াবহ ৩ কোটি ৫০ লক্ষে, ১৯৩২ সালে স্থাপিত পুঁজিবাদের ইতিহাসে অন্যতম শোচনীয় রেকর্ড — বেকারির রেকর্ড — ভেঙেছিল। ১৯৩২ সালে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সম্পূর্ণরূপে কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ (আংশিকভাবে কর্মহীনদের গণনায় ধরলে অঙ্কটা ছিল প্রায় ৩ কোটি)। ১৯৮৬ সালে এই সব দেশে কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় আজ আমরা যা দেখতে পাই সেটা নিছক বেকারি নয় — এ হল অতি-বেকারি। ১৯৮৩ সালে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সক্ষমদেহী জনসমষ্টির প্রায় ১০ শতাংশ ছিল কর্মহীন।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ: প্রত্যেক তৃতীয় মেহনতি মানুষটি সেখানে কর্মহীন।

১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে এই দেশগুলিতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে কর্মহীনদের মোট সংখ্যা ছিল ৫০ কোটি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেক্সিকোতে ১৯৮৩ সালে বেকার ছিল ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক। সেই বছরেই ভেনেজুয়েলায় জনসমষ্টির ২৪ শতাংশের উপরে বেকারির আঘাত এসেছিল। চিলিতে কর্মহীনদের সংখ্যা আরও বেশি: সক্ষমদেহী জনসমষ্টির ৩০ শতাংশ অবধি। এল সালভাদোরে বেকারি শহরগুলিতে ৪০ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ৭০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছিল।

ক্রমবর্ধমান বেকারিকে পুঁজিপতিরা তাদের মজুরি শ্রমিকদের কাছ থেকে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে আদায় করার একটা অতিরিক্ত শক্তিশালী উপায় হিসেবে কাজে লাগায়। চাকরি খোয়া যাওয়ার আশংকা শ্রমিককে বাধ্য করে পুঁজিপতির দাবিগুলি মেনে নিতে। সে যদি কঠোরতর শর্ত মেনে নিতে রাজি না হয়, তবে যে অসংখ্য কর্মহীন লোক যে কোনো শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত তাদের যে কোনো একজনকে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ প্রতিস্থাপিত করা হবে। জন স্টেইনবেক তাঁর *The Grapes of Wrath* উপন্যাসে পরিস্থিতিটা বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে: 'যখন একজন লোকের জন্য একটা কাজ ছিল, দশজন লোক সেটার জন্য লড়াই করত -- লড়াই করত কম মজুরি নিয়ে। ঐ লোকটা যদি ত্রিশ সেন্টের জন্য কাজ করে, তা হলে আমি করব পঁচিশ সেন্টের জন্য।

'ও যদি পঁচিশ নেয়, আমি করব কুড়ি সেন্টের জন্য।

'না, না, আমি ক্ষুধার্ত, আমি কাজ করব পনেরো সেণ্টের জন্য। আমি কাজ করব খাদ্যের জন্য।'*

নিজের চাকরি বজায় রাখার জন্য, একজন কর্মহীন লোকের দ্বারা যাতে প্রতিস্থাপিত হতে না-হয় সেই জন্য শ্রমিককে মেনে নিতে হয় কম মজুরি, শ্রমের নিবিড়করণ আর আরও মন্দ কাজের অবস্থা। এ সবই পুঁজিপতিকে সরাসরি উপকৃত করে, কেননা এর ফলে সে আরও বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়। আর বেকারের কথা বলতে গেলে, সে ঠিক কর্মে-নিযুক্ত শ্রমিকটির মতোই, হারার দলে। যাদের কাজ আছে তাদের কাজের অত্যধিক-নিবিড়করণ শ্রমের চাহিদা হ্রাস করে, তাই চাকরি পাওয়া আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

দাম বেড়ে চলে

নিয়ত দাম বেড়ে চলাটা শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের উপরে একটা ভারী বোঝাস্বরূপ। পুঁজিবাদে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বদলাতে পারে শুধু এক দিকেই — সেটা হল উপরের দিক। দাম বাড়ার প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। রুটি আজ এক দামে বিক্রি হয়, পরের দিন দাম বেড়ে যায়। মাংস ও দুধ, আলু ও অন্যান্য সবজি, এবং অন্যসব খাদ্যসামগ্রীর দাম দ্রুতহারে বাড়ছে। জামা-কাপড়,

* John Steinbeck, *The Grapes of Wrath*, The Sun Dial Press, New York, 1941, pp. 386-387.

জুতো, রেডিও সেট ও স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের দাম নিয়ত বাড়ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৭০-১৯৮২ সালে উপভোক্তা দাম বেড়েছিল ২·৫ গুণ এবং ব্রিটেনে এই বৃদ্ধি ছিল ৪·৪ গুণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উপভোক্তা দামের বৃদ্ধি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে সেখানে দাম বাড়ছিল বছরে গড়ে ২০ শতাংশ হারে। ১৯৮০-১৯৮১ সালে দামের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল ৩৫-৪০ শতাংশ।

বেড়ে-চলা দাম শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারগুলিকে কঠিনভাবে আঘাত করে। মজুরি বৃদ্ধি দাম বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। ফলে, একজন শ্রমিক আগে যত কিনত এখন ততটা কিনতে পারে না। দাম বাড়ার ফলে শ্রমিকরা খাদ্য, বস্ত্র, জুতো ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য কম কিনতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ তাদের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রকৃত মজুরি এইভাবে কমে গিয়েছিল প্রায় ২০ শতাংশ — ১৯৭১ সালের স্তর পর্যন্ত। আর্জেন্টিনায় শুধু ১৯৮১-১৯৮২ সালেই প্রকৃত মজুরি কমে গিয়েছিল ৩০ শতাংশ।

দাম বাড়ার ফলে এক দিকে যখন শ্রমজীবী জনগণের জীবনমান নিচে নেমে আসে, তখন একচেটিয়াপতিরা নিজেদের স্বার্থে তাকে কাজে লাগায়, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে সামগ্রী বিক্রি করার সময়ে তাদের লুঠ করার একটা হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করে। দাম

বাড়ার ফলে একচেটিয়া সংস্থাগুলির আয় বাড়ে, এবং এইভাবে তাদের মুনাফাও স্ফীত হয়।

দাম বৃদ্ধি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকেও বাড়িয়ে তোলে। বস্তুতপক্ষে, প্রকৃত মজুরি হ্রাসের ফলে শ্রমশক্তির দরও কমে যায়, তার ফলে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমে আর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বেড়ে যায়। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের বিস্তৃতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়; এটা অর্জন করা হয় অপ্রকাশ্যভাবে, ভালো একটা কারবারি লেনদেন থেকে পুঁজিপতিরা যেরকম উপকৃত হয় অনেকটা সেই রকম, কেননা এই ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তোলা শোষণটা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ম-দিবস দীর্ঘ করা বা শ্রমকে আরও নিবিড় করার মতো ততটা প্রকট নয়।

অনাহার ও অপুষ্টি

বেকারি, দাম বৃদ্ধি, শ্রমজীবী জনগণের মৌল অধিকারগুলির উপরে পুঁজির অন্তহীন আক্রমণ — এ সবই বহু শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মধ্যে অপুষ্টির কারণ। অনাহার আর অপুষ্টি হল লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনে এক অভিশাপ। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও স্থায়ী অপুষ্টির কবলে পড়েছে ২ কোটি লোক। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী এই দেশে গরিবদের সন্তানসন্ততিরা প্রায়শই খাদ্যের সন্ধান করে আঁস্তাকুড়ে!

সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে, যেখানকার বিকাশের স্তর শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক নিচে,

সেখানে পরিস্থিতিটা অবশ্যই আরও খারাপ। পৃথিবীর সেই অংশে প্রায় ১ শতকোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের মধ্যে ৫০ কোটির বেশি হল দুর্ভিক্ষ-কবলিত। সেখানে প্রতি বছর প্রায় ৪ কোটি লোক অনাহারে মারা যায়; তাদের অর্ধেকই শিশু।

দূর প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্য পরিস্থিতি সবচেয়ে অসহনীয়, যেখানে জনসমষ্টির ২৭ শতাংশ ভোগে অনাহারে বা অপুষ্টিতে। আফ্রিকায়, জনসমষ্টির ২২ শতাংশের যথেষ্ট আহার্য নেই।

শোচনীয় আবাসন

পৃথিবীতে প্রায় ১ শতকোটি লোকের উপযুক্ত আবাসন নেই। এই তীব্র সমস্যা সমাধান করার জন্য পুঁজিপতিরা তাদের অর্থ ব্যয় করতে চায় না। তারা মুনাফা শিকারী, তাই গরিবদের আবাসনের ব্যাপারে অনাগ্রহী। পুঁজিবাদের ঊষালগ্নে যেমন ছিল, ঠিক তেমনই তারা জনসমষ্টির একটা বড় অংশকে মানুষের বাসের অনুপযুক্ত বাড়ি বা কুটিরে থাকতে বাধ্য করে, কোনো কোনো লোকের মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন পর্যন্ত নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৩ সালে ৩০ লক্ষ গৃহহীন লোক ছিল। এই লোকেরা রাত কাটায় রাস্তায় রাস্তায়, সেতুর তলায় অথবা সাবওয়ের বায়ু-চলাচলের ঝাঁজিরির উপরে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির নাগরিক অঞ্চলগুলিতে বস্তিগুলি মারাত্মকভাবে ব্যাপক হয়ে উঠেছে, শহুরে

জনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশ, এমন কি দুই-তৃতীয়াংশ সেগুলিতে বাস করে। বস্তিগুলিতে জীবনযাপনের অবস্থা বীভৎস। অতি মন্দ অনাময় ব্যবস্থার মধ্যে এক ঝাঁক লোকের বাস আর অপরাধ সেখানকার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। আর যতদিন পুঁজিই সর্বেসর্বা থাকবে, ততদিন আমূল উন্নতির কোনো আশা থাকতে পারে না।

জীবনযাপনের অবস্থা উন্নত করার পরিবর্তে পুঁজিপতিরা অর্থ বিনিয়োগ করে সামরিক শিল্পে এবং আরও বেশি খরচ করে যুদ্ধের প্রস্তুতির পিছনে।

চিকিৎসা আরও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চিকিৎসার খরচ দ্রুত বেড়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গত তেরো বছরে তা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। হাসপাতালে থাকা তো দূরের কথা ডাক্তারের ভিজিটের অর্থ দেওয়াও মেহনতি মানুষের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠছে। ওষুধ-নির্মাতা সংস্থাগুলি ওষুধপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে শ্রমিকদের রক্ত চুষে নিচ্ছে। রোগ আর আঘাতের উপরে পুঁজিপতিরা আরও মুনাফা করে। অন্য দিকে, আরও বেশি মানুষ, বিশেষত দরিদ্রতর অংশগুলির মানুষ চিকিৎসাগত কোনো সাহায্য পায় না, তাদের স্বাস্থ্যের উপরে তার অবনতিমূলক ফল ফলে, তাদের অনেকের অকালমৃত্যু ঘটে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১·৫ শতকোটি মানুষের স্বাস্থ্যকৃত্যককে ব্যবহার করার মতো সংগতি নেই।

তাদের মধ্যে ৪০ কোটি হল ৬ বছর বয়সের নিচে শিশু। প্রত্যেক একজন লোকের পিছনে ব্যবহৃত ওষুধের পরিমাণ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় সেখানে ৭০ গুণ কম। রোগ বেড়ে চলেছে: যক্ষ্মা, শিস্তোসোমিয়াসিস, ম্যালেরিয়া, পাকস্থলীর রোগ, প্রভৃতি সেখানে সদাই বিদ্যমান।

বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বাড়ছে

পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায়, শ্রমিক আর পুঁজিপতিদের বিভক্ত করে সামাজিক ব্যবধানটা বাড়ছে। এমন কি আর্থনীতিক পুনরুন্নয়নের সময়েও, যখন মজুরি বাড়তে থাকে তখনও, পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপযোজন ধনীদের আরও বেশি ধনী করে, আর শ্রমিকদের অবস্থা, বুর্জোয়াদের অবস্থার তুলনায়, আরও খারাপ হয়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে ও মোট সামাজিক উৎপাদে তথা সামগ্রিকভাবে জাতীয় সম্পদে শ্রমিক শ্রেণীর অংশটা কমে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই প্রক্রিয়াটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবেই চলছে। সেখানে জনসমষ্টির এক শতাংশের কম হল জাতীয় সম্পদের অর্ধেকের বেশির মালিক। সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলি, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ০·৩ শতাংশ হল ২২ শতাংশ সম্পদের মালিক। অন্য যে কোনো পুঁজিবাদী দেশের মতোই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের এই মেরুপ্রান্তের বিপরীত দিকে রয়েছে শ্রমের মেরুপ্রান্ত। শেষোক্ত মেরুপ্রান্তে, মার্কিন নাগরিকদের ৬০ শতাংশ মাত্র ৭·৫ শতাংশ জাতীয় সম্পদের অধিকারী। তার মানে এই যে ০·৩ শতাংশ উঁচুতলার প্রতিটি ব্যক্তির তুলনায় শ্রমের মেরুপ্রান্তের ৬০ শতাংশের প্রতি একজনের হাতে রয়েছে ৬০০ গুণ কম বৈষয়িক সম্পদ। তাই দেখতে পাচ্ছি, ব্যবধানটা রিবাট, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা ঘোচানো যাবে না।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের লালসা শ্রমের মেরুপ্রান্তের উপরে সম্পদের মেরুপ্রান্তের আক্রমণকে আরও বেশি হিংস্র করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৩০ লক্ষের কিছু বেশি লোককে ১৯৭৪ সালে দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করে বলে নথীবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের গোড়ায় তাদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল — অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশে দারিদ্র্য ব্যাপক হলেও, তরুণ সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে বিরাজমান দুর্দশার সঙ্গে তা অতুলনীয়, সেখানে ১ শতকোটির বেশি মানুষ চরম দুরবস্থায় বাস করে। তাদের মধ্যে ৮০ কোটি লোকের বার্ষিক মাথা-পিছু আয় ১৫০ ডলারের নিচে, তার মানে তাদের আয় দিনে মাত্র ৪১ সেণ্ট।

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি আর উন্নয়নশীল দেশগুলির মাঝখানে দারিদ্র্যের যে অতল গহ্বরটি

রয়েছে তা সংকীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, আরও বিস্তৃত হয়ে চলেছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে ১৭৭০ সালে ইউরোপে মাথা-পিছু মোট জাতীয় উৎপাদ এখন যাদের উন্নয়নশীল বলা হয় সেই দেশগুলির চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি ছিল। ১৮৭০ সালে, একশো বছর বাদে, ব্যবধানটা বেড়ে হয়েছিল ৩·৫ গুণ। আরও একশো বছর বাদে, ১৯৭০ সালে, ব্যবধানটা হয়েছে ৭·৩ গুণ। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ২০০০ সালে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মাথা-পিছু মোট জাতীয় উৎপাদের মূল্য হবে উন্নয়নশীল দেশগুলির চেয়ে ১৪ গুণ বেশি।

অধ্যায় ১৫

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী লড়ছে

পুঁজিপতিদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান শোষণ ও শ্রমজীবী জনগণের মৌল অধিকার লংঘন শ্রমিক শ্রেণী আর তার মিত্রদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও পাল্টা কর্মব্যবস্থা জাগিয়ে তোলে। শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া সমাজের বনিয়াদে নাড়া দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নামে নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য।

প্রলেতারিয়েতের প্রথম শ্রেণী লড়াইগুলি

১৯শ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের রূপ ছিল অত্যন্ত সরল। সেই সময়ে শিল্পে প্রথম যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। তার ফলে ঘটেছিল বেকারি, দীর্ঘতর কর্ম-দিবস ও নিবিড়ীকৃত শ্রম। সুতরাং সমস্ত নষ্টের গোড়াটাকে শ্রমিকরা দেখতে পেয়েছিল যন্ত্রের মধ্যে, পুঁজিবাদী

সম্পর্কের মধ্যে নয়, এবং যন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাদের প্রতিবাদের কর্মব্যবস্থা চালিত হয়েছিল।

১৭শ শতাব্দীতেই রিবন ও পোশাক-বয়নী বয়নের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদের জোয়ার প্রায় সারা ইউরোপকে প্লাবিত করেছিল। ১৮শ শতাব্দীতে, শ্রমিকরা প্রথম কাপড়-কাটা যন্ত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষে আর ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটিশ কারখানাগুলিতে শুরু হয়েছিল ম্যানুফ্যাকচারিং যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ধ্বংসকার্য — লুডাইট আন্দোলন, জেনারেল লুড নামে পরিচিত কিংবদন্তিসুলভ শিক্ষানবীশ নেড লুডের নামানুসারে এই নাম হয়েছিল, মনে করা হয় তিনিই সর্বপ্রথম একটি মেশিন-টুল ধ্বংস করেছিলেন।

কালক্রমে প্রলেতারিয়েত আরও ভালোভাবে নিজের অবস্থান বুঝতে শিখল। তারা উপলব্ধি করল যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং সেগুলিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী ধরন আর পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধেই তাদের লড়তে হবে। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম এক উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে বহুবিধ রূপ ধারণ করল।

শ্রমিক শ্রেণীর আর্থনীতিক সংগ্রাম

১৯শ শতাব্দীর গোড়ায় শ্রমিক শ্রেণী নিজের প্রত্যক্ষ আর্থনীতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা সীমাহীনভাবে শোষণ বাড়িয়ে চলা রোখার জন্য এক বিরাট আর্থনীতিক সংগ্রাম শুরু করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর আর্থনীতিক সংগ্রাম বহুবিধ মৌল প্রশ্ন নিয়ে চলছে। পুঁজিপতিরা অনাপেক্ষিক তথা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের কাজে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে, এই সংগ্রামে শ্রমিকরা তার বিরোধিতা করে। তাদের প্রধান আঘাত চালিত হয় পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। প্রলেতারিয়েতের প্রধান প্রধান আর্থনীতিক দাবির মধ্যে কর্ম-দিবস হ্রস্ব করার দাবিটা বহু দিন ধরেই ছিল এবং শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ রেয়াত আদায় করে নিয়েছে। শ্রমের দানবিক নিবিড়করণ আর ওভারটাইম কাজের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চলছে। শ্রমিকরা উন্নততর কাজের অবস্থা, দীর্ঘতর সবেতন ছুটি ও নিরাপত্তামূলক নিয়ম পালন করার দাবি তুলছে।

আর্থনীতিক সংগ্রামে মজুরির প্রশ্নটির দিকে অনেকখানি মনোযোগ দেওয়া হয়। মজুরিকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে এনে পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর প্রবণতার বিরোধিতা শ্রমিকরা সর্বদাই করেছে। তারা দাবি করে মজুরি বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যের অবসান। বুর্জোয়া সরকারগুলির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত জনবিরোধী মজুরি সংস্তম্ভন নীতির বিরুদ্ধে তারা দৃঢ়পণ প্রতিরোধ খাড়া করেছে। পুরুষ ও নারীদের সমান অধিকারের জন্য এবং বিদেশী শ্রমিকদের সমর্থনেও তারা লড়াই করে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে বেশি মজুরির দাবির সঙ্গে

সাধারণত অন্যান্য দাবিও মেলানো হয় শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত আয় বাড়ানোর জন্য। শ্রমিক শ্রেণী দাবি করে উন্নততর সামাজিক বীমা, পেনশন ব্যবস্থা ও বেকার ভাতা। শ্রমজীবী জনগণের উপরে লুণ্ঠন বাড়িয়ে তোলার জন্য উদ্দিষ্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের করনীতির প্রবল বিরোধিতা করে তারা। শ্রমিক শ্রেণী শ্রমজীবী জনগণের স্বাস্থ্যের প্রতি পুঁজিপতিদের লুঠেরাসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে। বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কর্মতৎপরতা বাড়ছে। শ্রমিকরা স্কুল শিক্ষা ও বৃত্তি প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নও দাবি করে, দাবি করে উন্নততর আবাসন। খালি ফ্ল্যাটগুলিতে গৃহহীনদের থাকতে দেওয়ার জন্য আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করছে।

শ্রমিক শ্রেণীর আর্থনীতিক আন্দোলন ক্রমেই বেশি করে বেকারিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। কারখানা, খনি ও একেকটি কর্মশালা বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায়। ব্যাপক বরখাস্তের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে, দাবি করে যে কর্মস্থলগুলি সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাদের দাবি যখন পুঁজিপতিরা প্রত্যাখ্যান করে, শ্রমিকরা কখনও কারখানা ও অন্যান্য উদ্যোগ দখল করে রাখে, পুঁজিপতিদের উৎপাদন থামাতে দেয় না। বরখাস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমর্থন ও তাদের সঙ্গে সংহতিমূলক কর্মতৎপরতাও ব্যাপকভাবে চালানো হয়।

শ্রমিকরা আরও বেশি শ্রেণী-সচেতন ও সুসংগঠিত

হয়ে ওঠায়, ধর্মঘট আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছে। ১৯১৯-১৯৩৯ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রতি বছর ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল গড়ে ৩৫ লক্ষ লোক; ১৯৬০-এর দশকে অংকটা বেড়ে হয়েছিল ১ কোটি ২৭ লক্ষ, আর ১৯৭০-এর দশকে ২ কোটি ১৭ লক্ষ। বহু উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান পরিসরে ধর্মঘট আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে।

ধর্মঘটের রূপগুলি আরও বহুবিধ হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলি বিস্তৃত হয় এক বা একাধিক কারখানায়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, গোটা একেকটা শিল্পে।

কোনো শিল্পের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলিতে আহূত ধর্মঘট বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেগুলিকে ব্যবহার করা হয় মালিকের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি হিসেবে, সেগুলি সর্ববাদিসম্মত দাবিদাওয়া পেশ করার জন্য শ্রমিকদের দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দেয়। ধর্মঘটীদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের নতুন নতুন বাহিনী যখন যোগ দেয় তখন ধর্মঘটগুলি এক কারখানা থেকে আরেক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে। এবং সব শেষে, আছে সাধারণ ও জাতিব্যাপী ধর্মঘট, তাতে জড়িত হয় একটি দেশের সমস্ত, অথবা প্রায় সমস্ত শ্রমিক।

ধর্মঘটগুলির রূপের বহুবিধতা পুঁজিপতিদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

বৈষয়িক ক্ষতি এড়াতেও সক্ষম করে তোলে শ্রমিকদের।

শ্রমিক শ্রেণীর চালানো আর্থনীতিক সংগ্রামে ধর্মঘট ছাড়াও অন্য বহু উপায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলি হল বিক্ষোভ মিছিল, সম্মেলন, সভা ও প্রতিবাদ মিছিল। শ্রমিকরা তাদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে প্রচার করে সংবাদপত্রে, রেডিও ও টেলিভিশনে।

বেকাররাও আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেকারদের জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে। ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত এই ধরনের প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল কর্মহীনদের ২৫০টি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমিতি; তার স্লোগান ছিল 'বেকাররা অরক্ষিত নয়'। বেকারির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সারা দেশ জুড়ে গঠিত হয় নাগরিক উদ্যোগ কমিটি।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম

শ্রেণী লড়াইগুলির সময়ে শ্রমিকরা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের প্রধান লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য শুধু আর্থনীতিক দাবিদাওয়াই যথেষ্ট নয়। আর্থনীতিক শ্রেণীসংগ্রাম তাদের পরিস্থিতি উন্নত করতে পারে শুধু আংশিকভাবে, কিন্তু তা পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটাতে পারে না, আর পুঁজিবাদী শোষণ নিশ্চিহ্ন করার

জন্য বুর্জোয়া ব্যবস্থাই চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে। সুতরাং শুধু আর্থনীতিক সংগ্রামের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। আর্থনীতিক দাবিদাওয়া ছাড়াও তারা রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পেশ করে এবং বৃহৎ পরিসরে এক রাজনৈতিক সংগ্রাম চালু করে।

রাজনৈতিক সংগ্রাম হল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ। এটা আর কর্তার বিরুদ্ধে একটিমাত্র কারখানায় শ্রমিকদের সংগ্রাম থাকে না। এখন এটা হয় পুঁজিপতিদের সমগ্র শ্রেণীটির বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে শ্রমিকরা তাদের মৌল স্বার্থগুলি রক্ষা করে; যেগুলি শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা কায়েম করবে। শ্রমিকরা লড়াই করে তাদের রাজনৈতিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত ও বিস্তৃত করার জন্য, গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে তাদের কর্মতৎপরতা, এবং শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ রোধের জন্য তাদের প্রচেষ্টার তাৎপর্য বাড়ছে।

আজ শ্রমিকরা সাধারণত সংগ্রামের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক রূপগুলিকে মেলায়। তাদের দাবিগুলি প্রায়শই আর্থনীতিক গন্ডী ছাড়িয়ে রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে করা ধর্মঘট, মিছিল ও অন্যান্য গণ-কর্মতৎপরতার ব্যাপ্তি বাড়ছে। ১৯৬০-এর দশকে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ধর্মঘট,

মিছিল, পদযাত্রা, প্রতিবাদ-দিন ও প্রতিবাদ-সপ্তাহে অংশ গ্রহণ করেছে ৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ, ৭০-এর দশকে — ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ১৯৮০ — ১৯৮৫ সালে ৩৪ কোটি মানুষ। শ্রমিকরা আরও বেশি জোরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজে বাস্তব অংশগ্রহণের অধিকার দাবি করছে।

সরকারগুলির কাছে তারা সরাসরি দাবি জানায় বেকারি ও দাম বৃদ্ধি রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং প্রতিবাদ জানায় সামাজিক প্রয়োজন বাবদ ব্যয়বরাদ্দ কাটার কর্মনীতির বিরুদ্ধে। ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী আইনকানুনের বিরুদ্ধে ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উপরে নিগ্রহের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে জরুরী আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে ব্যাপকতর অংশগ্রহণের জন্য তারা লড়াই করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইতালিতে জানুয়ারি ১৯৮২তে যে ১০ লক্ষ নির্মাণ-শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল, তাদের দাবি ছিল এই যে একটা জাতীয় আবাসন নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালীয় পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা আর বিদ্যুৎ শ্রমিকরা দেশের জন্য একটিমাত্র শক্তি-বিষয়ক পরিকল্পনার দাবি জানিয়েছিল। সেই দাবি অভিব্যক্ত হয়েছিল তাদের সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে, যাতে যোগ দিয়েছিল ১,২০,০০০ কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মচারী।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং নিপীড়ন ও শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী পরিপক্কতা লাভ করে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তা সংখ্যায় বাড়ে, আরও ভালোভাবে সংগঠিত হয় এবং ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে দৃঢ়তর যোগসূত্র স্থাপন করে। শ্রেণী লড়াইগুলিতে তা সাহস, অধিকতর নিয়মানুবর্তিতা আর ক্রিয়াকলাপের ঐক্যের পরিচয় দেয়। নিজ স্বার্থের সপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; সে লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী শোষণের কারণগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করা; এই সংগ্রাম জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা বাড়ায়। শ্রমিক শ্রেণী শুধু তার নিজের শ্রেণীস্বার্থেরই নয়, বরং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থেরও মুখপাত্র হয়ে ওঠে। সে কাজ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শক্তির নেতা হিসেবে।

একটি রাজনৈতিক পার্টি গঠন শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্কতারই লক্ষণ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি হল প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনী, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বদায়ক ও বৈপ্লবিক শক্তি। পার্টি শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার ও সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে। প্রলেতারিয়েতকে তা সমাজবিকাশের মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় এবং তার উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়ার ঐক্য নিশ্চিত করে।

প্রথম মার্কসবাদী পার্টি ছিল ১৮৪৭ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কর্তৃক স্থাপিত লীগ অব কমিউনিস্টস। তার সদস্যসংখ্যা কয়েকশো-র বেশি ছিল না। ১৯৮৫ সালে, পৃথিবীতে কমিউনিস্টদের মোট সংখ্যা ছিল ৮ কোটির বেশি। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এখন কাজ করে ৯৫টি দেশে; কমিউনিস্ট আন্দোলন হয়ে উঠেছে আমাদের কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি।

শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বগুলি অর্জিত হয়েছে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির নির্দেশনায়। জাতিসমূহের জীবনে অথবা সারা পৃথিবীতে এমন একটিও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বা অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নি, যাতে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করে নি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান কমিউনিস্টদের সক্ষম করে তোলে চলতি প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ও সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সপক্ষে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে। তারা সর্বদাই থেকেছে এই সংগ্রামের পুরোভাগে, লড়াই করছে তার সবচেয়ে দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্ররা ঐতিহাসিক সব বিজয় অর্জন করেছে। শ্রমজীবী জনগণের ঘৃণিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

পতন হয়েছে রাশিয়ায়, এবং ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অন্য অনেকগুলি দেশে। এই দেশগুলিতে পুঁজিবাদী শোষণ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথে এক নতুন ও সুখী জীবন গড়ে তুলছে।

উপসংহার

উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে আমরা এই কথাগুলিই আপনাদের বলতে চেয়েছিলাম।

পুঁজিবাদের সঙ্গে একত্রে আত্মপ্রকাশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সর্বক্ষণই তার সহগামী থাকে, সর্বদা সেটাই থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য, তার মুখ্য চালিকাশক্তি।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য, পুঁজিপতিরা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নির্মম শোষণ চালায়, সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে লুণ্ঠন ও নিপীড়ন করে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য, পুঁজিপতিরা উৎপাদন সম্প্রসারিত করে, নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ঘটায় এবং নিজেদের মধ্যে কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য, পুঁজিপতিরা

একচেটিয়া সংস্থাগুলি গঠন করে, পৃথিবীকে আর্থনীতিক প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ভাগাভাগি করে এবং উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের অমানুষিক কর্মনীতি অনুসরণ করে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য, পুঁজিপতিরা গোটা এক-একটা জাতির স্বার্থকে পদদলিত করে, আন্তর্জাতিক লুণ্ঠন চালায় এবং বহু ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশকে পশ্চাৎপদতার দশায় রেখে দেয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জনের জন্য, পুঁজিপতিরা দুষ্কৃতি করে, সমরবাদে উৎসাহ যোগায় এবং মানবজাতিকে এক সর্বনাশা পারমাণবিক যুদ্ধের কিনারায় ঠেলে দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করতেই পরাঙ্মুখ হয় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তিমক্ষণের ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মৃত্যুঘণ্টাও বেজে ওঠে, কেননা পুঁজিবাদের সঙ্গেই তার আসা-যাওয়া।

যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেখানে পুঁজি বা উদ্বৃত্ত-মূল্য, কোনোটাই থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে থাকে উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে সার্বজনিক মালিকানা। মানুষের উপরে মানুষের শোষণ সেখানে নেই, থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্রে জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সংঘক্রিয়াবাদ, সাথিসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তায় চিহ্নিত। শ্রেণীবৈর ও জাতিগত বিরোধ-বিবাদ চিরতরে দূর হয়। প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকলের প্রতি যত্ন এবং সাধারণ কল্যাণের জন্য প্রত্যেকের প্রতি যত্ন — এটাই হয়ে ওঠে জীবনের নিয়ম। জনগণের

ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার পূর্ণতম পূরণকেই সমাজতন্ত্র সামাজিক উৎপাদনের সর্বাগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। এই মহৎ লক্ষ্যার্জনের জন্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো হয়, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সংস্কারকর্ম কার্যকর করা হয়।

সমাজের এক আমূল পরিবর্তন সম্পন্ন করে এবং মহত্তম আদর্শগুলি রূপায়িত করে, সমাজতন্ত্র প্রগতির শীর্ষদেশ অভিমুখে এক নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে। পুঁজিবাদ যেখানে জনগণের জীবনে দুঃখকষ্ট নিয়ে আসে, সেখানে সমাজতন্ত্র তাদের দেখায় মুক্তি, শান্তি ও সুখের পথ।

টীকা ও ব্যাখ্যা

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য: পণ্যের উচ্চতর সামাজিক মূল্য আর পুঁজিপতির উদ্যোগে উৎপন্ন একই পণ্যের নিম্নতর মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের দরুন একক পুঁজিপতি যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে।

অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য: কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের এক অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য; পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের উপরে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর একটি পদ্ধতি।

অনাপেক্ষিক জমির খাজনা: জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার একাধিকারের দরুন একজন ভূস্বামী উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি উপযোজন করে।

অবচয়: ক্রমাগত শ্রমের উপায়ের ক্ষয়িত হওয়ায় নতুন উৎপন্ন পণ্যগুলিতে শ্রমের উপায়ের মূল্য স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।

অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়মন: বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ পূরণ করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা রূপায়িত আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী।

অর্থনীতির সামরিকীকরণ: অর্থনীতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ বাধানোর উদ্দেশ্যের অধীনস্থ করা।

অস্থির পুঁজি: পুঁজির যে অংশটি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হয় এবং যার পরিমাণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থা: পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একটি বড় কোম্পানি বা কোম্পানিগুলির একটি পরিমেল, একচেটিয়া মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে যা আন্তর্জাতিক পরিসরে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উশুলের উপরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য: আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস ও সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য; শোষণের মাত্রা ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানোর একটি উপায়।

আবশ্যকীয় শ্রম: আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের মধ্যে শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপাদন বাবদ ব্যয়িত শ্রম।

আবশ্যকীয় শ্রম-সময়: কর্ম-দিবসের সেই অংশটি যে সময়ে একজন শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য উৎপন্ন করে।

উৎপাদন-ব্যয়: পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত পুঁজি; উৎপাদনের উপায় কেনার জন্য দেওয়া অর্থ (স্থির পুঁজি) ও শ্রমশক্তির জন্য দেওয়া অর্থ (অস্থির পুঁজি) এর অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদনের দাম: মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ, উৎপাদন-ব্যয় ও গড় মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্বৃত্ত উৎপাদ: সর্বমোট উৎপাদের সেই অংশটি যেটি সাক্ষাৎ উৎপাদকদের শ্রমের দ্বারা আবশ্যকীয় উৎপাদের অতিরিক্ত সৃষ্টি হয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য: একজন ভাড়াটে শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট তার শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য ও পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম: মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের উপরে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ও পুঁজিপতিদের দ্বারা তার উপযোজন সংক্রান্ত পুঁজিবাদের বুনিয়াদি আর্থনীতিক নিয়ম।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ: উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক পরিমাণ।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার: উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণ,

অথবা অস্থির পুঁজি যে মাত্রায় বাড়ে, হিসাব করা হয় শতাংশে প্রকাশিত অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত হিসেবে; একজন ভাড়াটে শ্রমিকের উপরে শোষণের মাত্রার পরিচায়ক।

উদ্বৃত্ত শ্রম: উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে একজন মজুরি শ্রমিক যে শ্রম ব্যয় করে।

উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়: কর্ম-দিবসের সেই অংশটি, যে সময়ে একজন শ্রমিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত হওয়ার জন্য।

উপনিবেশবাদ: উপনিবেশগুলিতে চালানো যে সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতিগুলির লক্ষ্য হল উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জাতিসমূহের উপরে শোষণ ও পীড়ন চালানো।

ঋণ-পুঁজি: ঋণের সুদের রূপে পরিশোধের জন্য একজন পুঁজিপতিকে বা একটি রাষ্ট্রকে ঋণ হিসেবে দেওয়া অর্থ-পুঁজি।

ঋণের সুদ: মুনাফার সেই অংশ যেটি একজন বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি দেয় একজন ঋণদাতা পুঁজিপতিকে, শেষোক্তজনের অর্থ তহবিল সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

একচেটিয়া অতি-মুনাফা: স্বাভাবিক পুঁজিবাদী মুনাফারও উপরে অতিরিক্ত মুনাফা।

একচেটিয়া খাজনা: কৃষি-উৎপাদ যখন মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হয় সেই সময়ে পুঁজিবাদে জমির খাজনার একটি রূপ।

একচেটিয়া দাম: একটি পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের দাম থেকে পৃথক বাজার দামের এক বিশিষ্ট রূপ; পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য একচেটিয়া মুনাফা নিশ্চিত করে।

একচেটিয়া মুনাফা: অর্থনীতির এক বা একাধিক শাখায় আধিপত্যের ফলে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলি যে মুনাফা ভোগ করে।

একচেটিয়া সংস্থা: বড় বড় উদ্যোগ বা অনেকগুলি উদ্যোগের একটি পরিমেল, যা একটি বিশেষ পণ্যের উৎপাদনের বেশ বড় একটা ক্ষেত্র ও তার বিপণনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একচেটিয়া মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই পণ্যটির বাজারে আধিপত্য করে।

একটি পণ্যের মূল্য: একটি পণ্যে অঙ্গীভূত সামাজিক শ্রম।

কর্ম-দিবস: একটি দিনে সেই কালপর্বটি, যে সময়ে একজন মেহনতি মানুষ একটি উদ্যোগে বা অফিসে কাজ করে।

গড় মুনাফা: আগাম দেওয়া পুঁজির উপরে গড় হারে পাওয়া মুনাফা।

জটিল শ্রম: যে শ্রমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার; দক্ষ শ্রম।

জাতি-অতিগ কর্পোরেশন: বড় ধরনের যে জাতীয় একচেটিয়া সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিসরে তার কাজ-কারবার চালায়। আজ এটিই আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থার সবচেয়ে চালু রূপ।

ডিভিডেণ্ড: একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি যে মুনাফা করে তা থেকে দেওয়া একজন শেয়ারহোল্ডারের আয়।

দাম: অর্থে প্রকাশিত মূল্য।

ধনকুবেরতন্ত্র: একচেটিয়া বুর্জোয়াদের বাছাই অংশ যারা সামাজিক সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের বৃহদংশ নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে।

নয়া-উপনিবেশবাদ: সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিবাদের কক্ষপথে রাখা ও একচেটিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের উপরে যে অন্যায় আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়।

পণ্য: একটি শ্রমোৎপাদ, ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের জন্য উদ্দিষ্ট।

পণ্য উৎপাদন: ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন।

পুঁজি: পুঁজি হল মূল্য যা ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে দেয়।

পুঁজি রপ্তানি: একটি দেশের একচেটিয়া সংস্থাগুলির ও ধনকুবেরতন্ত্রের পুঁজি আরেকটি দেশে রপ্তানি

করা তাদের একচেটিয়া মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং বহির্দেশীয় বাজারের জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য সংগ্রামে তাদের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

পুঁজিবাদ: উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ও পুঁজি কর্তৃক ভাড়াটে শ্রম শোষণ-ভিত্তিক সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী জমির খাজনা: উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, কৃষিতে যা ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং একজন ভূস্বামীর দ্বারা উপযোজিত হয়, যে উদ্যোগপতিদের কাছে ইজারায় তার জমি দেয়।

পুঁজিবাদে পার্থক্যমূলক জমির খাজনা: উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, যেটি আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে জমির উপরে একাধিকারের দরুন একজন ভূস্বামী উপযোজন করে।

পুঁজির সঞ্চয়ন: উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

পৃথিবীর আর্থনীতিক বিভাজন: বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের ভাগাভাগি সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতা: উৎপাদন ও বিপণনের অনুকূলতর অবস্থার জন্য এবং আরও বেশি মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত পণ্যোৎপাদকদের মধ্যে বৈরমূলক সংগ্রাম।

প্রবর্তনমূলক মুনাফা: একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির

প্রতিষ্ঠাতারা বা প্রবর্তকরা যে মুনাফা ভোগ করে; তাদের বিক্রীত শেয়ার দামের যোগফল আর জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিটিতে তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির আয়তনের মধ্যেকার পার্থক্যটা।

ফিনান্স পুঁজি: একচেটিয়া শিল্প পুঁজি যা একচেটিয়া ব্যাংকিং পুঁজির সঙ্গে মিশে গেছে।

বণ্ড: যে জামানত অনুসারে তার মালিক স্থায়ী সুদের রূপে একটা আয় পাওয়ার অধিকারী।

বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থা: আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ-কারবার চালানো দুই বা ততোধিক দেশের বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন একটি একচেটিয়া সংস্থা।

বাণিজ্যিক পুঁজি: পণ্যসামগ্রী বিপণনের জন্য ও তার দ্বারা সেগুলির মধ্যে অঙ্গীভূত উদ্বৃত্ত-মূল্য উশুল করার জন্য সঞ্চলন-ক্ষেত্রে বণিক পুঁজিপতিদের ব্যবহৃত পুঁজি।

বাণিজ্যিক মুনাফা: উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ, যেটি একজন শিল্প পুঁজিপতি একজন বণিক পুঁজিপতিকে ছেড়ে দেয় উৎপাদটি বিপণনের উদ্দেশ্যে তার প্রচেষ্টার জন্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

বিনিয়োগের আয়: মুনাফার সেই অংশ, ঋণের উপরে সুদ পরিশোধের পর বিনিয়োগকারী পুঁজিপতির হাতে যা থাকে।

বিনির্গম: মুদ্রা ও জামানত চালু করা।

বিমূর্ত শ্রম: শ্রমশক্তির মূর্ত রূপ নির্বিচারে, খোদ শ্রমশক্তির ব্যয় হিসেবে পণ্য উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম যা পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে।

ব্যবহার-মূল্য: একটি পণ্যের কোনো মানবিক চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা।

ব্যাংক: একটি আর্থ-ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কাজ হল অর্থ-পুঁজি সঞ্চিত করা ও তা ঋণ হিসেবে দেওয়া।

ব্যাংকিং পুঁজি: ব্যাংকগুলিতে কেন্দ্রীভূত পুঁজি, যা গঠিত ব্যাংকের নিজস্ব পুঁজি দিয়ে এবং ব্যাংকে আমানতগুলি দিয়ে, যেগুলি বস্তুতপক্ষে তার ঋণ তহবিল।

ব্যাংকিং মুনাফা: একটি ব্যাংক মোট যে অঙ্কের সুদ পায় এবং আমানতকারীদের তা যে অংক দেয়, এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ।

মজুরি: ভাড়াটে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে যে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে তার মূল্যের (এবং তাই দামেরও) একটি পরিবর্তিত রূপ।

মজুরি শ্রম: পুঁজিবাদী উৎপাদনে সেই শ্রমিকদের শ্রম, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং তাই নিজেদের শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে ও তাদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে বাধ্য।

মানুষের উপরে মানুষের শোষণ: উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের দ্বারা সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত শ্রমজাত উৎপাদগুলির উপযোজন, কখনও কখনও আবশ্যকীয় শ্রমের উৎপাদগুলিও উপযোজন।

মুদ্রাস্ফীতি: পুঁজিবাদে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের এক প্রক্রিয়া, যার প্রকাশ ঘটে জিনিসপত্রের দাম নিয়ত বেড়ে চলার মধ্যে এবং যার ফলে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুকূলে।

মুনাফা: উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ, মোট পুঁজি ব্যয়ের উপরে মোট আয়ের এক অতিরিক্ত অংশ, পুঁজিপতি যা উপযোজন করে।

মুনাফায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা: নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার ক্রয়ের মধ্য দিয়ে আরেকটি কোম্পানি বা অন্য কোম্পানিগুলির উপরে একটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণভার লাভ করা।

মুনাফার গড় হার: পুঁজিবাদী উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত সর্বমোট সামাজিক পুঁজির সঙ্গে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন সর্বমোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, শতাংশে প্রকাশিত।

মুনাফার হার: মোট আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, শতাংশে প্রকাশিত।

মূর্ত শ্রম: একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট একটা উপযোগী রূপে ব্যয়িত শ্রম।

মূল্যের নিয়ম: পণ্য উৎপাদনের একটি আর্থনীতিক নিয়ম, তাতে বলা হয় যে পণ্যসমূহের উৎপাদন ও বিনিময় নির্ধারিত হয় শ্রমের সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় ব্যয় দিয়ে।

রঁতিয়ে (পরশ্রমজীবী): যে পুঁজিপতি শেয়ার আর বণ্ড থেকে পাওয়া আয়ের উপরে বেঁচে থাকে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ: একটিমাত্র বন্দোবস্তের মধ্যে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতা আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতার জমাট বাঁধা, যার লক্ষ্য হল একচেটিয়া অতি-মুনাফা আদায় করা, শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম দমন করা, আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি রূপায়িত করা, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালানো।

শেয়ার: একটি জামানত, অর্থাৎ একটি সার্টিফিকেট, তাতে দেখানো হয় যে এটির অধিকারী একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি পুঁজিতে তার নিজের অর্থের নির্দিষ্ট একটা অঙ্ক যোগ করেছে এবং তাই সে তার কিছুটা মুনাফা পেতে পারবে ডিভিডেণ্ডের রূপে।

শেয়ার কোটেশন (শেয়ারের বিদ্যমান বিনিময় হার): শেয়ার বাজারে ও ব্যাংকে যে দামে শেয়ার কেনা-বেচা হয়।

শেয়ার পুঁজি: প্রতিষ্ঠাতাদের পুঁজি একত্র করে এবং

শেয়ার ও বণ্ড বিক্রয় মারফৎ বিনিয়োগকারীদের অর্থ-সাশ্রয় আকর্ষণ করে একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি যে পুঁজি সংগ্রহ করে।

শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ: একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে শেয়ারের যে সংখ্যা এই কোম্পানিটির উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা: মূর্ত শ্রমের ফলপ্রদতা।

শ্রম-নিবিড়তা: সময়ের প্রতিটি এককে শ্রম ব্যয়ে প্রকাশিত কষ্টকর শ্রম প্রচেষ্টা।

শ্রমশক্তি: মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা; উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সে যে কায়িক ও মানসিক সামর্থ্য প্রয়োগ করে তার সমষ্টি।

শ্রমশক্তির মূল্য: শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের মূল্য।

সরল শ্রম: যে শ্রমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার হয় না; অদক্ষ শ্রম।

সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম: একটি নির্দিষ্ট শিল্পে একটি বিশেষ ধরনের পণ্যসামগ্রীর বৃহদংশ উৎপন্নকারী উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনের প্রচলিত সামাজিক অবস্থায় একটি পণ্য প্রস্তুত করতে যে শ্রম ব্যয়িত হয়; পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা: ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিকে একত্রে ধরে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা যারা শোষিত ও নিপীড়িত।

স্থির পুঁজি: পুঁজির যে অংশটি উৎপাদনের উপায় ক্রয় করতে ব্যয় হয়। এর মূল্যের পরিমাণ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় না।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

স. ইলিন, আ. মতিলেভ। 'অর্থশাস্ত্র কী' (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

সাধারণভাবে বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞানে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র কেমন স্থানাধিকারী? এর বিবেচনাভুক্ত সমস্যাবলীর গোটা সমাহার ব্যাখ্যার জন্য তা কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে? লোকজনের ক্রিয়াকলাপের জন্য, তাদের ঐতিহাসিক ব্যবহারিক কাজের জন্য তার তাৎপর্য কেমন?

এ সব ব্যাপারই জনপ্রিয়, বোধগম্য আকারে এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

14 May 1999

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বই:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম
পার্টি কী
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব বলতে কী বোঝায়
উৎক্রমণ পর্ব বলতে কী বোঝায়
মেহনতি মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়
বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী

ISBN 5-01-000815-7